যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে
উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

‘তবু অনন্ত জাগে’ : বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে মৃত্যু

গবেষক

যশোধরা গুপ্ত

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জয়দীপ ঘোষ

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৩২

২০১৯

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল উপাধিপ্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে
উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

‘তবু অনন্ত জাগে’ : বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে মৃত্যু

গবেষক

যশোধরা গুপ্ত

ক্লাসরোল নম্বর : 001700103001

পরীক্ষার রোল নম্বর : MPBE194001

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : 110958 of 2010-11

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জয়দীপ ঘোষ

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৩২

২০১৯

This is to certify that the following papers continue original research on ‘তবু অনন্ত জাগে : বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে মৃত্যু’ by Jashodhara Gupta to be submitted in order to fulfill partial requirement of degree of M.Phil (Benglali). I further certify that neither this dissertation paper nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head Supervisor

Dept. of Bengali Dept. of Bengali

Jadavpur University Jadavpur University

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	i
প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	1
দ্বিতীয় অধ্যায় : বিভূতিভূষণের ভাবনায় মৃত্যু	13
তৃতীয় অধ্যায় : বিভূতিভূষণের নির্বাচিত ছোটগল্পে মৃত্যু	54
চতুর্থ অধ্যায় : বিভূতিভূষণের নির্বাচিত উপন্যাসে মৃত্যু	83
পঞ্চম অধ্যায় : জীবন-মৃত্যু এবং অপুর জগৎ	117
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার	178
গ্রন্থপঞ্জি	183

মুখবন্ধ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়ে অধ্যাপক আব্দুল কাফি আমাদের ‘পথের পাঁচালী’র ক্লাস নিতেন। সে ক্লাসের প্রতি যে মুগ্ধতা সেসময় তৈরি হয়, সেই মুগ্ধতার রেশ যে কাটেনি তা তো বটেই, যত দিন যাচ্ছে তা বাড়ছে। সেই মুগ্ধতার বশবর্তী হয়ে সেসময়ই ভেবেছিলাম, আগামী দিনে যদি কখনও গবেষণা করবার সুযোগ পাওয়া যায়, তবে তা অবশ্যম্ভাবীভাবে করব বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের উপর।

অধ্যাপক আব্দুল কাফি ‘পথের পাঁচালী’ প্রসঙ্গে যে পথ আর পিছুটানের কথা বলেন স্নাতক স্তরে, সেই কথাগুলি সবচাইতে বেশি মনে ধরেছিল। সেই বিষয়কে ভিত্তি করে আমি আমার স্নাতকোত্তরের সংক্ষিপ্ত গবেষণাপত্রটি লিখি।

তারপরে আরও অন্যান্য পড়াশুনার সঙ্গে বিভূতিভূষণকে পড়বার কাজ চালিয়েছি সাধ্যমত। অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ বর্তমানে বিভাগে স্নাতক স্তরের ‘পথের পাঁচালী’র ক্লাসটি নেন। আমি সেই ক্লাসের ছাত্র না হয়েও, মাস্টারমশাই এবং ক্লাসের অন্যান্যদের সহযোগিতায়, একান্ত নিজের ইচ্ছেয় সেই ক্লাস করতে পেরেছিলাম। সেই ক্লাসের ভূমিকা এই গবেষণাপত্র তৈরি হয়ে ওঠায় ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বলার মতন যথেষ্ট ভাষা আমার কাছে নেই। তখন আমি এম.ফিল প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সেই ক্লাস রুমে বসে সিদ্ধান্ত নিই যে আমি নিশ্চিতভাবে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ করবো, আর সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রের যে অংশটিকে আমার গবেষণার জন্য বেছে নেব, তা হল ‘বিভূতিভূষণের কথা সাহিত্যে মৃত্যু’। তার কিছুদিন পরে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক ঠিক করা হয়, জানতে পারি অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ আমার এই কাজের তত্ত্বাবধায়ক। তার আগে থেকেই তাঁকে প্রতিনিয়ত বিভূতিভূষণ নিয়ে প্রশ্ন করে অতিষ্ট করে তোলা শুরু হয়েছিল, এই ঘটনার পরে তা স্বীকৃতি পাওয়ায় উপদ্রবের মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। অবশ্য তিনি এ বিষয়ে প্রতিমুহূর্তে আমাকে ধৈর্য ধরে যেভাবে সম্ভব-অসম্ভব নানান প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, আমি তাঁর কোনও যুক্তি মানতে না চাইলে আমার মতামতকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়েছেন, আমি কিছু না বুঝতে পারলে তা বারংবার বুঝিয়ে দিয়েছেন; তা অকল্পনীয়। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর মতন স্পর্ধা আমার নেই। কেবল এইটুকু বলবার যে এ গবেষণা যে দুজনের সাহায্য, ক্রমান্বয়ে পাশে থাকা ছাড়া সম্ভব হত না, তার একজন মাস্টারমশাই জয়দীপ ঘোষ।

বিভাগের মাস্টারমশাই, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা আমাকে এ প্রসঙ্গে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। উৎসাহিত করেছেন প্রতিনিয়ত, যাতে এই কাজ আমি ভালো করে করতে পারি। সময়ে-অসময়ে ফোন করে, সশরীরে তাঁকে অজস্র প্রশ্ন করেছি। তিনি সবসময়, আক্ষরিক অর্থেই সেই মুহূর্তে সেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। ঘটনাচক্রে তিনি আমার জন্য নির্ধারিত যে RAC (Research Advisory Committee), তার একজন অধ্যাপক। RAC এর পরামর্শ আমার এই গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথী ভৌমিক, RAC এর আরেকজন সদস্য। তাঁর অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক পরামর্শ এই গবেষণাকে ঋদ্ধ করেছে।

বিভাগের সমস্ত অধ্যাপক এই গবেষণাপত্রের বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের অতি গুরুত্বপূর্ণ মতামত আমাকে দিয়েছেন।

বিভাগীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আইভি আদক প্রতি মুহূর্তে আমার প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছেন।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অভ্র বসু আমাকে এই গবেষণাপত্র প্রসঙ্গে তাঁর প্রাজ্ঞ মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন। লেখার উৎসাহে ঘাটতি পড়লে তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন গবেষণাপত্রটি সময়মত শেষ করবার কাজে। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর গানের ক্লাসের মধ্যে, না বলে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও, অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নানান অতি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, ছবি, চিঠিপত্র আমাকে দেখিয়ে মুগ্ধ, বিস্মিত করে তোলেন। এই গবেষণার কাজকে তিনি উৎসাহ দেন এবং আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানান।

এই গবেষণা পত্রের ভূমিকা অংশে আমি যে ইংরেজি ছবিটির কথা উল্লেখ করেছি, সেই ছবিটি প্রায় জোর করে আমাকে দেখিয়ে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন আমার কাছের বন্ধু, একসময়ের সহপাঠী, বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষক পূজা কর্মকার। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা এবং দাবির অন্ত নেই।

গবেষণাপত্র লেখার মধ্যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ায় লিখতে পারিনি বেশ কিছুদিন, ঘটনাক্রমে এসময় আমি আমার দিদার বাড়িতে ছিলাম। অসুস্থ, বৃদ্ধ কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তির আধার, আমার

দিদা, শ্রীমতী মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সেসময়ে আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন বিভূতিভূষণের গল্প, চিঠির অংশ। তাঁকে আজন্ম ঋণ জ্ঞাপনের চেষ্টা করিনি কখনও, এই মুখবন্ধে তাঁর জন্য এই একটি বাক্য লিখলাম। এছাড়া আমার বন্ধু মধুরিমা গুহরায়, রিয়া মুখার্জী, শিঞ্জিনী সরকার, শারদ্বত মান্না আমাকে সেসময় অজস্র সাহায্য করেছেন গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বন্ধু সুদেব বসু আমাকে নানান প্রয়োজনীয় বই চাওয়ামাত্র পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও।

আমার দিদি বর্ণালি মৈত্র ঘোষ, প্রতি সপ্তাহে, বিভূতিভূষণ সংক্রান্ত আলাদা আলাদা বই এনে দিয়েছেন। আমার ভাবনাগুলি আমি তাঁর সঙ্গে বিনিময় করেছি নির্দ্বিধায়, তিনি তা শুনেছেন ধৈর্য ধরে, মুখে কখনও প্রকাশ না করলেও এখানে উল্লেখ করতেই হবে যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার মা দোলন চাঁপা গুপ্ত সরাসরিভাবে আমাকে এই লেখায় সাহায্য করেননি, তবু প্রতিনিয়ত নানান সংকটের মুহূর্তে আমার পাশে থেকেছেন, আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যাতে আমি এই গবেষণা ঠিক করে শেষ করতে পারি।

প্রথমে উল্লেখ করেছি, এই গবেষণাপত্রের কথা দুজনের সাহায্য ছাড়া লেখা, এমনকী ভাবাও অসম্ভব ছিল। তার একজন আমার তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যাপক জয়দীপ ঘোষ, অন্যজন আমার বাবা দেবাশিস গুপ্ত। দিনের যে কোনও সময়, বাড়ির বইয়ের জঙ্গলের মধ্যে থেকে বিভূতিভূষণ সংক্রান্ত বই আমি তাঁকে বের করে দিতে বলেছি। অনুরোধের ভঙ্গিতে বলিনি বলা বাহুল্য। তিনি আমার সেই প্রায় নির্দেশ নির্বিবাদে মেনে নিয়ে বাড়ির সম্ভব-অসম্ভব নানান স্থান থেকে সেইসব দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য বই আমাকে বের করে দিয়েছেন। তাঁর কাজের মধ্যেও আমি তাঁকে বিরক্ত করতে পিছপা হইনি। করে চলেছি এবং আগামী দিনেও করব। আজ আমার যেটুকু ভাববার, লিখবার ক্ষমতা; একান্তভাবে তা তাঁরই হাতে গড়ে উঠেছে। বড় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে আমার মাস্টারমশাইরাও সেভাবেই আমাকে সাহায্য করেছেন, শিখিয়েছেন।

প্রতি মুহূর্তে এই প্রত্যেকের কাছে আমি শিখছি, আগামী দিনে শিখবো।

মুখবন্ধ হিসাবে এই লেখা খানিক বড় হয়ে গেল, কিন্তু এই সমস্ত মানুষের সাহায্য এবং সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করে উপায় ছিল না। এছাড়া আরও কারুর কথা উল্লেখ করতে

আমি যদি ভুলে গিয়ে থাকি, যিনি বা যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, তবে সে ভুল নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত। তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

একটি ছবির প্রসঙ্গ দিয়ে লেখার সূত্রপাত করা যাক। ছবির নাম Coco। পরিচালক হলেন Lee Unkrich আর Adrian Molina। ২০১৭ সালে Pixar, Walt Disney Pictures এর প্রযোজনায় এই ছবি বেরোয়। ছোটদের জন্য, ছোটদের মনের মতন করে নির্মিত ঝলমলে রঙিন Animated ছবিটি বড়োদেরও ভাবিয়ে তুলতে সক্ষম। ছবির আট নয় বছরের খুদে গান পাগল নায়ক Miguel তারই পূর্বপুরুষ Alberto De La Cruse এর ভুলে যাওয়া ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে বের করে ফেলে অসম্ভব কিছু রোমহর্ষক তথ্য। যা তাদের গোটা পরিবারের মধ্যেকার দীর্ঘদিনের ভুল বোঝাবুঝিকে মিটিয়ে দিতে পারে শেষপর্যন্ত, কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন থাক। এখন বরঞ্চ আলোচনা করা যাক ছবির সেই অংশটি নিয়ে যখন thanks giving ceremony তে জীবন্ত মিগুয়েল ভুল করে গিয়ে পড়ে প্রেতলোকে, যেখানে অবশ্যই তার প্রবেশ নিষেধ। তবু এক চালচুলোহীন গরিব ভূত হেক্টর তাকে রঙ-চঙ মাখিয়ে 'ভূতের মত' সাজিয়ে ফেলে। আর তারপরে পরিচালক সেই হেক্টরের মুখ দিয়েই বলিয়ে নেন জীবন মৃত্যু সংক্রান্ত কিছু ভয়ংকর সত্যি কথা। ছোট্ট মিগুয়েলের চোখের সামনে যখন এক অশীতিপর অক্ষম নড়বড়ে অতিবৃদ্ধ ভূত বিলীন হয়ে যায়, ছেলেটি প্রশ্ন না করে পারেনি ভূতেরও তবে মৃত্যু হয়? ত্রৈলোক্যনাথ অনেকদিন আগে বলেছিলেন, মানুষ মরে ভূত আর ভূত মরে মার্বেল হয়, কিন্তু মিগুয়েল তো আর 'কঙ্কাবতী' পড়েনি। তার পক্ষে এ প্রশ্ন খুব অস্বাভাবিক ছিলো না। বালকের প্রশ্নের উত্তরে হেক্টর বুঝিয়ে দেয়, সবই পৃথিবীর বেঁচে থাকা মানুষের হাতে। যতদিন মানুষ তাদের মৃত আত্মীয়কে মনে রাখেন, তাঁর স্মৃতি তাদের আনন্দ-বেদনায় ভরিয়ে তোলে, ঠিক ততদিনই মেয়াদ ভূতদের। স্মৃতি যতদিন সতেজ, ভূতরা ততদিন তরতাজা, স্মৃতি দুর্বল অর্থাৎ ভূতদের বার্ধক্য... এভাবেই চলতে পারতো, কিন্তু মানুষের স্মৃতি শাশ্বত নয়, সময়ের হাতের খেলনা মাত্র। জীবিতের মন থেকে যেদিন মৃত আত্মীয়ের সবটুকু স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে, যেদিন পৃথিবীর একটি মানুষও আর তাকে মনে রাখবে না, ঠিক সেইদিনই ভূতেরও মৃত্যু হবে চিরতরে। সেইদিনই তারা মহাবিশ্বের কোনও অনন্ত শূন্যে স্রেফ বিলীন হয়ে যাবে।

মৃতের আসল বসবাস তবে কি একমাত্র জীবিতের মনেই!

মহাভারতের বনপর্বের আরণেয় পর্বাধ্যায়ে, দেখা যায় যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর।

যক্ষ প্রশ্ন করলেন, বার্তা কী? আশ্চর্য কী? পন্থা কী? সুখী কে?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন :

"অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে

সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।

মাসর্তুদর্বী পরিঘট্টনেন

ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।।"[১]

একটা মোহের কড়াইয়ে কাল বাসময় সমস্ত প্রাণীকে পাক করছে। সে রান্নার আগুন স্বয়ংসূর্য, দিনরাত্রি তার জ্বালানি, মাস-ঋতুচক্র তার পরিপাকের হাতা। সেই বিশাল রন্ধন যজ্ঞে প্রতিনিয়ত লক্ষ-কোটি জীব চিরকালের মতন চোখ বুজছে। এ হত্যাকান্ড ঘটছে বাদবাকি সমস্ত জীবিতের সামনেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তবু তারা চিরজীবী হতে চায়।

মহাভারতে যে কথা বলছেন যুধিষ্ঠির, আজ একুশ শতকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা বিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির পরেও এ পরিস্থিতি পাল্টায়নি, মৃত্যু আজও অবশ্যম্ভাবী, তবু মানুষের 'চিরকাল' বেঁচে থাকবার সাধ বিস্মিত না করে পারেনা। কিন্তু কী এই চিরকালের হিসাব? তা এখনো অজ্ঞাত, অস্পষ্ট।

ভীষ্মপর্বে, জম্বুখন্ড বিনির্মাণ- ও ভূমি- পর্বাধ্যায়, ভগবদ্গীতা অংশে, বিষাদগ্রস্থ অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন,

যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাক্যও বলছ।[২]

যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে অর্জুন যখন দেখেন তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁরই আজন্মের আত্মীয়রা, যাঁদের রক্ত তাঁর দেহে প্রবহমান; তাঁরই অস্ত্রগুরুর শিক্ষায় যখন সেই শিক্ষককেই হত্যা করবার সময় আসে, অর্জুনকে তখন মানবোচিত দৌর্বল্য গ্রাস করে। এ পরিস্থিতিতে যথারীতি হাল ধরেন কৃষ্ণ। অর্জুন তাঁকে বিহ্বল হয়ে জানান মধুসূদনের শরণাপন্ন তিনি, ভীষ্ম, দ্রোণকে হত্যার প্রশ্নে কী ধর্ম আর কোনটিই বা অধর্ম, তা বুঝতে তিনি অপারগ। কৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রকৃত পন্ডিতরা কখনো জীবিত বা মৃত কারুর জন্য শোক করেন না। দেহধারী আত্মার জীবনে যেমন শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য

পেরিয়ে মৃত্যু; তেমনই মৃত্যুপরবর্তী অধ্যায়ও সেই পর্যায়েরই অপর একটি অংশমাত্র। এই আত্মা সমস্ত বিশ্বব্যাপ্ত এবং অবিনাশী। মানুষ যেমন জীর্ণ পোশাক পালটে নতুন পোশাক পরেন, দেহী তেমনই পুরনো শরীর ত্যাগ করে সতেজ নতুন শরীর পান।

শান্তিপর্ব মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়, আত্মজ্ঞান- ব্রাহ্মণ-সেনজিৎ-সংবাদ অংশে ভীষ্মের বচন :

-রাজা সেনজিৎ পুত্রের মৃত্যুতে কাতর হয়েছিলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁকে এই কথা বলে প্রবোধ দিয়েছিলেন'

-রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আমি মনে করি, আমার আত্মাও আমারনয়, আবার সমগ্র পৃথিবীই আমার।[৩]

পুত্রের মৃত্যুর পরে রাজা সেনজিৎ যখন পুত্রশোকে অধীর, তখন এক ব্রাহ্মণ তাঁকে যে প্রবোধ দেন তা অত্যন্ত যথাযথ মনে হয়। যদিও মানবমনে সন্তানশোকের অভিঘাতের তীব্রতার কাছে সে বাক্য কতটা স্বস্তি দিতে পারে তা আলাদা বিষয়। তিনি বলেন জীবগণের মিলন-বিচ্ছেদ অত্যন্ত আপেক্ষিক। কোনো প্রাণী অথবা বস্তু, কোনো কিছুর উপরেই অতিরিক্ত হৃদয়-দৌর্বল্য না থাকাই ভালো। কারণ প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই যা অনিবার্য এবং একমাত্র, তা হল বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু। জন্মপূর্বে যে ছিল অপরিচিত, অদৃষ্টপূর্ব; মৃত্যুর পরে সে আবার সেই না দেখতে পাবার জগতেই চলে যাবে। তা নিয়ে শোক অযৌক্তিক। সুখের পরে দুঃখ, পুনরায় সুখ...জীবন এভাবেই চলতে থাকে।

সমগ্র মহাভারত জুড়ে জীবন, মৃত্যু, মৃত্যুশোক সংক্রান্ত এমন নানান উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।

'কঠোপনিষৎ'-এর প্রথম অধ্যায়, প্রথম বল্লীতে মেলে অসাধারণ এক গল্প। যমরাজের সাক্ষাৎ-অপেক্ষায় যমলোকে তিন রাত কাটান নচিকেতা। স্বর্গকামীদের যজ্ঞ হল বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে সর্বমেধে, অর্থাৎ সর্বস্বদানে যখন নচিকেতার পিতা আরুণি উদ্দালক ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনবার নচিকেতা তাঁকে প্রশ্ন করেন তাঁকে কার কাছে অর্পণ করেছেন তাঁর পিতা। কুমারবয়স্ক পুত্রের নাছোড়বান্দা উত্তরে উদ্দালক বিরক্ত হয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলেন যে, 'তোমায় আমি মৃত্যুকে দিলুম' (১/১/৪),

স হোবাচ পিতরং, তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।

দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং, তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি।।[৪]

চকিতে স্খলিত পিতৃবাক্যকে সত্যের মর্যাদা দিতে যমালয়ে পৌঁছোন নচিকেতা। যম তখন প্রবাসে এবং ফিরে এসে দেখেন তাঁর অতিথি তিনরাত্রি অভুক্ত। অনুতপ্ত যম তখন নচিকেতাকে বলেন অনসনক্লিষ্ট এই তিন রজনীর বিনিময়ে তাঁকে তিনটি বর প্রার্থনা করতে।

এই তিনটি বরের তৃতীয়টিই উল্লেখ্য। প্রথম দুটি বরদান অবলীলায় মিটলেও গোল বাঁধে তৃতীয়টি নিয়ে। তিনি এই তৃতীয় প্রার্থনাটির পরিবর্তে নচিকেতাকে অন্যান্য নানান লোভনীয় প্রস্তাব দিতে চান। শতায়ু পুত্রপৌত্রের পূর্বসাধক হও, অজস্র গবাদি পশু-হাতি-ঘোড়া-সোনাদানার মালিক হও, সুবিশাল রাজ্যের প্রভু হও, এমনকি তিনি যথেচ্ছ সম্ভোগের ব্যবস্থাও করে দিতে চান নচিকেতাকে। নচিকেতা তাঁর দাবিতে অটল থাকেন। বয়সে নবীন হলেও সে অবগত ছিল যে ইন্দ্রিয়সুখভোগ স্বল্পস্থায়ী। তিনি সবিনয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় যম তাঁর উপর প্রীত হন।

এই তিন নম্বর প্রার্থনায় কী চেয়েছিলেন নচিকেতা, সেইটিই আলোচনার। এক দার্শনিক প্রহেলিকা থেকে উদ্ধারের আশায় যমকে জিজ্ঞেস করেন, কেউ বলে, প্রেতে মনুষ্যে, অর্থাৎ, মনুষ্য মৃত হলে, অস্তি ইতি, অর্থাৎ, সে আছে; কেউ বলে ন অস্তি ইয়ি, অর্থাৎ, সে নেই। আমি আপনার কাছে এ বিষয়ে উপদিষ্ট হতে ইচ্ছা করি (১/১/২০)।

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে

অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।

এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং

বারাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ।।[৫]

যমের অজস্র প্রলোভন সত্ত্বেও তিনি এই প্রশ্ন থেকে একচুলও নড়েননি। তারপরে সে বলে, পরলোক সম্বন্ধে মানুষের যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তা আপনি ভঞ্জন করুন (১/১/২৯)।

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো

যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।

যোহয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো

নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে।।[৬]

কিন্তু যম কি সেই দ্বিধা ভঞ্জন করতে পারেন? স্বয়ং মৃত্যুর দেবতাও কি স্পষ্ট করে বলতে পারেন মৃত্যু সম্পর্কে শেষ কথাটুকু? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : না। সুনির্দিষ্ট উত্তরের বদলে যমরাজ গোটা 'কঠোপনিষৎ' জুড়ে কিছু অস্পষ্ট উপমা ব্যবহার করেন এবং শেষপর্যন্ত জানিয়ে দেন,

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-

স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।[৭]

অর্থাৎ এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্ত করার ফলে অথবা ধারণাশক্তির সাহায্যে কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যাঁর প্রতি তিনি [ঈশ্বর] অনুগ্রহ করেন, তিনিই এই মৃত্যুর রহস্য জানতে পারেন। এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে 'কঠোপনিষৎ'-এও এর উত্তর মিলবে না। স্বয়ং যমরাজের পক্ষেও যে এর উত্তর নিশ্চিতভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, তার স্বীকারোক্তি ধরা রইল এই শ্লোকে।

মৃত্যু সংক্রান্ত মানুষের চিরকালীন জিজ্ঞাসা এইভাবে শাস্ত্রে, দর্শনে বারবার ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু বারবারই তা উত্তরহীন থেকে গেছে বলেই মানুষ আজও তাই নিয়ে ভাবে, প্রশ্ন করে, চিন্তিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় শাস্ত্রের একনিষ্ঠ পাঠক। তাঁর মৃত্যুবোধের মধ্যে এই শাস্ত্র নির্ভরতা অনেকখানিই টের পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্রেও সব উত্তর মেলে না বলেই আর সবার মতই বিভূতিভূষণকেও নিজের মত করে এর উত্তর খুঁজতে হয়।

মৃত্যু সংক্রান্ত নানান জিজ্ঞাসা মানুষের মনে থেকেছে। মৃত্যুশোক ভোলাতে নানান ভাবে মানুষকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা হয়েছে, মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না, একথা বলে। কিন্তু মানুষের মন কখনো বিশ্বাসী, কখনো আবার তীব্র অবিশ্বাসী। চোখে দেখে, কানে শুনে, স্পর্শ করে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ছুঁয়ে না দেখতে পেলে, যদি মৃত্যুর পরে কিছু থেকেও থাকে, তবে তার সঙ্গে তো অতলস্পর্শী ব্যবধান। আপনজনকে, প্রিয়কে চিরকাল কাছে রেখে দেবার তীব্র বাসনা মানুষকে প্রায় প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়। আর ভাবায় নিজের মৃত্যু। একদিন আমি এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকবো না, যতই আমরা পৃথিবীর গভীরতর অসুখ নিয়ে চিন্তিত হই, তবুও তো আমরা তারই কাছে ঋণী। আমি

থাকবো না, কিন্তু তবু সেদিনও সূর্য উঠবে পৃথিবীতে, শিশুরা হেসে উঠবে, সব চলবে ঠিকমতন, কেবল এই আমি থাকবো না আর, এই বোধ আমাদের ব্যথিত করে তোলে।

"শরীর গলে গেছে, শিথিল ত্বক্ তার

মাথার সব চুলে ধরেছে পাক।

দন্তহীন মুখ, লাঠিতে ভর বুড়ো

তবু বাঁচার আশা- লাগায় তাক।"

-শংকরাচার্য (মোহমুদ্গর)[৮]

যেদিন থেকে জন্ম, কার্যত ঠিক সেইদিন থেকে মৃত্যুর দিনগোনা শুরু। ইংরাজি ভাষা খেয়াল করলেই দেখা যায়, আমরা দিব্যি একটি দুই মাসের শিশুকে বলি- "টু মান্থস ওল্ড্", অর্থাৎ কীনা দু'মাসের বৃদ্ধ। ভাষা আমাদের জন্মের দিন থেকে ভুলতে দিতে চায়না আমরা জরাগ্রস্থ হচ্ছি। ছোটবেলা প্রায় সব শিশুর জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে 'বড়ো' হওয়া। কিন্তু তার মধ্যে কজন বড় হবার পরে বুড়ো হতে চান? কারণ তার পরেই অনিবার্যভাবে আসবে সেই জিনিসটি। মৃত্যু। বয়স যখন অল্প থাকে, তখন নিজেদের মৃত্যু আমাদের তত বেশি ভাবিয়ে তোলে না, যতটা ভাবায় প্রিয়জনের মৃত্যু। সমস্ত কিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখা, চিরস্থায়ীত্বের যে বোধ, তাই মানুষের মনে এই ভয়ের জন্ম দেয়। যে ভয় সম্পূর্ণ মানবোচিত এবং কখনোই অমূলক নয়। আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে শুরু করে মহাকাব্য, দর্শন- সর্বত্র নানাভাবে মৃত্যু পরবর্তী 'জীবন' এর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মৃত্যু নিয়ে শোক করা অনর্থক। সংশয়ে, প্রশ্নে, কৌতূহলে চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। অহরহ মৃত্যু দেখতে দেখতে মানুষের মনে ভয় তৈরি হয়, কিন্তু তবু কখনো সে মনে না করে পারেনা সে সবচেয়ে শক্তিমান, সে চিরজীবী।

যে মৃত্যু জীবনের প্রথম বেলায় শ্যামসমান মনে হয়, তা কি অপরাহ্নে এসেও তেমনটিই থাকে?

সময়, জরা, ব্যাধির অমোঘ নিয়মে বাঁধা সাধারণ মৃত্যু এবং তার ফলে তৈরি হওয়া শূন্যতা, অর্থাৎ শারীরবৃত্তীয় মৃত্যু এবং তাকে ঘিরে আত্মীয়-পরিজনের মানসিক বিপর্যয় কিংবা শরীর-মনের মিলনে যে মৃত্যুর যাওয়া-আসা, তাকে বোঝার চেষ্টাই জন্ম দেয় সেই মৃত্যুবোধ।

এই মৃত্যুকে কেমনভাবে দেখেছিলেন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমনভাবে তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাসের মৃত্যুগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর রচনার ক্ষেত্রে; কীভাবে মৃত্যু, বিচ্ছেদ, চিরকালীনতা, মৃত্যু জনিত অনুপস্থিতি, মৃত্যু যন্ত্রণাকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলা, এক অনন্তের বোধ, এই বর্ণনাতীত বিশাল মহাজগতের প্রেক্ষিতে মানুষের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা সত্ত্বেও বেঁচে থাকবার ইচ্ছে তাঁকে ভাবিয়েছে, প্রভাবিত করেছে তাঁর দিনলিপিকে, ভ্রমণকাহিনিকে, তা নিয়েই আলোচনাই হবে এই গবেষণাপত্রের কাজ।

কেমন সেই দেখা? একরকম হল সরাসরি মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত! মৃত্যুর পরে কী থাকে, কীই বা বদলে যায়, তার উত্তর।

আরেকরকম হল প্রিয়জনের মৃত্যুতে শোককে কেমন করে গ্রহণ করছেন তাঁর চরিত্ররা? কেমন হয় সেই অভিজ্ঞতা!

কিন্তু এর বাইরেও থেকে যায় একটি গভীরতর প্রশ্ন, এই যে জন্মের আগে আর মৃত্যুর পরে অনন্তকাল আমাদের না থাকা, আমার এই না থাকাটাই যেখানে অসীম আর থাকাটাই চূড়ান্ত অল্প। আমাদের এই অনন্ত অস্তিত্বহীনতার পাশে যখন অতি সামান্য থাকাটাকে রাখি, তা এত ছোট আর অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন যে প্রশ্নটা জাগে, সেটা হল, আমার এই থাকাটার তাৎপর্য কী? একশো বছর আগে আমি কারুর স্মৃতিতে ছিলাম না, আমার অস্তিত্ব ছিল না, দুশো বছরের পরে, আমার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কারুর স্মৃতিতে থাকব না। এই ভাবটাকে বিভূতিভূষণ কীভাবে দেখেন, কেমন ভাবেই বা দেখে তাঁর জন্ম দেওয়া চরিত্ররা, এ বিষয়গুলিই হবে এ গবেষণাপত্রের আলোচ্য।

ভূমিকা এবং উপসংহার বাদে চারটি অধ্যায়ে এই গবেষণাপত্রের আলোচনা ভাগ করা থাকবে।

'ভূমিকা'-র পরবর্তী অধ্যায়, অর্থাৎ আমাদের গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়, 'বিভূতিভূষণের ভাবনায় মৃত্যু'। 'অভিযাত্রিক', 'স্মৃতির রেখা', 'তৃণাঙ্কুর', 'ঊর্ম্মিমুখর', 'উৎকর্ণ', 'বনে পাহাড়ে', 'থলকোবাদের একরাত্রি', 'হে অরণ্য কথা কও'; এই গুলি বিভূতিভূষণের দিনলিপি, ভ্রমন-কথা। এর মধ্যে কয়েকটি বইতে একেবারে তারিখ, সময় দিয়ে দিনলিপির আকারেই লিখিত। কয়েকটি আবার কেবলই বর্ণনা। বিভূতিভূষণের এই বইগুলির ক্ষেত্রে দিনলিপি এবং ভ্রমণ-কথা'কে আলাদা করা যায়না অধিকাংশ সময়ে।

দিনগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে ভ্রমণের কাহিনি। তবে সেসব ভ্রমণ কোনও দূর দেশে যাওয়ার গল্প নয় বেশিরভাগ সময়ে। একেবারে পা'এ হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়, তেমন ভ্রমণের কথা আছে বইগুলিতে। আবার দূর পর্বত, অরণ্যের অভিজ্ঞতাও লিখেছেন যত্নে। বর্ণনার অনুপুঙ্খ, ভ্রমণের আনন্দ ছাড়িয়েও কখনও কখনও তার মধ্যে এসে পড়েছে এমন গভীর জীবনবোধ এর কথা, যা শেষপর্যন্ত মৃত্যুর কথা ভাবাতে বাধ্য করে। অনন্ত সময়ের নিরিখে অতি তুচ্ছ সময়ের জীবন, তবু জীবনের আনন্দ আর গতিময়তার কথা লিখিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণের ভাবনায়, তাঁর মনে কীভাবে ধরা দেয় মৃত্যু; তাকে খুঁজে দেখা হবে এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

তবে এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখ্য, তা হল, মৃত্যু, মৃত্যু পরবর্তী জীবন বিষয়ে বিভূতিভূষণের ভাবনার একটা ছবি পাওয়া যায় তাঁর 'দেবযান' উপন্যাসে। 'দেবযান' নিয়ে বিভূতিভূষণের পরিকল্পনা যে দীর্ঘদিনের, একথা আমরা তাঁর জীবনীতে পাই, এও জানতে পারি যে নিজের লেখা এই বইটি ছিল তাঁর প্রিয়। অতএব, তিনি কীভাবে দেখেছিলেন মৃত্যু ও জীবনের পরলোককে, তা দেখে নেওয়া যাবে এই বইয়ের মাধ্যমে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, উপন্যাস নিয়ে আলোচনার জন্য একটি আলাদা অধ্যায় থাকা সত্ত্বেও কেন 'দেবযান' কে বিভূতিভূষণের মৃত্যু সংক্রান্ত ভাবনার অধ্যায় রাখা হল। তার কারণ এই যে, উপন্যাস আলোচনার অধ্যায় যে উপন্যাস গুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে এই উপন্যাসের ফারাক বিস্তর। প্রধানত জীবনের এবং জীবিতের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা সেই উপন্যাসগুলিকে দেখবো। কিন্তু এই উপন্যাসে আছে মৃত্যু পরবর্তী জীবন, যদিও তারই মধ্যে থেকে অন্য একটি দিককেও খুঁজে পাওয়া যায় কীনা, তা যুক্তিযুক্ত কীনা, তাও খোঁজার চেষ্টা করা হবে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায়, 'বিভূতিভূষণের নির্বাচিত ছোটগল্পে মৃত্যু'। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে মৃত্যুর প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি লক্ষ করবার মত। তবে এই গল্পগুলির ধরণে ফারাক আছে। মৃত্যুর ধরণ, মৃত্যু মুহূর্তে যার মৃত্যু হচ্ছে তার অনুভূতি, মৃত্যুতে তার কাছের মানুষদের যন্ত্রণা এবং অনেক ক্ষেত্রে গল্প গুলি উপস্থাপনার ধরণ অনুযায়ী তাদের কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা সম্ভব। এই অধ্যায়ে সেই ধরণ গুলি খুঁজে বের করে তার নিরিখে গল্প গুলিকে আরেকবার পড়ে দেখার চেষ্টা করা হবে। কীভাবে গল্প

থেকে গল্পে মৃত্যুকেন্দ্রিক বর্ণনা পৃথক হয়ে যাচ্ছে, কখনও করুণ-কোমল, কখনও বা চূড়ান্ত নিষ্ঠুর সেই বৈচিত্রকে চিহ্নিত করাই হবে এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

বিভূতিভূষণ যে অতিলৌকিক গল্পগুলি লিখেছেন, সেই গল্পগুলির মধ্যে মৃত্যু আছে বলা বাহুল্য। কিন্তু সেইসব মৃত্যু মানবিক মৃত্যু নয়, সেই মৃত্যুগুলি অস্বাভাবিক মৃত্যু। এই গবেষণা পত্রে কেবলমাত্র সেই মৃত্যু গুলি নিয়েই আলোচনা করা হবে যেগুলি এমনিই ঘটতো, যে কোনও মুহূর্তেই যেমন মৃত্যু আসতে পারে স্বাভাবিকভাবেই। তার মধ্যে দুর্ঘটনা থাকতে পারে, কিন্তু খুন বা অতিমানবিক ক্ষমতার হাতে মৃত্যুকে আলোচনার বাইরে রাখা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়, 'বিভূতিভূষণের নির্বাচিত উপন্যাসে মৃত্যু'। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে চারটি উপন্যাস নিয়ে। সেগুলি হল, 'দৃষ্টি-প্রদীপ', 'অনুবর্তন', 'ইছামতী' এবং 'অশনি-সংকেত'। নির্দিষ্ট চারটি উপন্যাস ছাড়াও বিভূতিভূষণের আরও বিভিন্ন উপন্যাসে মৃত্যু প্রসঙ্গ আছে। তবু তারই মধ্যে থেকে এই চারটি উপন্যাসকে বেছে নেবার প্রথম কারণ, এই চারটি উপন্যাসে আসা মৃত্যু গুলি অথবা চারটি উপন্যাসে মৃত্যুর প্রভাব পরস্পরের থেকে খুবই আলাদা। কিন্তু তাদের মধ্যে মিলের জায়গা এইখানে যে প্রতিটি মৃত্যুই উপন্যাসকে প্রভাবিত করেছে নিজের মত করে। তার ফল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়েছে কিন্তু প্রভাবকে অস্বীকার করা যায়না। এর মধ্যে কোনও উপন্যাসের বিষয়ই হয়ে উঠেছে মৃত্যু, যেমন 'অশনি সংকেত', যদিও মৃত্যু দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে একবারই মাত্র, কিন্তু পাঠক বুঝতে পেরেছেন এই ঘটনার পরিণতি অপেক্ষা করে মৃত্যুর জন্য। 'দৃষ্টি প্রদীপ' এর মৃত্যু জিতু'কে গড়ে তোলবার মাধ্যম হয়ে এসেছে। 'ইছামতী' তে কালের প্রবহমানতার সাপেক্ষে, নদীর স্রোতের গতিময়তার মধ্যে স্বাভাবিক কিন্তু অসাধারণ সব মৃত্যুর ছবি আঁকা হয়েছে। যারা মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে তাদের মৃত্যুমুহূর্তটি বর্ণনা করেছেন ভাষাতীত দক্ষতায়, সেই বর্ণনা, সে মুহূর্তগুলিকে উপেক্ষা করে উপন্যাসকে পড়া সম্ভব নয়। 'অনুবর্তন' এর মৃত্যু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দারিদ্রজনিত মৃত্যু। একটি বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে কঠিন পরিস্থিতি ও দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই এবং তারই পরিণতি হিসাবে মৃত্যু এসেছে, এসেছে অপ্রাপ্তিজনিত নিতান্ত মানবিক বেদনাবোধের কথা।

কাহিনির ভিন্নতা এবং বৈচিত্রে'র মধ্যে মৃত্যুর অবস্থানকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হবে এ অধ্যায়ের কাজ।

পঞ্চম অধ্যায়ের নাম 'জীবন-মৃত্যু এবং অপুর জগৎ'। উপন্যাসের জন্য একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় থাকা সত্ত্বেও এই দুটি উপন্যাসের জন্য একটি আলাদা অধ্যায় রাখা হল, তার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথাও বলবার, তা হল রচনার দিক থেকে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' বিভূতিভূষণের একেবারে প্রথম দিকের রচনা। কিন্তু অধ্যায় হিসাবে একে রাখা হয়েছে একেবারে শেষে। তার অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে।

ব্যক্তিগত দুর্বলতার কথা বাদ দিলেও, এই দুটি উপন্যাস যে বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এ কথা বলবার অপেক্ষা রাখেনা। অপু'র জীবন নির্মিত হয়েছে বেশ কিছু মৃত্যুর উপরে। তার জীবনের পথে পথে বিভূতিভূষণ ছড়িয়ে রেখেছেন কিছু অপরিহার্য মৃত্যু, যা তাকে 'অপু' হিসাবে সাবলীল করে তুলেছে। অপু'র পথ চলা তার একার। সেই চলবার পথে তার সঙ্গে দেখা হবে বিভিন্ন মানুষের, তাদের প্রভাব তার জীবনে থাকবে গভীরভাবে। কিন্তু তারা থাকবেনা। কোনও বন্ধন যাতে অপু'র চলা'র পথে বাধা না হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন স্রষ্টা। অপুর জীবন, অপু'র প্রবলভাবে বাঁচবার সাপেক্ষে আমরা পড়ে দেখবো তার প্রিয়জনদের মৃত্যুকে। দেখবো অপু কেমনভাবে গ্রহণ করছে সেইসব মৃত্যুকে; বেদনাবোধ সত্ত্বেও বিস্মিত, পুলকিত করছে তাকে মৃত্যুগুলি, তার জীবনে এনে দিচ্ছে বৃহত্তর মুক্তির স্বাদ।

এই গবেষণাপত্রটি যখন ভাবনা চিন্তার স্তরে, সেসময় প্রথম যে দুটি রচনাকে ভিত্তি করে সমগ্র গবেষণাপত্রের পরিকল্পনা করা হয়, তা হল এই দুটি উপন্যাস। বাকি প্রতিটি অধ্যায়কে শেষপর্যন্ত ধারণ করে রয়েছে এই বিশেষ অধ্যায়টি। এই অধ্যায় এই গবেষণার ভিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহার অংশে, আগের অধ্যায়গুলির একটা সমাপ্তিতে পৌঁছোনোর চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা যারা পড়ছি, লিখছি, ভাবছি, ভয় পাচ্ছি মৃত্যুর... তারা সকলেই মৃত্যুকে কখনো কাছের থেকে, কখনো আবার দূর থেকে দেখেছি। কখনো আঘাত পেয়েছি প্রবল, কখনো শক্ত থাকবার চেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের কারুর হওয়া সম্ভব নয়। ফলত এ গবেষণপত্র হবে একজন জীবিতের চোখে দেখা আরেক

জীবিত মানুষের মৃত্যুকে দেখার পাঠ। যা শেষপর্যন্ত হয়তো বেঁচে থাকবার ইচ্ছেকেই, এইপারের মানবিক জীবনকেই উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চেষ্টা করবে।

তথ্যপঞ্জি :

১। বসু, রাজশেখর, *কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত,* কলকাতা : এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬৩।

২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭৭।

৪। গম্ভীরানন্দ (স্বামী) (সম্পা.), *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী-* প্রথম ভাগ, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৬।

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৮।'

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৩।

৮। চক্রবর্তী, অরিন্দম, "জরামর্শ", *অনুষ্টুপ,* শারদীয় সংখ্যা ২০১৬, অনিল আচার্য (সম্পা.), কলকাতা : ২০১৬, পৃষ্ঠা ১৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভূতিভূষণের ভাবনায় মৃত্যু

ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটে নি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেচি মাত্র, কিন্তু তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি- কেউ দেখায় নি। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তোমার ভাল লাগবে বলে তোমার ফরমাশ মত তো ধূমকেতু উঠতে পারে না। এখনও ৪৫ বছর দেরি আছে আবার সেটা ফিরে আসতে। ততদিন অপেক্ষা কর।

এখন তোমার বয়েস ১৫ তো? ১৫+৪৫=৬০ বছর যখন তোমার বয়েস হবে, তখন যদি ধূমকেতু দেখতে পাও- আমার কথা তোমার মনে হবে কি তখন? আমি তখন মরে ভূত হয়ে যাবো। তুমি তখন বৃদ্ধা, নাতিপুতি বেষ্টিতা হয়ে গল্প করবে বসে সন্ধ্যাবেলায়। নাতনীকে আঙুল দেখিয়ে বলবে- ওই দ্যাখ রেখা, হ্যালির ধূমকেতু উঠেচে- বিভূতিবাবু বলে একজন লোক আমার ছেলেবেলায় আমায় বলেছিল, এ ধূমকেতু আমি দেখবো। আজ বিভূতিবাবুর কথা তাই মনে পড়চে।

রেখা বলবে- কে বিভূতিবাবু ঠাকুরমা?

তুমি বলবে- ওই আমাদের সেকেলে একজন লেখক ছিল, বেশ বইটই লিখতো-

রেখা ভবিষ্যত যুগের মেয়ে তো- তাই ছোট বোন শিখার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে বলবে- ঠাকুরমার যেমন কথা তাই! কোথাকার কে বিভূতিবাবু, সে নাকি আবার বই লিখতো! আমাদের নবজীবন বাবু কি প্রদীপবাবুর মত লেখক কোন কালে বাংলা দেশ দেখেচে? ঠাকুরমার সব সেকেলে ঢং- তারপরে দুইবোনে খিলখিল করে হেসে উঠবে।

আর আমি? কোথায় তখন আমি?... হায় রে!

মৃত্যুলোকের পার থেকে হয় তো সস্নেহ দৃষ্টিতে ভবিষ্যত যুগের নবীনা বালিকা দুইটির দিকে চেয়ে ভাববো- একদিন ওদের ঠাকুরমা ওইরকম বালিকা ছিল, ওদের মতই। তার নাম কল্যাণী- কিন্তু নাতনীরা হয়তো সে নাম জানে না। বুড়ী ঠাকুমার নাম জানবার জন্য তাদের তত আগ্রহ নেই, নিজেদের প্রসাধন নিয়েই ব্যস্ত। তরুণ মাত্রেই স্বার্থপর কিনা- নিজেদের কথা ছাড়া অপরের কথা ভাববার অবকাশ বা স্পৃহা ওদের বড় একটা থাকে না।[১]

১৩৪৭ সালের তেসরা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, কলকাতা শহরের ৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট থেকে স্ত্রী রমা দেবীকে বিভূতিভূষণ চিঠি লিখেছিলেন। পাঠকরা জানেন না যে এই ঘটনার ষাট বছর পরে পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে, সেদিনকার সেই কিশোরী তার আকৈশোর কৌতূহলের ধূমকেতু দেখতে পেয়েছিলেন কিনা। তবে এই চিঠি পড়লে

সময়ের নিরিখে মানুষের জীবৎকালের অসীম ক্ষুদ্রতার কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হতে হয় নিঃসন্দেহে, যে রোমাঞ্চ শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় বেদনায়, অনস্তিত্বের বেদনায়। প্রিয়জনদের ফেলে রেখে এক নামহীন অজানা গন্তব্যে বাধ্যত হারিয়ে যাবার বেদনায়। কৌতূক, আনন্দভরা চিঠিটিতেও সেই স্বাদটুকুর ছাপ টাটকা পাওয়া যায় এখন এই প্রায় আট দশক পরেও।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসের চরিত্ররা তাদের স্রষ্টার মতই তীব্র আকর্ষণ বোধ করত মহাকাশের প্রতি, নক্ষত্র-মন্ডলী, ছায়াপথের প্রতি। অপু, জিতুর সেই কৌতূহল তারা কোথা থেকে আয়ত্ত করছে, তা বোঝা যায় বিভূতিভূষণের সমসাময়িক দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনিগুলি পড়লে।

লেখকের উপন্যাস, ছোটগল্প পড়লে, তাঁর প্রতি, তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনার প্রতি যে উৎসাহ তৈরি হয় পাঠকের, তা নিরসনের একমাত্র উপায় সম্ভবত লেখকের দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনি বা ব্যক্তিগত চিঠিগুলি। যদিও এ প্রশ্ন সঙ্গত যে দিনলিপিতে লেখক তাঁর মনের সব কথা প্রকাশ করেন কি? তা অবশ্য সম্ভব নয়, তবু দিনলিপির থেকে বেশি লেখকের মনের কাছাকাছি পৌঁছোবার উপায় সাধারণ পাঠকের থাকা সম্ভব নয়। বড়জোর তাঁরা পড়ে দেখতে পারেন লেখক-ঘনিষ্ঠদের স্মৃতিকথা। গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে চেষ্টা করা হবে বিভূতিভূষণের স্মৃতিকথাগুলিকে পড়ে দেখতে। যা থেকে তাঁর একান্ত ভাবনাগুলি খুঁজে পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের দিনলিপি এবং ভ্রমণ-কাহিনি গুলিকে সব সময় আলাদা ভাবে ভাগ করা সম্ভব হয় না। দিনলিপি গুলিতে তিনি অনেক সময় সাল, তারিখের উল্লেখ করলেও; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই নিয়ম মেনে চলেননি। আর ভ্রমণ-কাহিনিগুলির ধরণও কিছুটা দিনলিপির মতই। সময়ের এবং রচনার ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পরপর দেখা যাক এই বইগুলিকে।

বিভূতিভূষণ রচিত প্রথম সচিত্র দিনলিপি ও ভ্রমণ কাহিনি হল ‘অভিযাত্রিক’। ‘মিত্র ও ঘোষ’ বিভূতিভূষণের গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম ‘অভিযাত্রিক’ প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালের ২২ মার্চ।

এই ১৯৪১ সালেই, বাংলা ১৩৪৮ এর ১ লা শ্রাবণ 'স্মৃতির রেখা' বই প্রকাশিত হয়। এই বইটি, সাল-তারিখের স্পষ্ট উল্লেখ করে দিন অনুযায়ী লেখেন তিনি। প্রকাশক 'মাধব ঘোষাল কলিকাতা'।

মার্চ, ১৯৪৩, বাংলা চৈত্র ১৩৪৯ এ প্রকাশিত হয় 'তৃণাঙ্কুর'। প্রকাশ করেন 'মিত্রালয়'।

'মিত্রালয়' থেকেই ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় এর পরের দিনলিপি ঊর্ম্মিমুখর।

১৯৪৬ সালে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে দিনলিপি 'উৎকর্ণ' প্রথম প্রকাশিত হয়।

'মিত্রালয়' থেকে 'বনে পাহাড়ে' বইটি প্রকাশিত হয়, দিনলিপির আকারে লেখা হলেও এটিকে ভ্রমণ-কাহিনি বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থেরই পরিশিষ্ট হিসেবে 'থলকোবাদের একরাত্রি', 'বিভূতি-রচনাবলী'তে মুদ্রিত হয়।

'হে অরণ্য কথা কও' বিভূতিভূষণের জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ দিনলিপি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'আরতি এজেন্সী' থেকে ১৯৪৮ সালে।

ক. অভিযাত্রিক :

গ্রন্থ প্রকাশের আগে 'অভিযাত্রিক' কোনও মাসিক বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি। এই বই তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর ভাগিনেয়ী উমাকে। প্রথম যৌবনে কেশোরাম পোদ্দারের 'গো-রক্ষা সভা'র ভ্রাম্যমান পরিদর্শক রূপে অবিভক্ত বাংলার বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা ও নিম্ন বর্মার আরাকান অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা পরিভ্রমণ করেছিলেন। তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এই বইতে। সেই সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে এবং ভাগলপুরে থাকাকালে বিহার রাজ্যের দুই-এক জায়গায় বেড়ানোর বর্ণনাও দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। একেবারে রোজনামচার আকারে এই বই লেখা হয়নি।

> ১৯২২ সালে অ্যাংলো স্যানসক্রিট ইনস্টিটিউশনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে বিভূতিভূষণ কিছুদিন ছিলেন কলকাতায় ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসবাড়িতে। আর সেই মেসেরই আর একজন আবাসিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। রিপন কলেজে যখন বিভূতিভূষণ এবং নীরদচন্দ্র দুজনেই পড়তেন, তখন তাঁদের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তখন ছিল পরিচয় মাত্র, আর ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকবার সময়েই সে পরিচয় একান্ত নিকট বন্ধুত্বের অবয়ব পেল।[২]

অ্যাংলো স্যান্‌সক্রিট ইনস্টিটিউশন স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবার পরে নীরদচন্দ্র'র সঙ্গে বিভূতিভূষণ দেখা করতে এলে নীরদচন্দ্র চৌধুরী অবাক হয়ে যান এই শুনে যে বিভূতিভূষণ কোনও উন্নততর জীবিকার সন্ধান পেয়ে কাজ ছেড়েছেন তা নয়, তিনি এখন যথার্থই কর্মহীন এবং তার জন্য তাঁর মনে কোনও গ্লানি নেই। বিভূতিভূষণের চরিত্রের এই দিকটির স্পষ্ট ছাপ পড়ে পরবর্তীকালে 'অপরাজিত'র অপুর মধ্যে। যদিও ছাপার অক্ষরে অপুর জন্ম এই ঘটনার প্রায় সাত বছর পরে।

> ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিংয়ের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়া শুইয়াছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় শুইয়া তাহার মনে হইল, আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই- আর বেলা দশটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না- আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে- আজ সে মুক্ত!...মুক্ত!...মুক্ত!- আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে!... কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল- বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস। বহুকাল পর স্বাধীনতা আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ঐ আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূর পথের পথিক- অজানার উদ্দেশে সে যাত্রার আরম্ভ হয়ত আজই হয়, কি কালই হয়![৩]

এই যে এমন বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস, তা কীসের আনন্দে? এর পিছনে কোনও 'সাফল্য' নেই সে অর্থে। সাধারণ মানুষ চাকরি হারালে এমন পুলকিত হতে পারে না। এই যে মুক্তির বোধ, সেই বোধের জন্ম যে অপুর আগে বিভূতিভূষণকে আলোড়িত করে, এ বিষয়ে সংশয় থাকেনা। আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রের মতই যিনি বহুদূরের পথিক। আক্ষরিক অর্থেই অজানার উদ্দেশে যে যাত্রা অপেক্ষা করছিল তাঁর জীবনে অল্প কিছুদিনের মধ্যে, তার বিবরণই মেলে 'অভিযাত্রিক' এ। সেই ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের ঘরটিতেই নীরদ চৌধুরী তাঁকে পাকাপাকিভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেন। এই সময়টিতে কখনও ভ্রমণের একান্ত ইচ্ছায় এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়তেন বিভূতিভূষণ। অর্থনৈতিক সম্বল ছিল অল্প। তাই নিয়ে পায়ে হেঁটে কলকাতা ছেড়ে সামান্য অল্প দূরে বেরিয়েও মিলেছে অনন্ত আনন্দের স্বাদ। হেঁটে চলেছেন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে। এই পথে প্রায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে বেরোতেই যে আনন্দ, যে অজানাকে আবিষ্কারের বিহ্বলতা, সেই বিহ্বলতা, বিস্ময়ের মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলির বীজ।

> জীবনে একটা সত্য আবিষ্কার করেচি অভিজ্ঞতার ফলে। যে কখনো কোথাও বার হবার সুযোগ পায়নি, সে যদি কালেভদ্রে একটু-আধটু বাইরে বেরুবার সুযোগ পায়-যতটুকুই সে

> যাক না কেন, ততটুকু গিয়েই সে যা আনন্দ পাবে- একজন অর্থ ও বিত্তশালী Blase´ ভ্রমণকারী হাজার মাইল ঘুরে তার চেয়ে বেশি কিছু আনন্দ পাবে না।[৪]

এই ভ্রমণের অন্যতম একটি অঙ্গ ছিল, নতুন স্থানের সঙ্গে নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। গ্রামের গুরুমশাইয়ের গ্রাম্য পাঠশালা, তাঁদের দরিদ্র পরিবারের আন্তরিকতা-আতিথেয়তা, বাড়ির ছোট মেয়েটির বই পড়বার আগ্রহ- এসবই তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় হয়ে থেকেছে।

যেমন থেকেছিল অপুর। এই প্রসঙ্গে আর একবার অপুকে উল্লেখ করতে হয়। জীবনে প্রথমবার একা একা অপুর পথে বেরনো, বিদেশযাত্রা ছিল গঙ্গানন্দপুরে দুঃসম্পর্কের এক পিসিমার বাড়ি যাওয়া। সে বিদেশ ছিল বাড়ির কাছটিতেই। তবু সেই সামান্য যাত্রা অপুর স্মৃতির ভান্ডারে অক্ষয় হয়ে ছিল। সেই গঙ্গানন্দপুর থেকে ফেরবার পথে মুখচোরা অপুও যেচে ভাব করে নিয়েছিল অচেনা পথচারীদের সঙ্গে।

> যাইতে যাইতে তাহার মন পুলকে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না যে, সে কী ভালোবাসে এই মাটির তাজা রোদপোড়া গন্ধটা, এই ছায়াভরা দুর্বাঘাস, সূর্যের আলোমাখানো মাঠ, পথ, গাছপালা, পাখি, বনঝোপ, ঐ দোলানো ফুলফলের থোলো, আলকুশি, বনকলমি, নীল অপরাজিতা। ঘরে থাকিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা হয় না; ভারি মজা হয় যদি বাবা তাহাকে বলে- খোকা, তুমি শুধু পথে পথে বেরিয়ে বেড়াও, তাহা হইলে এইরকম বনফুল-ঝুলানো ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের তলা দিয়ে ঘুঘু-ডাকা দূর বনের দিকে চোখ রাখিয়া এই রকম মাটির পথটি বাহিয়া শুধুই হাঁটে- শুধুই হাঁটে। ... মাঝে মাঝে হয়তো বাঁশবনের কঞ্চির ডালে ডালে শর্-শর্ শব্দ, বৈকালের রোদে সোনার সিঁদুর আর রঙ-বেরঙ- এর পাখির গান।[৫]

তবে অ্যাংলো স্যান্‌সক্রিট ইনস্টিটিউশনের চাকরি ছাড়বার পরে বিভূতিভূষণের কর্মহীনতা অবশ্য তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটি অদ্ভুত কাজ পেয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ। মাড়োয়ারী কোটিপতি ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষণী সভায় প্রচারকের চাকরি।

> আমি চাকুরি উপলক্ষে এক বছর পূর্ববঙ্গ আরাকানের মাংডু অঞ্চলে যাই। সে সময় রেলে স্টীমারে আমার অনেক অদ্ভুত ধরণের অভিজ্ঞতা হয়। অন্য কোনো ভাবে এদের বলা যায় না, এক এই ধরণের ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া। তাই এখানে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবো। গোড়া থেকেই কথাটা বলি।
>
> কলকাতায় বসে আছি, চাকুরি নেই- যদিও চাকুরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি।

> একটি মাড়োয়ারী ফার্মের বাইরে দেখলুম বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, দুজন লোক তারা চায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঢুকে পড়লুম আপিসের ভেতরে। আপিসটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের।...[৬]

সেই চাকরিটি ঘটনাচক্রে হয়ে যায় তাঁর। গোরক্ষণী সভার প্রচারকের মাস মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা। এই চাকরি বিভূতিভূষণকে আকৃষ্ট করে তার প্রধান কারণ কর্মসূত্রে তাঁকে ঘুরতে হত। চাকরি সূত্রে সেই প্রথম তাঁর দূরদেশে যাওয়া। যার বর্ণনা রয়েছে 'অভিযাত্রিক' এর অধিকাংশ জুড়ে। কুষ্ঠিয়া, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, খালপথে উজীরপুর গ্রাম, ঝালকাঠিবাজার, চট্টগ্রাম, মহেশখালি চ্যানেল নামে সমুদ্রের ক্ষুদ্র খাঁড়ি, সোনাদিয়া দ্বীপ, সমুদ্রে জোয়ারের আবর্তে দিক ভুল করে মারাত্মক আদিনাথ পাহাড়, মংডু ব্রহ্মদেশ, উত্তরপূর্ব ব্রহ্মসীমান্তে আরাকান ইয়োমা।

এই আদিনাথ পাহাড় দেখতে গিয়ে নৌকোয় এমন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়, যা অত্যন্ত বিপদজনক হলেও অসীম আনন্দের স্মৃতি হিসেবেই লেখা হয়ে গেছে 'অভিযাত্রিক'-এ। সমুদ্রে দিক্‌হারা হয়ে পড়া ছিল বিভূতিভূষণের শৈশবের স্বপ্ন, যেমন ছিল অপুর।

> এক মুহূর্তে বুঝে ফেললুম আমাদের সঙ্কটের গুরুত্ব। সামনে আদিনাথ পাহাড়, দিক ভুল করে মাঝি সাম্‌পান নিয়ে এসেচে উত্তর-পূর্ব দিকে- কিছুই চোখে দেখা যায় না, শুধু সাগরের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ানোর শব্দে বোঝা যায় যে পাহাড় নিকটবর্তী। কিন্তু আরও দশ মিনিট কেটে গেল। পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের শব্দ তখনও সামনের দিকে কিন্তু সাম্‌পান যেন সে শব্দকে ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে।
>
> ব্যাপার কি! মাঝিও কিছু বলতে পারে না।
>
> হঠাৎ আমার মনে হল ঠিক সামনেই কাউখালি নদী সমুদ্রে পড়চে; কুয়াশা তখনও খুব ঘন, এসব কুয়াশা ক্রমে ক্রমে পাতলা হয় না, অতর্কিতে এক মুহূর্তে চলে যাবে। আমি মাঝিকে বললুম- মাঝি, নদীর মোহনা সামনে-
>
> মাঝি বললে-বাবু, ও কাউখালি নয়, আদিনাথের ঝরনা, কুয়াশার মধ্যে ওই রকম দেখাচ্ছে, আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি ভেসে। এ জায়গাটা আরও ভয়ানক-
>
> মাঝি আমাকে যাই বলুক, ভয়ের চেয়ে একধরণের অদ্ভুত আনন্দই বেশি করে দেখা দিয়েচে মনে। সমুদ্রে দিক্‌হারা হয়ে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বো এ তো বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল; নাই বা হল খুব বেশি দূর- মাত্র চট্টগ্রামের উপকূল-সমুদ্র, সব জায়গাতেই সমুদ্র, মাথার ওপরকার আকাশ সব জায়গাতেই নীল, কল্পনা সর্বত্রই নীল, কল্পনা সর্বত্রই মনে আনে নেশার ঘোর।[৭]

শেষপর্যন্ত সেই বিপদ থেকে রক্ষা পান বিভূতিভূষণ। প্রায় এমনই অনুভূতি হয়েছিল অপুর শৈশবে, নিশ্চিন্দিপুরের একেবারে শেষের দিনগুলিতে। সেসময় তার সঙ্গে ছিল পটু। নদীর ঘাটে একটা বাঁধা নৌকোর দড়ি খুলে তাতে চড়ে বসে দুই বালক। মনের আনন্দে গলা খুলে দেয়। তারপরে ঝড় ওঠে।

> হঠাৎ পটু ঈশানকোণের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল- ও অপু-দা, কি রকম মেঘ উঠেচে দেখছিস! এখুনি ঝড় এলো বলে-নৌকা ফেরাবি?
>
> অপু বলিল- হোক্‌গে ঝড়, ঝড়েই তো নৌকা বাইতে- গান গাইতে লাগে ভালো, চল্ আরও যাই।[৮]

কথা বলতে বলতে সেদিন সারা আকাশে কাল-বৈশাখী ছেয়ে গিয়েছিল। অপুর নিজেকে 'বঙ্গবাসী' কাগজ পড়া বিলাত যাত্রী মনে হয়েছিল সেও দিন। যে ভ্রমণের নেশায়, পথের আকর্ষণে অক্লেশে উপেক্ষা করতে পারে যে কোনও বিপদকে।

সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পড়া বিভূতিভূষণ আর নদীতে কালবৈশাখীর মধ্যে পড়া ছোট্ট অপু। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান থাকলেও মনের ভাবটি যেন ছিল অবিকল একরকম। অজানার আকর্ষণ যাদের মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে শেখায়। অথবা মৃত্যুকে গ্রহণ করতে শেখায় সহজ ভাবে, এই সুদীর্ঘ চলার পথের একটি বিশ্রামাগার হিসাবে।

খ. স্মৃতির রেখা :

> ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে আসেন। ভাগলপুরের 'বড়বাসা' নামের একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন এবং সেখান থেকে প্রায়ই তাঁকে ইসমাইলপুরের জঙ্গলমহাল দেখতে যেতে হত। ভাগলপুর-পর্ব বিভূতিভূষণের জীবনের এক স্মরণীয় অধ্যায়। 'পথের পাঁচালী', 'স্মৃতির রেখা' এই প্রবাসজীবনের ফসল; 'আরণ্যক', 'দেবযান' ও 'ইছামতী' এই প্রবাসকালের পরিকল্পনা।[৯]

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ১ লা শ্রাবণ, 'স্মৃতির রেখা' দিনলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশে"।

এই বইয়ে একেবারে প্রথম যে দিনের কথা লিপিবদ্ধ আছে, তার তারিখ ২৭ শে অক্টোবর, ১৯২৪, স্থান ভাগলপুর। এবং বইয়ের শেষ দিনটি ২৬ শে এপ্রিল, ১৯২৮। মাঝখানের সময়কাল প্রায় তিন বছর। সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা নানান ঘটনা,

দিনলিপিকারের মনের ভাবনার মধ্যে থেকে খুঁজে আনার চেষ্টা করা যাক একটি কেন্দ্রীয় সুর।

> কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষ রাতের আকাশের পেছনে, এই ফুল ফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দর শান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছপালার বংশ তৈরি হ'ল, আবার চলে গেল- ঐ যে পায়রাদল উড়ছে, ঐ যে নারকেল গাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ঐ যে বন-মূলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি- দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দহতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তার ঠিকানাও মিলবে না- আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলে আসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্নারাত্রির মাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরনো উজ্জয়িনীর কেশধূপবাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোন বিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছু কম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতের অনাগত গ্রাম-বধূদের সুঃদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে... আবার তারা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।[১০]

অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখের এই দিনলিপিতে যাঁকে 'তুমি' সম্বোধন করছেন বিভূতিভূষণ, তিনি ছড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে। সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকে যে সময়ের প্রবাহ শুরু হয়েছে, সেই প্রবাহে অতি সামান্য সময়ের জন্য আমাদের এই আসা-যাওয়া। সেই অল্প সময়ের জন্য অজস্র স্বপ্ন-আশা-আনন্দ-বেদনার জন্ম। এবং তারপরে মৃত্যু। কিন্তু সেখানে সবকিছুর সমাপ্তি নয়, নতুনের মধ্যে আবার সেই একই আনন্দ-বেদনার বুনন চলতে থাকে। যাওয়া-আসার এই খেলা চিরকালীন। নূতনকে পথে ছেড়ে দিতেই হয়, অনন্ত সময় সেই অশ্রু-হাসি ভরা যাতায়াতের সাক্ষী হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণ লেখেন, এই পৃথিবীর জন্ম-মুহূর্তেও 'তুমি' ছিলে, এই পৃথিবীর কোনও অস্তিত্ব যখন থাকবে না, তখনও 'তুমি' থাকবে। এই 'তুমি'র প্রকৃত স্বরূপটি খোঁজেন তিনি।

দিনলিপির মধ্যে স্মৃতিমেদুরতা স্বাভাবিক। ফেলে আসা ছায়াভরা বিকাল সন্ধ্যা তাঁর কাছে রহস্যময়, গভীর। সময় তাদের দু'পাশ দিয়ে ছুটে চলে তাদের নিয়ে ফেলছে বহুদুরে। প্রতিনিয়তই আমরা অতীত আর ভবিষ্যতের টানাপোড়েনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

বিভূতিভূষণের মহাকাশের প্রতি আগ্রহ তাঁর দিনলিপিতে অত্যন্ত স্পষ্ট।

আমাদের এই থাকা, আমাদের অস্তিত্ব, তার ক্ষুদ্রতা আমরা কখনও কখনও টের পাই। স্থানের বিচারে, কালের বিচারে আমরা কত ছোট এই বোধ আমাদের বিচলিত করে। আমাদের মধ্যে এই মোকাবিলা চলতে থাকে যে আমাদের এই অতি অল্প একটু থাকা, এবং প্রায় অনন্তকালের যে না থাকা, এর অর্থ কী? এই না থাকাটাকে আমরা কীভাবে দেখব? আর যদি এই না থাকা টুকুকেই মাথায় রাখি কেবল, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এই থাকাটুকু অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। এই খানেই আসে পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ। কোথাও হয়তো এভাবে না থাকলেও পুনর্জন্মে আমরা থাকব। এভাবেই এই না থাকার সঙ্কটের একটা উপশম খুঁজি আমরা। এই না থাকার বেদনা 'স্মৃতির রেখা' বইয়ের প্রথম দিনলিপিটির 'তুমি' কি প্রশমিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই বেদনার উপশম পেয়েছিলেন অন্যভাবে। মনে পড়ে তাঁর 'সোনার তরী' কবিতাটি।

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই- ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি-
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।[১১]

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে এই কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। আমার জীবনের ফসল সময়ের অন্য ঘাটে পৌঁছে যাবে কিন্তু আমি আর থাকব না।

এক অন্ধকার সন্ধ্যার বর্ণনা পাই এই 'স্মৃতির রেখা'য়। সাল ১৯২৫, তারিখ ২২শে আগস্ট। বর্ষার সন্ধ্যায় একা একা জলার ধারে বনে বসে থাকতে থাকতে বিভূতিভূষণের মনে অদ্ভুত ভাবনা আসে। সেই বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যা, সেই নৈঃশব্দ ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে।

> দেখে বসে বসে মনে হ'ল যেন সৃষ্টির আদিম যুগের এক জলার ধারে বসে আছি। যে জলার ধারের বনগাছ এখন প্রস্তরীভূত হয়ে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে- সেই পঞ্চাশ ষাট

লক্ষ বা কোটি বৎসর আগেকার এক প্রাচীন আদিম পৃথিবীর জলার ধারে...চারধারের গাছপালাগুলো আদিম ধরণের সাধাসিধা গাছপালা... Stigmaria, Sigiloria, Lepidodendrenlongifoliumইত্যাদি। পৃথিবী জনহীন, মনুষ্য সৃষ্টির বহু বহু পূর্ব্বের পৃথিবী এ। আদিম গহন অন্ধকার অরণ্যে শুধু আদিম যুগের অতিকায় অধুনালুপ্ত Saurian রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য্য নেই আকাশে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। প্রতি রাত্রে রূপোলী চাঁদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষ আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে- সে আসবে তবে তার শিল্পকলা সঙ্গীত কবিতা চিত্রে ধ্যানে উপাসনায় চিন্তায় প্রেমে আশায় স্নেহে মায়ায় পৃথিবীর জন্ম সার্থক হবে। অনাগত সে আদুরে ছেলেটির জন্যে পৃথিবীমায়ের বুকটি তৃষিত হয়ে আছে।

কিন্তু ছেলেটি যখন এলো, তখনই কি দেখলে, না সকলে দেখে? ঐ যে অন্ধকার বনের উপরের মেঘান্ধকার স্তব্ধ আকাশে, ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদটুকু দেখা যাচ্ছে, কে ওর মর্ম বোঝে? তাই মনে হয় ভগবান যেন মাঝে মাঝে দুঃখ করেন। তাই এই বিপুল রহস্যে ভরা পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ভাল করে বুঝলে বা বুঝতে চেষ্টা করলে এমন লোক খুব কম। তিনি যে যুগ যুগ ধরে অপস্যার পর শান্ত, মৃত্যুঞ্জয়, অমৃতরস মন্থন করে তুললেন- এই বিরাট, বিদ্রোহী, জড়-সমুদ্র মন্থন করে... তাঁর অনন্ত যুগের তপস্যার ফল এই অমৃত কেউ পান করলে না, কেউ আগ্রহ দেখালে না পান করবার। কোন্ যে তার বরপুত্রেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে পথ ভুলে এসে পড়ে, তারা এ জগতের তুচ্ছ জিনিষে ভোলে না, তাদের মন পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগলালসার অনেক ঊর্দ্ধে, ঐ অমৃতলোকে, ঐ cosmic সৌন্দর্য্যে ডুবে আছে, অনেক বড় vision তারা দ্যাখে, সকলের জন্যে বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে, গানে কবিতায়, ছবিতে কথায় লিখেও রেখে যায়, কিন্তু তাদের কথা শোনে বোঝে খুব কম লোকেই- তার চেয়ে সুদের হিসেব কসলে ঢের বেশী আনন্দ এরা পায়।[১২]

পৃথিবী সৃষ্টির সেই আদি যুগ থেকে বসে আছে তার সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে। পৃথিবীর বহু দিন কেটেছে একা, নিঃসঙ্গ অবস্থায়। এই যে প্রতিদিনের সূর্যাস্ত, তাকে দেখবার মতন মানুষ না থাকলে, প্রাণ না থাকলে কে তার সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দেবে! এই সৃষ্টিকে এত সুন্দর দেখতে পারে মানুষ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কবিতার কথা উল্লেখ না কে পারা যায় না, রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছেন এই কথা তাঁর ব্যক্তিগত ভঙ্গিমায়। কিন্তু দুটি আলাদা সময়ে, দুজন সাহিত্যিকের লেখার মধ্যে এক আশ্চর্য যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

একটি হল, 'শেষ সপ্তক' বইয়ের 'একুশ' নম্বর কবিতা। এই বই প্রকাশিত হয় ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ।

বীরের বলেছিল

অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার কীর্তিপ্রতিমা;

তুলেছিল জয়স্তম্ভ।

কবিরা বলেছিল, অমর করবে

সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে,

রচেছিল মহাকবিতা।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-যোজন পত্রপটে

লেখা হচ্ছিল

ধাবমান আলোকের জলদক্ষরে

সুদূর নক্ষত্রের

হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।...

অমরতার আয়োজন

শিশুর শিথিল মুষ্ঠিগত

খেলার সামগ্রীর মতো

ধু'লায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে।

আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা

মুহূর্তগুলিকে,

তার সীমা কে বিচার করবে?[১৩]

মানুষ অমর নয়। মানুষের মৃত্যু হলে 'মানব' থেকে যায় বটে, কিন্তু সেই 'মানব'-এর ধারনাও অমর নয়। পৃথিবী আর সূর্যের একটা জন্মমুহূর্ত ছিল, তাদের একটা মৃত্যুমুহূর্ত আছে। সমস্ত কিছুই চলেছে সৃষ্টি থেকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে। তার মধ্যে যে 'আমি' আছি অসীম কালের ভিতরে এক ক্ষুদ্রতম মুহূর্ত জুড়ে, সেই থাকার সার্থকতা কী? রবীন্দ্রনাথ বলবেন, মানুষ যা রচনা করেছে তার চৈতন্য দিয়ে, যে সুন্দরের আবাহন করেছে, তার সীমা বিচার করবে কে? সেখানেই সে অনন্য। সেখানেই তার জয়। এই

মানুষ তার চোখ দিয়ে ভয়াল সূর্যকেও সুন্দর দেখেছে। একদিন আমি থাকব না, একদিন এই পৃথিবী, এমনকি এই সূর্যও থাকবে না, সেই বৃহৎ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আমরা নিজেকে দেখব, আমার অস্তিত্ব তখন কোথায় খুঁজব? আমি যে ক্ষুদ্র, এই বিশাল মহাবিশ্বের প্রেক্ষিতে সে কথা বলাও যে ভয়ানক স্পর্ধার। এমন কোনও বিশেষণ নেই যা এই অসামান্য ক্ষুদ্রতাকে বিশেষিত করতে পারে। কিন্তু এই অনন্ত বিশ্ব তার বিশালত্ব নিয়ে, বিপুলতম শরীর নিয়ে আমাকে বোঝেনা। মানুষ তার ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও বুঝতে শিখেছে, সামান্য মুহূর্তকেও অমৃতময় করে তুলেছে। তার প্রজ্ঞা অমূল্য।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের 'আমি' কবিতা। এই বই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে। ১৯৩৬ সালের ২৯ মে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লেখেন।

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে,
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার।
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।
...

মানুষের যাবার দিনের চোখ

বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,

মানুষের যাবার দিনের মন

ছানিয়ে নেবে রস!

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকশে,

জ্বলবে না কোথাও আলো।

বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,

বাজবে না সুর।

সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে

নীলিমাহীন আকাশে

ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।

তখন বিরাট বিশ্বভুবনে

দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে-লোকান্তরে

এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই-

‘তুমি সুন্দর’,

‘আমি ভালোবাসি’।

বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে

যুগযুগান্তর ধ’রে।

প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন-

‘কথা কও,কথা কও’,

বলবেন, ‘বলো, তুমি সুন্দর’,

বলবেন ‘বলো, আমি ভালোবাসি’?[১৪]

সেই যে স্রষ্টা, যে 'তোমাকে' বিভূতিভূষণ দেখতে পান, যে রবীন্দ্রনাথের 'তোমার' 'আমায় দেখবে বলে' সীমাহীন কৌতূহল; তিনি প্রকৃতই একা। বিশ্বসৃষ্টির রচনায় মানুষ হাস্যকর রকম ছোট হতে পারে, কিন্তু সেই তো তাঁকে তাঁর সৃষ্টির দাম দিয়েছে।

মানুষের চেতনাই বস্তুকে সুন্দর করেছে। মানুষের চেতনাই রঙিন করে তোলে সৃষ্টির ক্যানভাস। এইটাই 'আমার' অহংকার, যে আমি তোমাকে বুঝি। এই সৃষ্টিকে এত সুন্দর করে দেখতে পারে মানুষ। আমি ছোট, তাই আমি বিনীত, কিন্তু আমি জানি, এই আমার অহংকার। যেদিন এই সমগ্র পৃথিবীতে, এই মহাবিশ্বে কোথাও কোনও চৈতন্য থাকবে না, "মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান...", সেইদিন মানুষ যখন আর দেখবে না, তখন সবই হবে অনন্ত রাত্রি।

যেদিন দূর-দূরান্তে একটি প্রাণের সাড়াও পাওয়া যাবে না আর, যেদিন ঈশ্বরের এই সৃষ্টিকে 'সুন্দর' বলবার মতন, 'ভালোবাসি' বলবার মতন কেউ আর অবশিষ্ট থাকবে না, সেদিন বিধাতা আবার বসবেন মানুষের সাধনায়, রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য একা বিধাতাকে যেন করুণা করেন। বিভূতিভূষণ সেই অসীম একাকী দেবতার কথা লিখে রাখেন 'দেবযান' উপন্যাসে। সেই নিষ্প্রাণ পৃথিবীতে দেবতার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সেইদিন ঈশ্বর বসবেন মানুষের সাধনায়। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সেই মানুষের জয়গানই করেন। যেমন করেন বিভূতিভূষণ।

তবে বিভূতিভূষণের এ বিষয়ে ব্যক্তিগত এক দুঃখ থেকে যায়। এই যে প্রকৃতি বসে আছে অনন্ত সুন্দরের ডালি সাজিয়ে, এইসব সাধারণ দৃশ্যের মধ্যেও যে অসাধারণত্ব, মেঘের ফাঁকে চঁদের লুকোচুরি, তাকে দেখার মতন করে কয়জন দেখে। কতজন সেই সহজ সুন্দরের মর্ম বোঝে! দেবতা, প্রকৃতি যে অনন্ত অপস্যার ফলে লাভ করলেন প্রাণের অমৃতরস, সেই অমৃত আস্বাদনের আগ্রহ দেখায় অতি অল্প লোক।

তবে তার মধ্যেও দুর্মূল্য দু-একজন এসে পড়ে, যারা এই পৃথিবীর লাভ-ক্ষতি, দেনা-পাওনাকে অতিক্রম করে এই মহাবিশ্বের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে চায়। যেমন চেয়েছিল অপু, যেমন চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, যার ছাপ ছড়িয়ে আছে তাঁর সবকটি দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনি জুড়ে, স্পষ্ট ভাবে।

> রমাপতির কাছে ছেলেদের একখানা মাসিক পত্র আসে, তাহাতে সে একদিন 'ছায়াপথ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িল। 'ছায়াপথ' কাহাকে বলে ইহার আগে জানিত না- এতবড় বিশাল কোন জিনিসের ধারণাও কখনো করে নাই- নক্ষত্রের সম্বন্ধেও কিছু জানা ছিল না। শরতের

আকাশ রাত্রে মেঘমুক্ত- বোর্ডিং-এর পিছনে খেলার কম্পাউন্ডে রাত্রে দাঁড়াইয়া ছায়াপথটা প্রথম দেখিয়া সে কী আনন্দ! জ্বলজ্বলে সাদা ছায়াপথটা কালো আকাশের বুক চিরিয়া কোথা হইতে কোথায় গিয়াছে- শুধু নক্ষত্রে ভরা!...

কাঁঠাল-তলাটায় দাঁড়াইয়া সে কতক্ষণ মুগ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল- নবজাগ্রত মনের প্রথম বিস্ময়!...[১৫]

সে তার কৈশোরের প্রথম বিস্ময়, যে বিস্ময় অপুর বাকি জীবনের স্থায়ী সঙ্গী হয়ে রয়েছিল। এই যে সে বড় মহাবিশ্বের অংশ, শুধু পার্থিব হিসেব-নিকেশের মধ্যে জীবনের সবটুকু সীমাবদ্ধ নয়, এ কথা অপু আর বিভূতিভূষণ, দুজনেই বিশ্বাস করতেন। দুজনের অস্তিত্বের দর্শন যে কেবলমাত্র পৃথিবী কেন্দ্রিক নয়, তারা যে বিশাল স্থান, সময়ের অংশ তা তাঁরা সমগ্র জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন।

আর এই বিশালের প্রেক্ষিতে, অনন্তের মধ্যে নিজেকে বসিয়ে দেখবার মধ্যে যেমন একটা বিহ্বলতা, বেদনাবোধ কাজ করে, তেমনই অর্জিত হয় এক আত্মবিশ্বাস, যা মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

দুর্গার মৃত্যুবর্ণনা করবার সময়ে 'পথের পাঁচালী' তে বিভূতিভূষণ লেখেন,

দুর্গা আর চাহিল না।

আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে- পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে- পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে- দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে![১৬]

'স্মৃতির রেখা'তে তিনিই বলছেন,

সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটীর তীরে। মুখে তাদের প্রাণ-কাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা। কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুকটুকে মুখগুলি- সকলেরই হাতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

... ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিক ওদিক বেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। আর কোথাও কেউ নেই। অপর কোন অরণ্যাণীর গহন নীরব পুঞ্জীভুত অন্ধকার দূর করতে, অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে জ্বেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হ'ল যে মশালচী।[১৭]

একদিকে ‘পথের পাঁচালী’র দুর্গার মৃত্যুমুহূর্তের সেই অনন্তের ডাক, আর অন্যদিকে পৃথিবীর আকর্ষণে নেমে আসা শিশুরা। এই দুই ঘটনা আপাতভাবে পরস্পর-বিরোধী হলেও, শেষপর্যন্ত একটি বিন্দুতে এসে মিলে যায়। সময়ের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে এইসব শিশুদের কাজ হল জীবনের মশাল জ্বালিয়ে এনে, সেই মশাল আর একদল শিশুর হাতে তুলে দেওয়া। যেভাবে ইন্দিরের হাত থেকে নিশ্চিন্দিপুরের ‘সেকাল’-এর রেশটুকুকে দুর্গা এনে তুলে দিয়েছিল একালের আধুনিক মানুষ অপুর হাতে। তার কাজ ওইখানে এসে শেষ হয়েছিল।

মৃত্যু একটি নির্দিষ্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালেও, এক হাত থেকে জীবনের মশাল অপরের হাতে চলে এসেছে প্রাণ সৃষ্টির গোড়া থেকে। যেভাবে ইন্দির দুর্গাকে তুলে দিয়েছিল তাঁর বংশের মশাল, যাতে তার হাত থেকে তা পৌঁছে যেতে পারে তাদের বংশের সুযোগ্য বংশধর অপূর্বকুমার রায়ের হাতে।

বিভূতিভূষণ বলেন, তরল আনন্দ আধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী নয়।

> Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ- Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না- যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশী হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায়- তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।
>
> সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।
>
> ২৮ শে আগস্ট, ১৯২৫।[১৮]

শোক মানুষকে অনেক উদার করে তোলে, এ কথা বলেছেন বিভূতিভূষণ। তীব্র শোকের মুহূর্তে সব হিসেব-নিকেশ এলোমেলো হয়ে গেলেও, সেই শোকের তীব্রতা কিছুটা থিতিয়ে গেলে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারা যায়, যেমন পেরেছে অপু, যেমন জিতু। দিনের আলোয় যেমন তারাদের দেখতে পাওয়া যায় না, রাত্রের গাঢ় অন্ধকার তাদেরকে পরিস্ফূট করে তোলে, সেভাবেই জীবনে আসা ব্যক্তিগত শোকের আলোয়, পারিপার্শ্বিক আরও স্পষ্টতর, অধিক সত্য হয়ে ওঠে।

> সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত- এমনকি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলি-বাড়ির তারের

> খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস... একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস... অতি অল্পক্ষণের জন্য- নিজের অজ্ঞাতসারে।[১৯]

মায়ের মৃত্যুর পর এই অপরিচিত আনন্দের সঙ্গে অপুর প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটিতে লজ্জা করেছিল অপুর। অপরাধবোধ হয়। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই অনুভূতির মধ্যে কোনও মিথ্যা ছিল না। নিজেকে নতুন ভাবে চিনে নেওয়া যায় মৃত্যুর কাছাকাছি এসে।

১৯২৫ সালেরই নভেম্বরের সতেরো তারিখের দিনলিপিতে তিনি লিখছেন, সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু, সবই দুদিনের খেলা।

> কিছুতেই ব্যথিত হবার কিছু কারণ নেই। নদী বেয়ে যে শব ভেসে যাচ্ছে, কে জানে হয়ত দূর কোন অজানা নক্ষত্রে ওর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে। ওর মৃত্যুযন্ত্রণা সার্থক হয়েছে। এই বিচিত্র বিশ্বলীলার সকলেই যে যাত্রী। ফুল, ফল, গাছ, পাখী, মানুষ সকলেই।

তবে এই চেনা পৃথিবীর বাইরের অচেনাকে নিয়ে ভাববার অবকাশ যে কারুর নেই তেমন, এই আক্ষেপ তাঁর প্রতিমুহূর্তেই থেকেছে। যে দু-একজনের চোখ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ধূলিরাশির আবরণ ভেদ করে অনন্ত ঊর্দ্ধ আকাশের বিশ্বজগতের দিকে থাকে, তারা গতানুগতিকের অনেক উপরে।

এরই তিনদিন পর কুড়ি নভেম্বর তারিখে লিখছেন সন্ধ্যায় টেবিলে তার লেখার পাতাগুলো ছড়িয়ে রয়েছে, ফুটনোটে উল্লেখ রয়েছে, এসময়েই তিনি লিখছেন 'পথের পাঁচালী', সম্ভবত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম ফসল। বলেন, কয়েক দশক পরে শারীরিকভাবে তিনি আর উপস্থিত থাকবেন না, থাকবে না সেইদিনের সেই নিঃশব্দ মনোরম সন্ধ্যাটি, ফুলদানির ফুলগুলিও থাকবে না, কেবল হয়তো তাঁর সন্তান, এই লেখাটি থেকে যাবে।

> এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত- হয়ত একান্ন বৎসর পরে আমার কোনও চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা ['পথের পাঁচালী'] হয়ত থেকে যাবে। হয়ত কত লোকের মনে আশা, সান্ত্বনা দেবে। হয়ত পাঁচশত বৎসর পরে- যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে আমি- এই আমি- এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাবো। ...[২০]

এই কয়েকটি বাক্যে যে 'হয়ত'-গুলি ব্যবহৃত হয়েছে, তা যে সর্বাঙ্গীন সত্য হয়েছে তা পরবর্তীর পাঠকরা জানেন। পাঠকরা জানেন তাঁর এই উপন্যাস কত লোকের বেঁচে থাকবার অবলম্বন।

এমনই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে (ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দ)'র '১৪০০ সাল' কবিতায়। এই কবিতা তিনি লেখেন ১৩০২ এর ২ রা ফাল্গুন।

আজি হতে শতবর্ষ-পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে-
আজি হতে শতবর্ষ-পরে।
আজি নববসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ-
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ
আনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ-পরে।।
...
আজি হতে শতবর্ষ-পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে!
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠিয়ে দিলাম তাঁর করে-
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে
হৃদয়স্পন্দন তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,

পল্লবমর্মরে,

আজি হতে শতবর্ষ-পরে।।[২১]

কবির মনে কোথায় যেন বিষাদের সুর থাকে কবিতার প্রথম পঙক্তিতে, সেই অনাগত পাঠকটির জন্য, যিনি তাঁর কবিতা শতবর্ষের পরে পড়ছেন কৌতূহলের সঙ্গে। সেই নবীন পাঠকের কৌতূহলপূর্ণ মুখ তিনি দেখতে পাবেন না আর। আজকের এই নবীন বসন্তের সামান্য রেশ ও আর তখন থাকবে না। তবু কবিতার শেষে পৌঁছে পাওয়া যায় সেই আশার শব্দগুলি, যেখানে কবি ভবিষ্যতের জন্য তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে পাঠান শুভেচ্ছা। তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁরই সৃষ্টি আভিবাদন হয়ে ঝরে পড়বে পাঠকের কাছে।

এই একই দিন, নভেম্বরের কুড়ি তারিখ বিভূতিভূষণ লেখেন, যে কাহিনি যথাযথভাবেই দুঃখের, তা চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। তা চিরকাল লোকের মনে বল দেবে। এই আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল।

বারেবারে যে কথার পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় 'স্মৃতির রেখা' বইতে, তা হল, এই জগতে সব চেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে অজানার আনন্দ। এই একটি বাক্যের মধ্যে তাঁর সেইসময় লিখিত উপন্যাসের মূল সুরটি ধরা থাকে। এই কথাই তো অপুর জীবনের মূল কথা, যে আনন্দের বশবর্তী হয়ে যে জীবনে আসা মৃত্যুগুলিকে গ্রহণ করতে পারে সহজ ভাবে। তার পঠিক জীবনের উদ্দেশ্যটিও এই বাক্যটিতেই ধরা থাকে। আনন্দের রহস্যের গভীরতায় মন ভরে ওঠে। আকাশভরা নক্ষত্রের নীচে দাঁড়িয়ে, নীরবতার মুখোমুখি হয়ে, পৃথিবীর জীবনকে অতিক্রম করে যে জীবন, দৈনন্দিন সাংসারিক কর্ম-কোলাহলের ওই পারের যে জীবন, সেই জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র সেই অনন্তের বোধই মানুষকে এক শাশ্বতর সন্ধান দিতে পারে।

বিভূতিভূষণ লেখেন,

> যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি জগতে সে অতি দুর্ভাগ্য। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।[২২]

মনে পড়ে যায় অপুর পরিচিত কাশীর সেই বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা। বৃদ্ধ, অতি দুঃখী। নিরস, খারাপ মানের লাড্ডুও যে খেয়েছিল উৎসাহ ভরে। কেউ যাকে

ভালোবাসেনা, জগতে যার আপন বলতে কেউ নেই, সেই চিরদুঃখী লোকটির প্রতি কিশোর অপুর মন করুণায় ভরে উঠেছিল।

> করুণা ভালোবাসার সব চেয়ে মূল্যবান মশলা, তার গাঁথুনি বড় পাকা হয়। তাহার শৈশব মনে এই বিদেশী, দুদিনের পরিচিত, বাঙাল কথকঠাকুর তাহার দিদি ও গুল্‌কীর সঙ্গে এক হারে গাঁথা হইয়া গেল সুদ্ধ এক লাড্ডু খাইবার অধীর লোভের ভঙ্গিতে।
>
> ইহার অল্পদিন পরেই কথকঠাকুর দেশে চলিয়া গেল। রাজঘাটের স্টেশনে কথকঠাকুরের নির্বন্ধাতিশয্যে হরিহর অপুকে সঙ্গে করিয়া তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেল।
>
> ...
>
> গাড়ি ছাড়িলে অপু চোখে জল আসিল। বালকের প্রাণে সময়ে সময়ে বয়স্ক লোকের উপর স্থায়ী সত্যিকার স্নেহ আসে। দুর্লভ বলিয়াই তাহা মূল্যবান।[২৩]

যখন এই বই, 'স্মৃতির রেখা' লেখা হচ্ছে, সেসময় অপুকে নির্মাণ করছিলেন বিভূতিভূষণ। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যে মানুষ আদর্শ, সেই সবকটি বৈশিষ্ট্য সঙ্গে নিয়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে অপুর।

১৯২৬ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ভাগলপুরে বসে লিখছেন বিভূতিভূষণ। সেই দিনলিপি শুরু হচ্ছে দুটি শব্দ দিয়ে, "Life! Life!"। লিখছেন গত রাত্রে তিনি অনন্তের মধ্যে জীবনের বিপুল তরঙ্গোদ্দাম অনুভব করলেন। এইখানে আবার আসে মহাবিশ্ব, নক্ষত্রপুঞ্জ, বিস্ময়ের কথা।

> কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো! উন্মাদ উন্মত্ত বিজর বিমৃত্যুগতির বেগে বার হয়ে পড়ো। কি ঘরের কোণে বসে মোকদ্দমার ফাইল আর স্টেটমেন্ট ঘাঁটছে! তোমার মাথার ওপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ উদাস রহস্যময় অজ্ঞাত, নব নব ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজিকে বুকে নিয়ে চলেছে। ধূমকেতু নীহারকণা নীহারিক সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আলোকবর্ষ পরের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুন অজানা প্রাণীজগৎ, বিশাল প্রজ্জ্বলন্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম্‌, ম্যাগনেসিয়াম্‌, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট্‌, এলুমিনিয়াম্‌- প্রচন্ড জাগতিক তেজ X-ray, বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগনেটীক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জ্বলন্তপুচ্ছ, জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতুপিন্ড, প্রস্তরপিন্ডের অতি অদ্ভুত, রহস্যভরা ইতিহাস- এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটী প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্যযুগ অঙ্গার যুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা কত কূলহীন, দিক্‌হীন গর্জ্জমান মহাসমুদ্র- অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে![২৪]

আমরা জানি আলোর বেগ তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে।সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৪৯.৬ মিলিয়ন কিলোমিটার। এবং সূর্য থেকে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট।[২৫]

অতএব আমরা যে সূর্যকে আকাশের দিকে মুখ তুললে দেখতে পাই, সেই সূর্য আট মিনিট আগের সূর্য। একেবারে বর্তমানের সূর্যকে দেখতে পাবার কোনও সম্ভাবনা আমাদের নেই। আমাদের ছায়াপথের নিকটতম প্রতিবেশী ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ২৫ লক্ষ বছর।[২৬] এবং মেঘমুক্ত, দূষণমুক্ত নিবিড় রাত্রে আমরা এই ছায়াপথ দেখতে পাই খালি চোখে। এ কথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সেই পঁচিশ লক্ষ বছরের অতীতের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে আছি।

বিভূতিভূষণ এই আক্ষরিক সংখ্যার হিসেব জানতেন কিনা সে তথ্য আমরা স্পষ্টভাবে পাইনি। কিন্তু তিনি আলোর বেগ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এই অনন্তের আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, এই বিশালের প্রেক্ষিতে মানুষের ক্ষুদ্রতা, এবং এই অসামান্য ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও সেই বিশালত্বের অংশ হয়ে থাকা, তার বিস্ময়, রহস্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই অনন্তের মধ্যে, মহাবিশ্বের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ ও যে অবিশ্রান্ত, কোনও একটি মৃত্যুতে তার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি নয়, এই বোধ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, উপভোগ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যু এই বৃহৎ-এর পটভূমিকায় নতুন থেকে নতুনতর জীবনের কথাই বলে। এই পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র পরিসরের বাইরে যে বিস্তৃত মহাবিশ্ব, তার অজস্র ছায়াপথ, তাতে অসংখ্য নক্ষত্র, সেই নক্ষত্রের অগণন গ্রহ, সেই সব গ্রহে কোনটিতে যে প্রাণ থাকবে এই বিশ্বাস বিভূতিভূষণের ছিল। ফলে জীবনের পরিধিকে তিনি এমন অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কখনও দেখেন নি তিনি। পূর্বোক্ত দিনলিপির অংশটি সেই বিশ্বাসই ব্যক্ত করে।

এ কথা অবশ্য ঘুরে ফিরে বারেবারে এসেছে, ২ রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, বিভূতিভূষণ লিখছেন-

> দূরের ওই তারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় এ রকম হাসিভরা জীবনস্রোত হয় তো ওখানেও চলছে- কে জানে? বিশাল Globular Cluster এর দেশ, বড় বড় Star Clouds, ছায়াপথ, কি অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। শুধু Sagitoriousঅঞ্চলের নক্ষত্র-ঠাসা আকাশটার কথা মনে হলেই মন শিউরে উঠে- পুলকে, অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে।[২৭]

এই সবকিছুর মধ্যে মূল কথাটি হল বিস্ময়। এ প্রসঙ্গে আমাদের চিরচেনা একটি গানের কথা উল্লেখ করতে হয় আরেকবার। আরেকবার ফিরে যেতে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে।

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।।[২৮]

এই গানের কথাগুলি ভেবে দেখলে দেখা যাবে আপাত ভাবে কথাগুলি সাধারণ। আকাশ ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তারই মাঝখানে আমি যে আমার স্থান পেয়েছি, তা তো একটা আকস্মিক ব্যাপার বটেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই আকস্মিকতার থেকেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে আমার বিস্ময়। এই বিস্ময়কে উপলব্ধি করবার জন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথ, এই বিস্ময়ের বোধের জায়গাতেই এই গান অনন্য।

এই বিস্ময়কে অনুভব করেই বিহ্বল হন বিভূতিভূষণ, সেই বিহ্বলতা সঞ্চারিত হয় তাঁরই আত্মজ অপুর মধ্যে।

এর দুই দিন পরে বিভূতিভূষণ লিখছেন,

> আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার- যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগান্তের পর্ব্বত শিখরে নীরবে চিন্তামগ্ন। কত শত জন্মের স্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনী, নির্জ্জন গ্রহের নির্জ্জন পর্ব্বতে, যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে- ধীর, নির্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেম কাহিনীর জালে জালে জড়ানো তরুণ সুন্দর মূর্তি তার। নিস্তব্ধ অন্ধকারে বসে বসে শুধু সে একমনে অপরূপ জীবনরহস্য ভাবে- ভাবে-[২৯]

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ১২৯ তম স্তোত্র 'নাসদীয় সূক্ত' (সৃষ্টি-উৎপত্তি সূক্ত নামেও পরিচিত)-এর কথা উল্লেখ করতেই হয়। এটি বিশ্বতত্ত্ব ও ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তির ধারণার সঙ্গে জড়িত।

নাসদীয় সূক্তের রচয়িতা ঋষি প্রজাপতি পরমেষ্ঠী। স্তোত্রটির দেবতা হলেন ভাববৃত্ত। এটি ত্রিষ্টুপ ছন্দের সাতটি ঋক দ্বারা গঠিত।

এখানে বলা হচ্ছে,

> তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না। যাহা আছে তাহাও ছিল না।

পৃথিবীও ছিল না, অতি দূরবিস্তার আকাশও ছিল না।

আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যাতিরেকে আত্মামাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সর্বত্রই চিহ্ন বর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন আপন হৃদয়ে পর্যালোচনা-পূর্বক আবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন।

রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন। মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধ দিকে রহিলেন।

কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে?

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন কী করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।[৩০]

এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে দেবতারা হয়েছেন সৃষ্টির পরে, এই সমস্ত অন্যান্য সৃষ্টির সঙ্গে একই স্তরে অবস্থান করেন তিনি! তবে এসবের স্রষ্টা কে? কে এই নানা সৃষ্টির কর্তা। এরপরেই বলা হয় সেই আশ্চর্য কয়েকটি বাক্য। তবে এই সৃষ্টি রহস্য তিনি জানেন যিনি এই সমস্ত কিছুর প্রভু। এইখানে আসে সেই আধুনিক 'অথবা', যার মাধ্যমে বোঝানো হয় যে, তিনি জানতে পারেন, অথবা তিনি নাও জানতে পারে। ভারতীয় দর্শনেও রয়েছে এই সংশয়ের বাক্য।

এই সংশয়, এই প্রশ্ন করা, এই কৌতূহল ই মানুষকে চিরকাল ক্ষুদ্র হলেও শ্রেষ্ঠ করে রেখেছে। বিভূতিভূষণও সেই দেবতার কথাই ভাবতে ভালোবাসেন, যিনি দেবতা হয়েও সব জানেন না। তাঁর মধ্যে সেই উচ্চকিত অহংকার নেই, মানুষের সঙ্গে একই

পঙক্তিতে বসতে যিনি স্বচ্ছন্দ। তিনি সব জানেন না, তাই তিনি চিরভাবুক। নির্জনে বসে যিনি মানুষের মতই জীবনরহস্য নিয়ে ভাবেন।

বিভূতিভূষণের 'দেবযান' উপন্যাসের কথা এইখানে উল্লেখ করা জরুরি। এই গবেষণাপত্রে আলাদা একটি অধ্যায় উপন্যাস ও তার মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত থাকলেও 'দেবযান' কে সেই অধ্যায়ে রাখা হয়নি, কারণ অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে দেবযানের মূলগত কিছু পার্থক্য আছে। মৃত্যু পূর্ববর্তী যন্ত্রণা অথবা মৃত্যু-মুহূর্ত কিংবা মৃতকে ঘিরে প্রিয়জনের শোক, মৃত্যুর আবহ বা মৃত্যুর পরিণাম; ইত্যাদি বিষয়গুলি বাদবাকি উপন্যাসে যেভাবে ধরা রয়েছে, এই উপন্যাসে তা নেই। নেই তার কারণ মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন, মানবিক জীবনের বর্ণনা এই উপন্যাসে অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যই আছে। বাদবাকি সমগ্র অংশে রয়েছে মৃত্যু পরবর্তী জীবন। বিভূতিভূষণ যেভাবে এঁকেছিলেন মৃত্যুর পরের পথকে, সেই পথের ছবির বর্ণনাই 'দেবযান'। যদিও পথ বিষয়টি সব জায়গাতেই ধ্রুব। জীবনেরই পথের যে দীর্ঘায়িত অংশটি জীবনকে অতিক্রম করে তার পরবর্তীতে এগিয়ে গেছে, তারই গল্প 'দেবযান'। বিভূতিভূষণের পরবর্তী দিনলিপি 'তৃণাঙ্কুর' নিয়ে আলোচনার সময়ে এই উপন্যাস প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আসতে হবে। 'তৃণাঙ্কুর' এ লেখক নিজেই লিখেছেন এই উপন্যাসের কথা বেশ কয়েকবার।

তার আগে 'স্মৃতির রেখা' সম্পর্কে শেষ কয়েকটি কথা বলতে হবে।

কয়েকটি বাক্য ফিরে ফিরে লিখছেনে বিভূতিভূষণ, তাঁর প্রায় সব দিনলিপি ও ভ্রমণ-কাহিনিতে। 'অভিযাত্রিক' এও প্রায় এক কথা শোনা যায়। যে কথা প্রায় অপুরই কথা। সেই অমোঘ বাক্য হল-

> ভবঘুরের রক্ত আমাকে পেয়ে বসেছিল, তাই আজ বেরিয়ে পড়লাম...
>
> বাবার দেশভ্রমণ বাতিক- সেই বড় দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো... কত পুরাণো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ... সামনেই নিয়ে চল।[৩১]

বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছিল হরিহরের মতই দেশভ্রমণের বাতিক। সেই রক্তেরই বাহক তাঁর পুত্র, ভবঘুরে রক্ত তো তাঁকে পেয়ে বসবেই, যে আকর্ষণে অপু তার শিশুপুত্রকে রেখে বেরিয়ে পড়ে অজানার সন্ধানে।

আর একটি বৈশিষ্ট, তা হল, অতি সাধারণ সব দিন, বিভূতিভূষণের কাছে পরম সুন্দর হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে থেকে দুটি দিনের কথা উল্লেখ করা যাক,

কি অপূর্ব্ব এই জীবন! এই দুঃখের, আনন্দের, শোকের, স্নেহের, আশার, পুলকের ভালবাসার স্মৃতি জড়ানো- এই অপূর্ব্ব গতিশীল সুখদুঃখে মধুর এই সুন্দর জীবন দোলা![৩২]

তারিখ ১১ ডিসেম্বর ১৯২৭। অপরটি হল ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৮।

আজ পূর্ণিমার দিনটা পূর্ণচন্দ্রকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্যেই একটু দেরী করে বেড়াতে বেরুলাম। সুখটিয়া কুলবনেই বেলা গেল। সহদেবটোলায় তেলাকুচা ঝোপে ভরা সেই পথটায় যখন গেলাম তখন সূর্য্যের রাঙা রোদ ঝোপঝাপের গায়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আসছিলাম, প্রতি আকন্দ গাছ, তেলাকুচা লতা, নাটাকাঁটার ঝোপ, ছায়াশ্যামল তৃণভূমি উপভোগ করতে করতে মুখে দোদুল্যমান আলোকলতার স্পর্শ মেখে, পিছনের মাঠে অস্তসূর্য্যের রক্তগোলকটা পিঠের ওপর দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে কুতরুটোলায় এসে পৌঁছোলাম। তারপর পাখীর কাকলি শুনতে শুনতে ডাইনের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, একটু দুরেই সন্ধ্যার কুয়াশায় অস্পষ্ট গঙ্গা ও ওপারে পাহাড়টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এলাম। পূর্ণচন্দ্র ততক্ষণ উঠে গিয়েছে- গঙ্গার জলে দীর্ঘ রশ্মি পড়ে কাঁপছে। দ্বিরা থেকে মাথায় করে কলাই এর ভূষার সাঁজাল দিয়েছে- তারই গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনটা কী অপূর্ব্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে।[৩৩]

সাধারণ, সাংসারিক মানুষের কাছে, এই সব দৃশ্য অতি সুন্দর। কোনও আলাদা সৌন্দর্য এই দৃশ্যে বিন্দুমাত্র নেই। তবুও এই দৈনন্দিন সহজ দৃশ্যে জীবনের প্রতি বিস্মিত, মুগ্ধ হয়ে পড়েন বিভূতিভূষণ। যে জীবনের সময়কাল হয়তো নির্দিষ্ট, কিন্তু মৃত্যুকে অতিক্রম করে যা বহুদূর ৩৪

এই বইয়ের শেষ দিনলিপি বিভূতিভূষণ লেখেন ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসের ছাব্বিশ তারিখ। এই দিনটি তাঁর কাছে স্মরণীয়, সে কথা তিনি নিজেই লেখেন। সেই সঙ্গে স্মরণীয় বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে। সেই উপন্যাস, যাকে নিয়ে তাঁর আশা ছিল, হয়তো বা তাঁর মৃত্যুর পরেও সেই বই কেউ পড়বে। সেই বই পড়ে কেউ জীবনের তাগিদ পাবে। 'পথের পাঁচালী', মৃত্যু দিয়ে গাঁথা জীবনানন্দের বইটি সেইদিনে বিভূতিভূষণ 'বিচিত্রা' তে পাঠান।

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন- এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা' তে পাঠিয়ে দিয়েছি।[৩৪]

গ. তৃণাঙ্কুর :

'তৃণাঙ্কুর' বইয়ের প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ। বইটি উৎসর্গ করেন বিভূতিভূষণ সজনীকান্ত দাসকে। এই বইয়ের আলোচনায় বিস্তারিতভাবে যাবার আগে বিভূতিভূষণের উপন্যাস 'দেবযান' নিয়ে কথা বলে নেওয়া যাক। উপন্যাসের জন্য আলাদা অধ্যায় নির্ধারিত থাকলেও এই উপন্যাসকে এই অধ্যায় রাখা হয়েছে। হয়েছে এই কারণে, যে মানবিক মৃত্যু বর্ণনার অংশ এই উপন্যাসে নিতান্ত কম। মৃত্যু পরবর্তী জীবনের বিচিত্র কাহিনি এই গল্প।

'দেবযান' পরলোকবাসের এক রহস্যময় কাহিনি। যতীনের মৃত্যু থেকে শুরু করে পুনর্জন্মের আগে পর্যন্ত তার পরলোকবাসের ইতিহাসে নিয়ে যায় এই গ্রন্থ। তার পার্থিব জীবনের কাহিনি গ্রন্থের উপক্রমণিকা ও উপসংহার। 'দেবযান'-এর এই পরলোক বিবরণ বিস্ময়কর, কিন্তু আজগুবি নয়। এই পারলৌকিক জগতের মধ্যে একটি সামগ্রিক শৃঙ্খলা, সামান্য ইতস্ততঃ হলেও দুর্নিরীক্ষ নয়। এর সপ্তলোক হল- ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ (স্বর্গ), জনঃ, মহঃ, তপঃ এবং সত্য। 'দেবযান' বই থেকেই আমরা এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাই। প্রত্যেক লোকের আবার সপ্তস্তর হয়। প্রত্যেকবার মানুষ মরে নতুন দেহ ধারণ করে নতুন স্তরে জন্ম নিতে হয়। সাধারণ মানুষ কর্ম অনুযায়ী প্রথম তিনটি স্তরে যাতায়াত করে। মৃত্যুর পর ভূর্লোক থেকে ভূবর্লোকে আসে, সেখান থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে যায়। স্বর্গলোক থেকে আবার পৃথিবীতে জন্ম হয়। একে বল 'মানব আবর্ত'। ভুবর্লোকের বহু আত্মা পুনর্জন্মের তৃষ্ণায় মানুষের বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ভিড় বেশি বলে সবাই দেহ ধারণের সুবিধা পায় না। পৃথিবীর হিসাবে কাউকে কাউকে দশ বছরও ঘুরতে হয়। এই অবস্থাকেই বলে প্রেতযোনি। মানব আবর্তের পরবর্তী অবস্থা- উচ্চতর সাধনার দ্বারা দেবযানে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা। উচ্চতর জীবাত্মারা সেখানে এক কল্পকাল থাকে। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। এই কালব্যাপ্তির নাম কল্প। কল্পান্তে এদেরও পতন হয়। তবে সত্যলোকের পরে ব্রহ্মলোকে যারা যায় তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আর মানব আবর্তে ফিরে আসে না। একেই বলে মুক্তি। সপ্তলোকের শেষ স্তরে যে সত্যলোক, সেই সত্যলোকের উপরে ব্রহ্মলোক। তারও ঊর্ধ্বে পরব্রহ্মলোক বা গোলোক। আর তারও ঊর্ধ্বে নির্গুণ ব্রহ্মলোক, এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সাতজন বিধাতাপুরুষ। এঁদের ওপরে ঈশ্বর। আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা হলেন গ্রহদেব বৈশ্রবণ। যতীন, পুষ্প এরা তৃতীয় স্তরের আত্মা বলে মৃত্যুর পরে এদের সূক্ষ্মদেহ থাকলেও উচ্চতর স্বর্গে কিন্তু আত্মার কোনও নির্দিষ্ট রূপ নেই। অধিকাংশ

সময়েই তারা ডিম্বাকৃতি সোনালী আলোর মত- প্রয়োজন হলে তারা ইচ্ছামত যে কোন মূর্তি ধারণ করতে পারে। রঙের দিক থেকে অতি নিম্নস্তরের আত্মার সূক্ষ্মদেহের রঙ- ধূসর লাল। যতীন ও পুষ্প তৃতীয় স্তরের আত্মা বলে তাদের কথা বলার প্রয়োজন হয়, কিন্তু চতুর্থ স্তরের ওপরে কোথাও মুখে কথা বলবার দরকার হয় না। মনের মধ্যে পরস্পরের কথা ফুটে ওঠে। আরও উচ্চতরলোকে রঙিন আলোর বিদ্যুৎশিখার মত আলোর ভাষায়, আদানপ্রদানে কথাবার্তা চলে। যতীন এবং পুষ্প তৃতীয় লোকের অধিবাসী হলেও পুষ্প আসলে চতুর্থ লোকের আর যতীন দ্বিতীয় লোকের। নিজের কষ্ট সহ্য করে কেবলমাত্র যতীনের জন্য পুষ্প তৃতীয় লোকে এসেছে এবং যতীনকে এনে রেখেছে। সেই তৃতীয়লোক, যতীনের মতে, ঠিক তাদের বহুকাল আগে ফেলে আসা ভালোবাসার পৃথিবীটিরই মত। এখানে তার বাল্যসঙ্গিনীর বয়স, বাল্যলীলার পটভূমি গঙ্গা ও বুড়ো শিবতলার মন্দির, সবই অপরিবর্তিত। মেঘলা গোধূলির অদ্ভুত আলোর মত এক মৃদু তাপহীন অপার্থিব আলোতে এই দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার মতন ঘন-সবুজ নানান ধরণের ফুল। সেগুলি যেন আলো দিয়ে তৈরি। তাদের বাড়িটা মার্বেল পাথরের তৈরি, এসবই যদিও পুষ্প'র কল্পনা। এই দেশের বৈশিষ্ট এই যে যার যেমন ইচ্ছে, কল্পনা দিয়ে সে তা তৈরি করে নিতে পারে। এই সূক্ষ্মদেহে জড় পদার্থের স্পর্শ লাগেনা। পৃথিবীতে এই সূক্ষ্ম দেহকে প্রকট করবার ব্যাপারে শুক্লপক্ষের রাত্রির চেয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিই উপযুক্ত। জ্যোৎস্নার আলোর ঢেউ দেহধারণ করে দেখা দেওয়ার পক্ষে বাধাস্বরূপ। এই আত্মিক স্তরের আরেকটা সমস্যা হল মারা গিয়ে বুঝতে না পারা। বুঝিয়ে না দিলে দুশো বছরও এইরকম কাটিয়ে দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে যতীন যখন তার স্ত্রী আশালতার সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন সে এমন এক বিপদে পড়ে যার অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়নি। তার পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল বাক্সের আকারের কিছু ঘর। চিন্তার সংযম অভ্যাস না করলে নিম্নস্তরে এই সমস্যা হতে পারে যতীন তা জানত না। জনৈক উচ্চস্তরের আত্মা তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এছাড়া পুনর্জন্মের একটা বিপদ আছে। এই বইয়ের চারপাশে একটা শক্তিশালী চৌম্বক ঢেউ বইছে, যার আকর্ষণ পৃথিবীর দিকে। সেই ঢেউয়ের পাকে পড়লে পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। একেই বলে পুনর্জন্মের ঢেউ। এরই চক্রে পড়ে যতীনের প্রথমে স্বল্পকালের ও পরে দীর্ঘকালের জন্য জন্মগ্রহণ। এই বইয়েই পাই, সবাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের উপযুক্ত নয়, এর থেকে স্লো ওয়ার্ল্ড আছে। পৃথিবীর

ষাট বছর যেখানে একবছর। 'দেবযান' এর জগৎ থেকে আমাদের এই দূরান্তের পৃথিবী কেমন, তার বর্ণনা করতে গিয়ে পুষ্প বলেছে,

> তার মন বলে উঠলো- এই তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বর্গ। ভগবান এখানে কত ফুলে ফলে নিজেকে ধরা দেন, কত জ্যোৎস্নার আলোয়, কত অসহায় শিশুর হাসিতে। আজ চিনলাম তোমায় ভাল করে, আমাদের মাটির স্বর্গকে, আর চিনলাম মানুষকে। মানুষই মাটি দিয়ে গড়া দেবতা- দুদিন পরে সত্যিকার দেবতা হয়ে যাবে।[৩৫]

তাই এই পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে দুঃখ কীসের। পৃথিবীর রূপরস আবার আস্বাদ। সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেই মায়ের কোলে যাপিত একান্ত নির্ভরতার শৈশব, প্রথম যৌবন, প্রেম। তবে কেবলমাত্র পৃথিবীর এই সুখ আর স্বস্তির দিক ছাড়াও আছে তীব্র দুঃখ, সৃষ্টির অনিবার্য দুঃখ। তবে লেখক এও বলেন যে দুঃখভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে, হয় বীতস্পৃহ।

সুখ-দুঃখের অপূর্বতায় জীবন যে একটা বড় রোম্যান্স, একথা তো অপু আগেই বলেছিল। কাজলকে নিশ্চিন্দিপুরে রাণী দিদির কাছে রেখে যাবার আগে, প্রণবকে লেখা তার শেষ চিঠিতে সে লেখে, জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অপু বুঝেছে যে দুঃখ-সুখের অপূর্বতায় জীবন একটা বড় রোম্যান্স। বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোম্যান্স। অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোম্যান্স। রহস্যময় যাত্রাপথের সৌন্দর্য'ই তো মানুষকে এই ধারণা দেয়। 'পথের পাঁচালী'র শেষে পথের দেবতা যে দিশাহারা পথে অপুকে এনে দাঁড় করান, সে পথে যেতে যেতে অপুর মনে হয়েছে জন্ম থেকে জন্মান্তরে, মৃত্যু থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, বহুদূর অতীত এবং ভবিষ্যতে এই পথ বিস্তৃত। সেই পথকে সে নিজের মতন করে দেখতে পায়, যা তার একান্ত অর্জন। কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা- জীবনের ও মৃত্যুর পথে বেয়ে ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার কী অপরূপ অভিযান। অপুই যেন সেই ভ্রাম্যমাণ পথিকদেবতা। যে অপুর কাছে বিস্ময়ে-রহস্যে জীবন একধরণের বড় রোম্যান্স।

'দেবযান' এর পরলোক বিভূতিভূষণের ইহলোকের মতই অপরিচয়ে ও সীমাহীনতায় বিস্ময়কর ও রহস্যময়। এই বিস্ময়কর ও রহস্যময় লোকের বিচিত্র ও অপরূপ অভিজ্ঞতায়, যতীন ও পুষ্পের অপার্থিব অনুরাগের কাহিনিতে 'দেবযান' পরলোকের রোম্যান্স হয়ে উঠেছে। কোনও নিটোল গল্প যদিও এই উপন্যাসে নেই। আশার নরকভোগের কাহিনি এখানে ভয়ংকরভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক।

দেবযানে রয়েছে পথ হারানো ভ্রাম্যমাণ দেবতার কথা।এইদেবতাই ‘স্মৃতিররেখা’রসেইদেবতারমত, যিনিদেবতাহয়েওসবজানেননা। কিন্তু উপন্যাসে দেবতার পথ হারানোর কথা থাকলেও তাঁদের ব্যথার কথা প্রধান হয়ে নেই। ‘দেবযান’- এ প্রধান হয়ে রয়েছে পরলোকের যান বা পথ এবং সেই পথের বিস্ময়। সেক্ষেত্রে ‘দেবতার ব্যথা’র থেকে ‘দেবযান’ নাম অনেক বেশি উপযুক্ত।

‘দেবযান’ এর সূচনায় উপনিষদ্, গীতা, অরবিন্দর ‘দিব্যজীবন’ এবং হেনরি বার্গসঁ’র লেখা থেকে উদ্ধৃতি সংকলিত রয়েছে।[৩৬] এই গ্রন্থের পরলোকভাবনায় এই গ্রন্থগুলির প্রভাব রয়েছে তা বিভূতিভূষণ স্বীকার করেন।

‘দেবযান’-এ মানুষের দেবতা হয়ে ওঠবার যে কথা আছে সেই বিবর্তনবাদের ওপর অরবিন্দ-বার্গসঁর বিবর্তনভাবনার প্রভাব আছে। ব্রহ্মান্ড, জড়জগৎ, উদ্ভিত, প্রাণী এবং মানুষ- মানুষের মধ্যে আবার স্থূল মানবিক শক্তি থেকে অতিমানবীয় শক্তি- এই বিভিন্ন স্তরপারম্পর্যের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছে। জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনীশক্তির তাৎপর্য এই। মূলত এ-কথাই বলতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ।

কাহিনির প্রসঙ্গে ফিরে আসবার আগে একবার ‘দেবযান’ প্রকাশ সংক্রান্ত তথ্য দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য’ বই থেকে জানতে পারা যায়, ১৯২৪ সালে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে আসেন। ‘স্মৃতির রেখা’, ‘পথের পাঁচালী’ তো বটেই, ‘আরণ্যক’, ‘দেবযান’, ‘ইছামতী’ এই প্রবাসকালের পরিকল্পনা।

> ‘দেবতার ব্যথায়’ এইরকম লিখতে হবে যে, কোনো উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম-শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা ক’রে- পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জ্জয় সাহসী Pioneers!
>
> ১৫ ই মার্চ, ১৯২৮[৩৭]

বোঝা যায় যে দেবযানের সেসময়কার পরিকল্পিত নাম ছিল ‘দেবতার ব্যথা’।

১৯২৮ সাল থেকে বিভূতিভূষণ এই বইয়ের কথা ভাবতে শুরু করেন, ১৯৩২ সালে লিখতে আরম্ভ করেন। সেই ১৯৩২ সালে দেবযান কিছুটা লিখে বন্ধ করে পাঁচ বছর বাদেবিভূতিভূষণের দ্বিতীয় দিনলিপি গ্রন্থ ‘তৃণাঙ্কুর’ যেসময় তিনি লিখছেন (১৯ জুন,

১৯২৯- জানুয়ারী ১৯৩৯), এই দীর্ঘ দশ বছরের সময়কালের শুরুর দিকে 'অপরাজিত' লিখছেন। দেবযানের পরিকল্পনা তখনও মনে মনে গড়ে উঠছে। 'অপরাজিত' তে অপুর মানসনেত্রে জন্মমৃত্যুপারের দেবশিল্পীর যে মূর্তি উদ্ভাসিত হয়েছে, পরবর্তীকালে 'দেবযান'- এ যতীন-পুষ্পের পারলৌকিক চোখে সেই আজন্ম পথিক দেবতারই দেখা মিলেছে, সেই দেবতার অনুভবে বিভূতিভূষণের মন আজ যেন আর এক অভিজ্ঞতার জগতে উত্তীর্ণ।

> "মনে হয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো দু'হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, সেখানে নলখাগ্‌ড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোনো দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধুবান্ধবের দলে এক অপূর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে, আবার ষাটটি বছরের জন্যে এসেচি এখানে- আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধুজন। পাঁছাজার বছর পরে আবার কোথায় কে চলে যাবো কে জানে? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রণ করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি- তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা হয়তো জোন দূর জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়্‌বে- সে এক মহনীয়, বিপুল, অতি করুণ অভিজ্ঞতা,
>
> কে জানে যে আবার এই পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেচে- ওর চারিপাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুর্‌চে, তার জগতে যেতে পারি- বহু বছরের Globuler cluster- দের জগতে যেতে পারি- কে বল্‌বে এসব শুধুই কল্পনা-বিলাশ? এ যে হয়না তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব- বৃহত্তর জীবন-চক্র যুগে যুগে কোন্ অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্ত্তিত হচ্চে।
>
> শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ- জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মুখের ও পশ্চাতের অমুক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টি জায়মান হউক তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্ত্তনশীল বিশাল পরিধিতে।
>
> গুন্, গুন্ করে বানিয়ে বানিয়ে গাইলুম, আপনিই মুখে এসে গেল :-
>
> 'গভীর আনন্দরূপে দিলে দেখা এ জীবনে
>
> হে অজানা অনন্ত-'
>
> নিজেকে দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টি দিয়ে বুঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।"[৩৮]

এই ভাবনার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় 'দেবযান' এর।

১৯৩১ সালের মে' মাসের গ্রীষ্মের ছুটিতে বিভূতিভূষণ বারাকপুর যান।[৩৯] ছুটি শেষ হলে বিভূতিভূষণ কলকাতা ফিরে এলেন। এরকমই একদিন গভীর রাত্রে মেসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। একা।

> "বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম- একটা Vision দেখ্‌লাম- এক দেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্তী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোক-বর্ষে চলেচেন অনবরত- দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই- চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই- Greatness of space. Undaunted travels of গ্রহদেব।"[৪০]

১৯২৮ সাল থেকে বিভূতিভূষণ এই বইয়ের কথা ভাবতে শুরু করেন, ১৯৩২ সালে লিখতে আরম্ভ করেন। সেই ১৯৩২ সালে দেবযান কিছুটা লিখে বন্ধ করে পাঁচ বছর বাদে আবার শুরু করেন।[৪১] ১৯৪৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'দেবযান' লেখা শেষ হল।[৪২]

এই উপন্যাস বিভূতিভূষণের দীর্ঘসময়ে লিখিত উপন্যাস।

'দেবযান' উপন্যাসে যতীন মৃত্যুর পরেও পৃথিবীর আকর্ষণ, তাকে যে আশালতা বহু অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়েছিল, সেই স্ত্রীর আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বারেবারে পৃথিবীর প্রতি আসক্তি তাকে আবার নিয়ে যায় পার্থিব জীবনে। অল্পদিনের জন্য তার পুনর্জন্ম হয়ে মাঝখানে, সেই অল্প কয়েকটি দিনের মাটি, ধুলো পৃথিবীর জীবন কাটিয়ে আবার যখন মৃত্যু হয় তার, তখন যতীনের মনে হয়,

> আজ সত্যিই তার মনে হোল, পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চ স্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে, তার মনে অনুভূতি জাগায় এই সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা। তার এই মাকে একলা ফেলে আশালতাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোন্ স্বর্গে গিয়ে সুখ পাবে?[৪৩]

মৃত্যুতে জীবনের সবটুকু শেষ হয়ে যায় না এই বিশ্বাস বিভূতিভূষণের ছিল। কিন্তু সুখদুঃখ ভরা যে পৃথিবী, বেদনা যে পৃথিবীর নিত্যসঙ্গী, সেই জীবনের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে আর কিছুই হয়নি।

তাই তিনি এঁকেছেন পথিক দেবতার ছবি। তাঁর ভগবান এমন একজন, যিনি সর্বজ্ঞ নন, যিনি অহংকারী নন, মানুষের প্রতীক্ষায় যিনি অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারেন অজস্র অবহেলা সত্ত্বেও। বলেন,

> অদ্ভুত চরিত্র ভগবানের। বারবার সুযোগ দেন। বিরক্ত হন না। অপূর্ব্ব তাঁর ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব তাঁর ক্ষমা। অন্য কেউ হলে আর সুযোগ দিত না- কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। আবার লোক পাঠান অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে। তোমাদের পৃথিবীতে ভগবানের তূল্য অবহেলিত প্রাণী আর কে? কেউ তাঁর কথা ভাবে না।[৪৪]

'দেবযান' উপন্যাসে এই কথার পুনরাবৃত্তি শোনা যায় যে "দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে।"[৪৫]

বিভূতিভূষণ দুঃখ বিষয়টাকে জীবনে প্রাসঙ্গিক মনে করতেন। মানবজীবনের এই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিই মানুষকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সেই বোধই তার মধ্যে জন্ম দিতে পারে সেই এক প্রসারিত মানসিকতার, যে মানসিকতা জীবন-মৃত্যুর ধরাবাঁধা হিসেবের বাইরে গিয়ে বৃহত্তর জীবনবোধের জন্ম দিতে পারে। তাই নিশ্চিন্দিপুরে নিজের শিশুপুত্রকে রেখে চলে যাবার আগে অপুর প্রার্থনা হয় এই যে, আর কিছু নয়, "কাজল দুঃখ জানুক জানিয়া মানুষ হউক।"[৪৬]

'দেবযান'-এর ভাবনার প্রায় সমসময়ে 'তৃণাঙ্কুর'-এ বিভূতিভূষণ যা লেখেন, তা হল,

> মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাক্‌তো তবে জীবনটা একঘেয়ে, বিচিত্র্যহীন হয়ে পড়্‌তো--- হারাবার শঙ্কা না থাক্‌লে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন্ সুনিপুণ শিল্পস্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীর অনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম্ লোকেই বুঝলে--- কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না--- সকলেই দৈনন্দিন আহার চিন্তায় ব্যস্ত। কে ভাবে জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে, আকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি--- এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে?[৪৭]

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা অপুকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে, দুঃখের মুখোমুখি হলে, তাকে ভয় না পেলে, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করলে জীবনের চলা অনেক সহনশীল, সুন্দর হয়ে উঠতে পারে।

যতীনের মৃত্যু হবার বহু আগে যে পুষ্পর মৃত্যু হয়েছিল, সেই পুষ্প মৃত্যুর পরপারে যতীনের সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে ছিল। জানা যায় তারও আগে বেশ কয়েকটি জন্ম যতীনের পথ চেয়েই অপেক্ষা করেছে সে। পৃথিবীর টানে ফের যখন যতীন ফিরে যায় পৃথিবীতে, জন্ম নেয় মানব মায়ের কোলে,

> কত জন্মের মধ্য দিয়ে বারে বারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নূতন নূতন অজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে হয়ে আসা যাওয়া, নব নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস-আনন্দ।[৪৮]

সেসময় থেকে আবার শুরু হয় পুষ্পের অপেক্ষা। 'দেবযান' উপন্যাস মৃত্যু পরবর্তী বিভিন্ন স্তরের কথা বলে, তবু শেষপর্যন্ত এই কাহিনি চিরন্তন, মানবিক অপেক্ষার কথা বলে। যে অপেক্ষা যুগে যুগে মানুষ করে এসেছে তাদের প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের অপেক্ষায়। যতীন তার নতুন জন্মে অভয় হয়ে জন্মায়। আর সেই শিশুর ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয় পুষ্প। আর তারপর ফেরার পথে দেখতে পায় সেই দেবতাকে,

> আজ পুষ্প যেন দেখতে পেলে সেই দেবতাকে- নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো এই অপূর্ব্ব জীবন-উল্লাসের স্রোতে যে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেচে যে মহাদেবতার ইঙ্গিতে। কোথায় যেন তিনি মহাসুপ্তিমগ্ন, তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি, সুন্দর চোখ দুটি ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখাচ্চে সেই স্বপ্নালসনিমীলিত আয়ত চোখ দুটি। পুষ্প বল্লে- উনি উঠবেন কখন? চরণ বন্দনা করি।[৪৯]

এই মহাদেবতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, হয়তো এই তাঁর এই ঘুম অপেক্ষারই নামান্তর। তিনি চির একাকী, অপেক্ষায় আছেন মানুষের, কোনদিন সে এসে তার জাদুকাঠিটি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙাবে। এই কাহিনি জীবনের যন্ত্রণার, এই কাহিনি মৃত্যুর, এ কাহিনি মৃত্যু পরবর্তী দেবতাদের পথেরও। কিন্তু এসবের পরেও এই কাহিনি অপেক্ষার। জন্ম-মৃত্যু-সময় নিরপেক্ষভাবে যে অপেক্ষা চলতে থাকে।

'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপির আর দুটি দিনের কথা উল্লেখ করতে হয়। দুটি দিন বিভূতিভূষণের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিন। 'স্মৃতির রেখা'য় যে যাত্রার সূচনা, 'তৃণাঙ্কুর'-এ তা ই সম্পূর্ণ হয়।

> আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী আফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠ্ছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পনের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই--- বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি কর্ত্তে পারি, তার চেয়ে সত্যকার কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।[৫০]

এই বই হল 'পথের পাঁচালী'। এই দিনলিপিতেই তিনি লেখেন যে পটভূমিকায় মনের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল উপন্যাস, সেই নির্জনতা, সেই পোড়ো ভিটা, সেই শৈশব সন্ধ্যা, সেই ব্যক্তিগত নিশ্চিন্দিপুরকে কখনও ভুলবেন না বিভূতিভূষণ। তাঁর 'স্মৃতির রেখা'য় যে

অপূর্ব অকারণ আনন্দের কথা উল্লেখ করেছেন, এ বইয়ে তার কোনও ব্যতিক্রম নেই। এই আনন্দই তাঁর জন্ম-মৃত্যুর বোধকে নিয়ন্ত্রিত করেছে চিরকাল।

দ্বিতীয় দিনটি হল সেইদিন যেদিন বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত'র শেষ ফর্ম্মার প্রুফ দেখেন। দিনটি সম্ভবতব ১৯৩২ সালের ১০ই মার্চ[৫১]। যে বইয়ের কথা তিনি বিগত আট বছর ধরে দিনরাত্রি ভেবেছেন, সেই বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কটি যেন সেদিন ছিন্ন হয়ে যায়। অতি নিকটজন হারানোর বেদনা সেই রাত্রে বিভূতিভূষণ উপলব্ধি করেন তাঁর আত্মজ-আত্মজা অপু, দুর্গা, লীলাকে ছেড়ে যেতে।

তবে শেষপর্যন্ত সেই ইতিবাচকতা আর মুক্ত জীবনানন্দই 'তৃণাঙ্কুর' এর ও মূল উপজীব্য হয়ে থাকে।

ঘ. ঊর্ম্মিমুখর :

১৯৩৫ থেকে ১৯৩৬, এই একবছরের সময়কালে লিখিত হয়েছিল 'ঊর্ম্মিমুখর'। বইটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১৩৫১ তে।[৫২]

এই দিনলিপিতে সল্‌তেখাগী আমগাছের ঝড়ে ভেঙে পড়বার দৃশ্য দেখে দিনলিপিকার মর্মাহত। জীবনের বহু স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই আমগাছ এবার যে জ্বালানি কাঠে রূপান্তরিত হবে, সেই সম্ভাবনায় তিনি আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেন।

মানবজীবনের স্বল্পস্থায়িত্ব এবং অনন্ত কালস্রোতের চিরস্থায়িত্ব নিয়ে লিপিকার মুগ্ধ। ব্যক্তিমানুষের মৃত্যু হলেও মানবজাতি থেকেই যাবে। তাঁর চিন্তায় ভবিষ্যৎ মানুষের সম্ভব্য ক্রিয়াকলাপ নব নব সম্ভাবনার উদ্রেক করে।

> যখন এই শুক্‌নো মরাগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন আমি কোন্ নক্ষত্রে রইব- কত কাল পরে- কে জানে সে খবর?[৫৩]

ঙ. বনে-পাহাড়ে :

১৯৪৩ সালের ২ রা জানুয়ারী থেকে সস্ত্রীক বিভূতিভূষণ চাঁইবাসা পৌঁছোন। সেখানে দুজন ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার পর তাঁরা বিভূতিভূষণকে সিংভূমের অরণ্য দেখানোর প্রস্তাব করেন। ৪ ঠা জানুয়ারী এই ফরেস্ট অফিসারদের সঙ্গে তিনি বামিয়াবুরু বাংলোতে উপস্থিত হন। এই অরণ্যভ্রমণের কাহিনি নিয়েই তাঁর ভ্রমণদিনলিপি 'বনে-পাহাড়ে' রচিত।[৫৪]

এই ‘বনে-পাহাড়ে’ দিনলিপিতে লেখক সকৌতূকে মন্তব্য করেছেন যে সারাজীবনব্যাপী পথ চলার অভ্যেস তাঁর স্বভাব খারাপ করে দিয়েছে। পথ তাঁকে অহরহ ডাকে এবং হাতছানি দেয়।

চ. হে অরণ্য কথা কও :

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে বিভূতিভূষণের জীবৎকালীন শেষ দিনলিপি ‘হে অরণ্য কথা কও’ প্রকাশিত হয়।[৫৫]

একসময়ের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যখন দীর্ঘদিন অদর্শন হয়ে যায়, তখন লিপিকার ধরে নেন জীবন কারও জন্য অপেক্ষা করেনা। চেনা মানুষ চলে যায়, ফের আরেকদল এসে তাদের স্থান দখন করে।

> মহাকালের বিরাট পটভূমি নিত্য শাশ্বত- তার সামনে জগতের রঙ্গমঞ্চে কত নরনারীর আসা যাওয়া!...[৫৬]

ইছামতীর কালো জলে স্নান করতে নেমে তিনি ভগবানের রূপসৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর উপনিষদ মনে পড়ে।

> যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
>
> যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে।[৫৭]

‘ইছামতী’ উপন্যাসে আমরা এই অংশের প্রায় আক্ষরিক প্রতিধ্বনি দেখতে পাই বৈকালিক স্নানের পর ভবানী ঈশ্বর উপাসনায়।

> যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
>
> যিনি শোভনীয় ক্ষিতিতলেতে
>
> যিনি তৃণতরু ফুলফলেতে’
>
> তাঁহারে নমস্কার।
>
> যিনি অন্তরে যিনি বাহিরে
>
> যিনি যেদিকে যখন চাহিরে
>
> তাঁহারে নমস্কার।[৫৮]

ব্যক্তিমানুষের অনিত্যতা এবং মানবের নিত্যতা, এই নিয়ে বিভূতিভূষণের কথা ফুরোয় না। দীর্ঘদিনের চেনা মানুষের অনুপস্থিতিতে যে প্রাথমিক কষ্ট হয়, শীঘ্রই তা চলে গিয়ে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা করতে মানুষ অভ্যস্থ। যাওয়া এবং আসার এই চিরন্তন স্রোত বিভূতিভূষণের দিনলিপির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। হয়তো সেসময় তিনি থাকবেন না, তাঁর প্রিয়জনেরাও নয়। কিন্তু অনন্তের এই স্রোতে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক হলেও মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে বেঁধে ফেলা সম্ভব হবে না। প্রবহমানতার স্রোতে জীবন-মৃত্যুর এই চক্র চিরকালের বিষয় হয়ে থাকবে।

তথ্যপঞ্জি :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আমার লেখা*, কলকাতা : বিভূতি প্রকাশন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬৮।

২। সেন, রুশতী, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭১।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৭১।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, "অভিযাত্রিক", *দিনের পরে দিন*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১০ বঙ্গাব্দে, পৃষ্ঠা ৩।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫৪।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অভিযাত্রিক', *দিনের পরে দিন*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১০ বঙ্গাব্দে, পৃষ্ঠা ১৬।

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৫১।

৯। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২৮।

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯।

১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী', *সোনার তরী*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১২।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬।

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কবিতাসমগ্র*, চতুর্থ খন্ড, দাস, অনাথনাথ (সম্পা.), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা ১৫৮-১৫৯।

১৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কবিতাসমগ্র*, চতুর্থ খন্ড, দাস, অনাথনাথ (সম্পা.), কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫২।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৪২।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩৫।

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৭-১৮।

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'স্মৃতির রেখা', *দিনের পরে দিন*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪৩।

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১০২।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২১।

২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিত্রা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৩।

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৬।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৭৮।

২৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

২৫। <https://m.phys.org/news/2013-04-sunlight-earth.html>, accessed on 05.05.2019.

২৬। <https://www.quora.com/Light-from-Andromeda-Galaxy-is-2-5-million-years-old-So-how-could-we-say-it-exists-now>, accessed on 05.05.2019.

২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬।

২৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান* (অখন্ড), কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৩০।

২৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৮।

৩০। দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.) ও চট্টোপাধ্যায়, অশোক (সম্পা.), *ঋগ্বেদসংহিতা*- ২য় খন্ড, কলকাতা : ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৫৪।

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৫।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭২।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৭।

৩৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *দেবযান*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮০-১৮১।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩।

৩৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯৪।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *তৃণাঙ্কুর*, কলকাতা : মিত্রালয়, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৩২।

৩৯। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৬০-৬১।

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *তৃণাঙ্কুর*, কলকাতা : মিত্রালয়, ১৯৪৩, পৃষ্ঠা ৫৯।

৪১। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৬১।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮।

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *দেবযান*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৫।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২২।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১।

৪৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬।

৪৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *তৃণাঙ্কুর*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : মিত্রালয়, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ১৮।

৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, ২৯।

৪৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *দেবযান*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮৫।

৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *তৃণাঙ্কুর*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : মিত্রালয়, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৮।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭।

৫২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৩৩০।

৫৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *ঊর্ম্মিমুখর*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : মিত্রালয়, ১৯৪৪, পৃষ্ঠা ৬।

৫৪। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩।

৫৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *হে অরণ্য কথা কও*, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৫।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬।

৫৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *ইছামতী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২১৪।

তৃতীয় অধ্যায়

বিভূতিভূষণের নির্বাচিত ছোটগল্পে মৃত্যু

বিভূতিভূষণের বেশ কিছু ছোটগল্পে, তাঁর অন্যান্য সাহিত্য, যেমন উপন্যাস অথবা দিনলিপি'র মতই অবধারিতভাবে এসে পড়া মৃত্যু, মৃত্যুকে ঘিরে সাজিয়ে তোলা মুহূর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে এই অধ্যায়ে। মৃত্যুকে, তার অনিবার্যতাকে জয়ী করতে কেমন যত্নে লেখক গেঁথেছেন গল্পের সবখানি, তা দেখে নেওয়া হবে। আলোচ্য প্রতিটি গল্পই ভালোবাসার ও সুপরিচিত, মৃত্যুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আর একবার মেলানো যাক তাদের।

গল্পগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে তাদের রচনার সময়ক্রম মেনে চলা হবে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তার বদলে গল্পের ধরণ, তার ব্যবহার অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টা করা যাক।লেখার প্রয়োজনে কাহিনি বর্ণনা এসে পড়বে অবধারিতভাবে। তারপরে সেই আলোচনার সাপেক্ষে ভাগ করে নেওয়া যাবে গল্পের বিবিধ প্রকরণগুলিকে।

'প্রবাসী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'মৌরীফুল' গল্প, পরবর্তীকালে যা 'মৌরীফুল' বইতেই (১৩৩৯ এ) সংকলিত হয়। বিভূতিভূষণের অত্যন্ত পরিচিত গল্পের একটি, কাহিনির অন্তর্বর্তী কারুণ্য পাঠকের শ্বাসরোধ করতে পারে। সুশীলা নামের মেয়েটির, নামের সঙ্গে বাস্তবে তেমন সামঞ্জস্য না থাকলেও, সামান্য ভালোবাসা পেলেই সে মান রাখতে পারতো তার নামের। স্বামী কিংবা শ্বশুর-শাশুড়ি কোথাও এতটুকু আশ্রয় সে পায়নি। উপরন্তু সে ছিল মুখরা। তাকে অপমান করলে সে মুখ বুঁজে সহ্য করে নিত না মোটে। অল্পবয়সী বধূকে বিবাহ করে আনবার পরে বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব, কাজ তার মাথায় চাপিয়ে দেওয়া ছিল সেকালের দস্তুর, অবশ্য বর্তমানেও যে সে অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়েছে এমন নয়। সব কষ্টই সহ্য করে নেওয়া যেত, যদি স্বামী সেই বিবাহের প্রথম দিনগুলির মতন আচরণ তার প্রতি করত। দিন-রাত্রের যে অল্প সময়টুকুতে তার সাহচর্য পাওয়া যায়, সেসময় সে দুর্ব্যবহার আশা করত না, একটু গুরুত্ব চাইত, তাই স্বামী রাত্রে ফিরে এসে, সে ঘুমিয়ে পড়লে, নিজের খাবার নিজে ঢাকা খুলে খেয়ে নিলে সে রাগ করত। তার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল ওই রাগটুকুই। সামনাসামনি যত ঝগড়াই করুক না কেন, ভালোবাসার কাঙাল ছিল মেয়েটি! যদিও তাকে বোঝবার মতন ধৈর্য বা ইচ্ছা কোনওটাই তার পরিবারের বাকিদের ছিল না। 'মৌরীফুল' গল্পে গার্হস্থ্য হিংসার ছবি বেশ নগ্নভাবেই খুলে ধরেছেন

বিভূতিভূষণ। সুশীলার স্বামী সুশীলাকে মারধোর করে, ঘর থেকে বের করে দেয় যে কোনও অছিলায়। স্ত্রীর খোঁপা ধরে তাকে হেঁচকা টান মেরে মাটিতে ফেলে তার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মেরে, তারপরে এক ধাক্কা দিয়ে রান্নাঘর থেকে দাওয়ায় এবং তারপরে উঠোনে নিয়ে ফেলা তার কাছে কোনও ব্যাপার নয়। সর্বজ্ঞ কথকের দৃষ্টি থেকে দেখা হয় এই ছবি। কিন্তু হঠাৎই দৃষ্টিকোণ পালটে যায়। গল্পের একটি নামহীন গৌণ চরিত্র-সুশীলার প্রতিবেশী এক জ্ঞাতি বধূর চোখ দিয়ে দেখা দৃশ্যটি। সংসারে গৃহবধূর স্থান কোন অপমানের মধ্যে, একটি নারী অপর নারীর মধ্যে দিয়ে তা চিনে নিচ্ছে। জ্ঞাতি বধূটির চোখ দিয়েই দেখা হচ্ছে শাড়িতে হলুদ-ছোপ, মুখে-পিঠে পড়ে থাকা অবিন্যস্ত চুল নিয়ে মার-খাওয়া সুশীলাকে। সেইসঙ্গে পাড়া-প্রতিবেশী যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে পুরো ঘটনাটি, তাদেরও খুঁটিনাটি দেখছে বধূটি। দেখছে মজা দেখার লোকদের মধ্যে "পাঁচিলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন'ও আছে।"

সুশীলার অসহায়তা তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে, আর এই জ্ঞাতি বধূটির অসহায়তা শুধু তার দেখার মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক।

বাড়ির বাইরে সুশীলার খুব বেশি বেরনো ঘটত না, একদিন তারই মধ্যে সুযোগ হয় নৌকোয় করে শিবতলায় পুজো দিতে যাবার। সেই একটি মাত্র দিন তাকে সারাজীবনের না পাওয়া ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিল তার সই মৌরীফুল।অল্পবয়সী মুখরা মেয়েটি স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য এদিনকে এক বুড়ির কাছে স্বামীর মন পাওয়ার জন্য একটি শিকড় কেনে, কথা ছিল সেই শিকড় বেটে খাওয়াতে হবে স্বামীকে, আর সেকথা কাউকে বলা যাবে না। তবে শিকড়ের গুণ থাকবে না। সেই একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা পরিণত হয় এমন অশান্তিতে, যা তাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেয়! তার মৃত্যু হত্যা নয়, তবু তার বাড়ির অন্যান্যরা তাকে খুনি হিসাবে প্রতিপন্ন করে ওই না-জানানো শিকড়ের জন্য, যা তার মনে একধরণের অপরাধবোধ এনে দেয়। অত্যন্ত অবহেলায়, বিনা চিকিৎসায় চলে যায় অল্পবয়সী মেয়েটি, যে জীবনে একটি দিনের জন্য তার সই মৌরীফুলের সঙ্গে একটা স্বপ্নিল জীবনের কথা ভেবেছিল, যে জীবনে তার ছেলেমানুষি পাগলামিগুলিকে কেবল অপমানের মধ্যেই বাতিল হয়ে যাবে না। মৃত্যুমুহূর্তে, সকলের অনাদরে চিরবিদায়ের সময় সে ফিরে গিয়েছিল নতুন বিয়ের

দিনগুলিতে, আর সঙ্গে মনে পড়েছিল একদিনের বন্ধুকে। যার কাছে সে সেই আন্তরিকতার স্বাদ পেয়েছিল, যা সে আগে পায়নি।

> জানালার বাইরে জ্যোৎস্নায় ও-গুলো কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো?... তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজাইয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ওরকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে... আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না কেন? লাল চৌকা খাম, খুব বড় সোনার জল দেয়া, আতর না কি মাখানো।[১]

মৌরীফুলের চাষভূমির যে সৌন্দর্য, মৌরী শাকের যে স্বাদ, কাঁচা মৌরী ও মানুষের তৈরি ভাজা মৌরীর যে আস্বাদন বৈচিত্রে তিক্ত-মধুর স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ, এসবই সুশীলার স্বভাবে ওতপ্রোত। সুশীলা এই পরিবারের, চেনা সমাজের ধরণের পক্ষে বেমানান, অভিনন্দিত হওয়ার অযোগ্য।

এমনই আরেক দুঃখী বধূর গল্প জানি আমরা। গল্পের নাম 'উমারাণী'। এ গল্প সময় অনুযায়ী 'মৌরীফুল' গল্পের আগে লেখা। বিভূতিভূষণের গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' এ এই গল্প সংকলিত হয়। তার আগে প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১৩২৯ এর 'প্রবাসী' পত্রিকায়। গল্পকথকের বোন মারা যাবার পরে পারিবারিক উপরোধে তাঁর ভগ্নিপতি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেও প্রথম স্ত্রী শৈল'র প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। প্রবাসে থাকবার কারণে কথকের সঙ্গে ভগ্নিপতির এই দ্বিতীয় স্ত্রী'টির আলাপ হবার সুযোগ হয়নি। যখন সে সুযোগ হল মেয়েটি তার এই বিনা সম্পর্কের দাদাটিকে একেবারে আঁকড়ে ধরে। দাদাও কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন তাঁর হারিয়ে যাওয়া বোন কে ফিরে পেয়ে। তারপরে কাহিনির মধ্যেই পেরিয়ে গিয়েছে বেশ কিছু বছর। অনেকদিন আগে মেয়েটি একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য উতলা হয়েছিল, কিন্তু সেই যাওয়া আর ঘটে ওঠেনি। তার বাবা মারা যান, মা আগেই মারা গিয়েছিলেন, সেই থেকে সেই অনাথ কিশোরী মেয়েটির একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ান গল্পকথক। ঘটনাচক্রে প্রথম স্ত্রী'কে ভুলতে না পেরে কথকের ভগ্নীপতি দ্বিতীয় স্ত্রী টিকে আর কোনওদিন ভালোবাসা তো অতি দূরবর্তী, তাকে চিরকাল প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন সশরীরে উপস্থিত না থেকে।

কথক দাদাটি সেই ছেলেমানুষ উমারাণীর রক্তের সম্পর্কের কেউ না হয়েও তার সঙ্গে যোগাযোগটুকু রেখেছিলেন। আর তাঁকে ঘিরেই নিজের সাধ্যমত স্বপ্ন বোনে উমারাণী।

তার ভবঘুরে দাদাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবার স্বপ্ন। তারই অতি তুচ্ছ সম্বল জমিয়ে মাত্র কয়েকটা রূপোর কাঁটা বানিয়ে রাখে দাদার অনাগত স্ত্রী'র জন্য।

এই মেয়েটির জীবনের একটিমাত্র সাধ ছিল, বাজারের খাবারের প্রতি তার ছিল লোভ, সেই খাবার না খেয়ে সে দাদার বিবাহের কাঁটা ক'খানা গড়ায়, ইচ্ছে ছিল সোনার চিরুনি দিয়ে মুখ দেখবে নতুন বধূর।

এভাবে অবহেলিত, একান্ত অনাথ বধূ কতদিন বাঁচতে পারে! উমারাণীও পারেনি। মৃত্যুর আগে তার ননদ টুনি এসে ছিল তার পাশে। মরে যাওয়ার আগে সে ঘোরের মধ্যে, অর্ধচৈতন্যে বিছানা হাতড়ে খুঁজছিল কয়েকটি চিঠি।

> আমি বললুম- সে মারা গেল কোন্ সময়ে?
>
> টুনি বললে- শেষ রাত্রে, প্রায় রাত চারটের সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক জ্বর হ'ল, সেই জ্বরে একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব'সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজছে। আমি বললুম- বৌদি লক্ষ্মীটি, ওরকম করছ কেন? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বললে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠিগুলো? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগল। দাদা বিয়ের পর প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাক্সে তুলে রেখেছিল, আমি তা জানতুম। আমি সেগুলো বাক্স থেকে বের ক'রে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলুম- তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার ক'রে নিয়ে গেল, তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।[২]

স্বামী তাকে ছেড়ে গিয়েছেন দীর্ঘদিন, কিন্তু উমারাণীও, মুখরা বউ সুশীলার মতন চলে যাবার ক্ষণেও আগলে রেখেছে প্রথম জীবনের ভালোবাসার একটু স্মৃতি। কেবলমাত্র ভালোবাসার অভাবেই এদের মৃত্যু হয় দুজনের। কত যত্নে যে উমারাণীকে লেখক গড়ে তোলেন অল্পে অল্পে, তাঁর মৃত্যুর কথা বলতে খরচ করেন মাত্র কয়েকটি বাক্য।

১৩৩১ এর মাঘ মাসে 'প্রবাসী' তে প্রকাশিত, পরে 'মেঘমল্লার' বইতে সংকলিত, 'পুঁইমাচা' গল্পের ছোট মেয়ে ক্ষেন্তি কিছুটা যেন শৈশবের দুর্গার মত, পুঁইশাকের প্রতি ছেলেমানুষী লোভের কারণে ঘরের উঠোনে পুঁতে দেয় শিশু চারাটিকে, বাবা মা-এর চোখের আড়ালে ঘোর অনাদরে খেন্তি মারা গেলেও গাছটি রয়ে যায় সেখানেই।

'পুঁইমাচা' গল্পের পুঁই গাছের লতাটিকে কেবল ক্ষেন্তির সমান্তরাল প্রকৃতি-প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করলে গল্পকারের প্রকৃতি দর্শনের অসীমতা ও রহস্যময়তাকে সম্পূর্ণ ধরা যায়

না। স্রষ্টার অমোঘ নির্দেশে পুঁই চারাটিও একদিন শুকিয়ে যাবে। ক্ষেন্তিরও তাই ঘটেছে। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি যে মানুষ, সে যখন নিজের আরেক সৃষ্টির ভূমিকায় প্রকৃতির বুকে নতুন জন্মের বোধ তুলে ধরে, তখন সেই নতুন জীবন কখন যেন এই মানুষ নামের নব-জীবন স্রষ্টাকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর অতি বিষণ্ণ পটে।

> বর্ষার জল ও কার্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে- সুপুষ্প নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।[৩]

সুশীলা মারা যায়, উমারাণী মারা যায়, মারা যায় ক্ষেন্তিও। মেয়েদের কঠিন প্রাণের প্রবাদের একেবারে বিপরীতে গিয়ে এরা মারা যায় অতি অল্প বয়সে। যখন তাদের চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। আগামী জীবনের স্বপ্ন, ভালোবাসার স্বপ্ন, সংসারকে নিজের মতন করে সাজিয়ে তোলার স্বপ্ন। আমাদের এই ভয়াবহ সমাজের অমানবিক ব্যবস্থার চাপে কীভাবে তারা ফুরিয়ে যায়, একটি স্বপ্নও পূরণ হয়না তাদের, সেই ভয়ানক বাস্তবতার ছবিই যেন তিনটি গল্প। তার উপস্থাপন পদ্ধতির আপাত সরলতা ভয়াবহতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যেন।

আর একটি গল্প, 'ঠেলাগাড়ি', বই 'মেঘমল্লার', প্রকাশিত হয় ১৩৩৮-এ। সেখানে অবশ্য কোনও মেয়ের মৃত্যু হয়না, মৃত্যু হয় একটি শিশুর। খোকা নাম তার। বয়স তার নিতান্ত অল্প, অত্যন্ত ক্ষীণ, মেয়েলী ধরণের চেহারা। পাড়ার অন্যদের সঙ্গে পেরে উঠত না। ছোট একটি ঠেলাগাড়ি নিয়ে বেড়াত একলা একলা, দাবি তার একটাই, সেই গাড়িতে চড়ে সকলকে একটু খেলা করতে হবে তার সঙ্গে। এই ছেলেটির কথা পড়তে পড়তে 'পথের পাঁচালী'র শেষাংশের অপু'র কথা মনে পড়ে যায়। হরিহরের মৃত্যুর পরে সর্বজয়া যে বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করত, সেই বড়ির ছেলেদের সঙ্গে খেলতে চেয়ে অপুকে মার খেতে হয়।

খোকাকে মার খেতে হয়নি, কিন্তু তার ঠেলাগাড়িটা ভেঙে যায়। মচ্ মচ্ করে দেশলাই এর বাক্সের মত। এসব নিঃসন্দেহে খুব সচেতন প্রয়োগ লেখকের। এই দুর্বল, স্বল্পজীবী ছোট্ট খেলার গাড়িটি ঠিক খোকার প্রাণের মতই। এই ঘটনার কিছুদিনের পরে সেই ছেলেটি মারা যায়। তার মৃত্যুর অনেকদিন পরে, কথক দেখেছেন, গাড়িটি সেই এক জায়গায় রাখা আছে, এমনকি টেনে বেড়াবার দড়িটি পর্যন্ত, শুধু খোকার প্রাণ আর ফিরে পাওয়া যায়নি। এমনই হয়েছিল 'পুঁইমাচা' গল্পেও, ক্ষেন্তির অবর্তমানে যেখানে পুষ্ট হয়েছিল তার সাধের পুঁইলতা গাছটি।

এক অল্পবয়সী দম্পতি একটি শিশুপুত্রকে নিয়ে নতুন সংসার শুরু করতে যাচ্ছিল অনেক স্বপ্ন আর উৎসাহ নিয়ে, পথে নৈহাটি স্টেশনে বধূটির মৃত্যু হয়, স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে যে যাত্রার উদ্দেশে ভদ্রলোক বেরিয়েছিলেন, সেই যাত্রা চিরকালের জন্য ফাঁকি পড়ে যায়, পরিবর্তে স্ত্রী'র মৃত্যুসংবাদ আর শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আবার ফিরে যেতে হয় স্ত্রী'র বাপেরবাড়িতে। গল্পের নাম 'যাত্রাবদল'। 'যাত্রাবদল' বইয়ের মধ্যেই রয়েছে এই গল্প। প্রথম প্রকাশ হয় ১৩৪১ সালের কার্তিক মাসে।

> হঠাৎ পিছন থেকে ভদ্রলোক মেয়েমানুষের মত আকুল সুরে কেঁদে উঠলেন। আমরা অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। টিকিটবাবু বললেন- ও কি মশাই ও কি, অত ইয়ে হোলে চলবে কেন- ছিঃ- আসুন এগিয়ে আসুন।
>
> পুরুষমানুষকে অমন অসহায় ভাবে কখনো কাঁদতে শুনি নি, তখন বয়েস ছিল অল্প, লোকটির কান্না শুনে যেন আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর তিনি চুপ করলেন, আমরা সবাই আবার চুপচাপ চলতে লাগলুম।
>
> শ্মশানে যখন পৌঁছানো গেল, রাত তখন সাড়ে সাতটা হবে। মৃতদেহ চিতায় উঠানো হোল। সেই সময় সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলুম বধূটির দুপায়ে আলতা- কোথাও বেরুতে হোলে গ্রামের মেয়েরা আল্‌তা পরে থাকে জানতাম, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, মেয়েটি কি ভেবেছিল আজ কোন্ যাত্রার জন্যে তাকে দুপুরে আলতা পরতে হয়েছিল?[৪]

কোনও এক রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কমবয়সের স্বামী-স্ত্রী তাদের একটি মাত্র শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল, নিজেদের মত করে সংসার বানিয়ে তুলবে বলে, যে সংসারে টাকা-পয়সা তেমন না থাকলেও ভালোবাসার অভাব থাকবে না। সেই যাত্রার পথটি বদলে যায় অকস্মাৎ। বিভূতিভূষণের সাহিত্যের এই হল আশ্চর্য, তা একেবারে জীবনের মত। জীবনের পথে এক ভেবে বের হয়ে দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য পথে চলে যেতে হচ্ছে। আমরা সামান্য মানুষ, সেই পথের ক্রীড়নক ছাড়া আর কী! এক অদ্ভুত বিস্ময় এবং বেদনাবোধ সেই পথের সাক্ষী হয়ে থাকে। যেমনভাবে জীবন কাটানোর পরিকল্পনা ছিল, তা এক নিমেষে এ ভেঙে চুরমার হয়, তবে ভাঙে আবার নতুন করে গড়ে উঠবে বলেই। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর জীবনে আমরা দেখি এই অপ্রত্যাশিত বাঁকবদল, এক লহমায় পালটে গিয়েছে জীবন। তবু সেই যাত্রা হয়তো আনন্দযাত্রা, কারণ তার প্রতি পঙ্‌ক্তিতে বিচিত্র সব নতুন বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে।

শ্মশানে যারা সঙ্গ দিয়েছিল সদ্য স্ত্রী-হারা যুবককে, এ মৃত্যুতে তারা কিছু লাভের মুখ দেখে নিতে চায় বিনামূল্যে। খাবার, শ্মশান খরচের বখরা, কেবল গল্পে স্বামী-স্ত্রী'র জীবনের পথটি চিরকালের মত বদলে যায়!

'কিন্নর দল' গল্প প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৪৪)।গ্রন্থাকারে 'কিন্নর দল' মোট দশটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৪৫ এ। পরে বিভূতিভূষণের পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'কিন্নর দল' এর অন্তর্ভুক্ত হয়। গ্রামের একমাত্র গৃহস্থ ঘরের ছেলে শ্রীপতি যখন বেশ কিছুটা বেশি বয়সে তার অসমকক্ষ এক বৈদ্য ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে আনে, গ্রামে কৌতূহল আর নিন্দের ঢেউ কম ওঠে নি। কিন্তু মেয়েটির নম্র ব্যবহার, অতি সুশ্রী চেহারা এবং সর্বোপরি তার গানপাগল প্রকৃত শিল্পীস্বভাব অল্পদিনেই গ্রামের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র অসহায় মহিলাদের মন জয় করে নেয়। অবিবাহিত, চিরকাল বঞ্চিত যে মেয়েগুলি কেবলমাত্র অপরের খুঁত ধরে, সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে, হিংসাভরা মন নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে তাদের বিশেষ আশ্রয়ের জায়গা হয়ে ওঠে এই অনন্য বধূটি। শান্তি তাদের মধ্যে একজন। আস্তে আস্তে সুন্দরের সংস্পর্শে, বৈচিত্রের আস্বাদে একটু একটু করে তাদের মনের অন্ধকার কেটে যেতে থাকে। গ্রামের বৌ মেয়েরা দুর্গাপুজো দেখতে পারেন না, তাদের জন্য শ্রীপতির বৌ তার গুণী ভাই-বোনেদের পুজোর ছুটিতে গ্রামে আনিয়ে চমৎকার নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। ওদের নাম 'কিন্নর দল', কলকাতার নাম করা শিল্পী এই অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলি। সবার মনের প্রায় সবটুকু যখন এই সুন্দর ছেলেমেয়েগুলি দখল করে বসে, ঠিক সেইসময়ে বলা-বাহুল্য বিভূতিভূষণ তাদের মৃত্যুর তোড়জোড় আরম্ভ করেন। এক্ষেত্রে 'বলা-বাহুল্য' শব্দ ব্যবহার না করে পারা যায় না, সর্বকনিষ্ঠ সদস্য দিয়ে শুরু হয় যে মৃত্যু-মিছিল, তা শেষ হয় শ্রীপতির বউ-এ এসে। এই বধূ অল্প কয়েকদিনের জন্য গ্রামে এসেছিল। কিন্তু তার এই স্বল্পস্থায়ী আগমন গ্রামের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে! গ্রাম, গ্রামের মহিলারা যেমন জীবন কাটাতেন, অল্পদিনের হাসি-আহ্লাদ পেরিয়ে আবার তাঁরা ফিরে যান সেই পূর্বের গতানুগতিক দারিদ্রে ভরা জীবনে, তবু লাভ হয় এই যে, তাদের বদ্ধ, সংস্কারাচ্ছন্ন মনগুলির স্থায়ী পরিবর্তন হয়ে যায় কিন্নর দলের সংস্পর্শে!

শ্রীপতির স্ত্রী মারা যায়, কিন্তু ফেলে রেখে যায় তার গলার গানখানি। জ্যোৎস্নারাত্রে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়ে, শ্রীপতি নিঝুম হয়ে যাওয়া গ্রামে চালিয়ে দেয় গ্রামোফোন

রেকর্ডে ধৃত, স্ত্রীর গাওয়া মীরার ভজনখানি। সেই গান ঘর ছেড়ে গভীর রাত্রে টেনে আসে অসহায় শান্তিকে, ঘর ছেড়ে বের হতে বাধ্য করে গ্রামের মহিলাদের, যাদের অল্পদিনের জন্য প্রাণ ঢেলে ভালোবসে গিয়েছিল আত্মীয়ের ঢের অধিক এই অনাত্মীয়টি। মানুষ চলে যায়, শুধু পথের বাঁকে সুরে ভরা একখন্ড পিছুটান নীরবে বসে থাকে ভালোবেসে।

এই 'কিন্নর দল' বইয়ের বাকি আরও তিনটি গল্পের কথা আলোচনা করা যাক। 'পুরনো কথা', 'একটি দিনের কথা' আর 'বাটি-চচ্চড়ি'। ঘটনার মধ্যে হয়তো ধরা আছে বেশ কয়েক বছরের ইতিহাস। তবু তারই মধ্যে একটি কথা যেন বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে গিয়েছে গল্পে। এইখানেই তিনটি গল্পের মিল। সেই যে এক-একটি বিশেষ ঘটনা, তা এতো তুচ্ছ যে প্রায় মনে না রাখবারই মত। তবুও সেই অতি তুচ্ছতাকে কোনওভাবে আলিঙ্গন করেছে মৃত্যু। কাহিনিকে দিয়ে গিয়েছে অন্য মাত্রা।

'পুরানো কথা' গল্পের কথক যখন ছোট, তখন সর্বদা তিনি দেখেছেন তাঁর ঠাকুরমা বাবাকে নানাভাবে বকুনি দিয়ে আসছেন, যদিও এ বকুনির কোনও গ্রহণযোগ্য কারণ তিনি খুঁজে পাননি, তাঁর মা তো তাঁকে এমন করে বকেনি কখনও। বুড়ো মানুষরা যে বকেন তাও নয়, কারণ তাঁর অতি বৃদ্ধ দিদিমা তো কেমন স্নেহপ্রবণ। শুধু বাবার মা ছিলেন ব্যতিক্রম। নিরীহ পুত্র এবং অসুস্থ পুত্রবধূর উপরে অত্যাচার করতেন দ্বিধাহীনভাবে। অসুস্থ মেয়েটি যে যে কোনও সময় মরে যাবে, এ কথার নির্লজ্জ ঘোষণা তার মুখে আটকায়নি কখনও। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল এই যে সেই মৃত্যুপথযাত্রী কমবয়সী বধূটির কাছে তার সন্তানকে যেতে দিতেন না তার শাশুড়ি। লুকিয়ে লুকিয়ে মা এর সঙ্গে দেখা করতে হত ছেলেটিকে। বয়স তখন তাঁর অতি অল্প, সেসময় ধরা পড়ে যাওয়াও ঘটতো প্রায়শই। মা'কে কাছে পাওয়া ঘটে উঠত না সহজ ভাবে। এরকমই একদিন বাইরের সব প্রলোভন উপেক্ষা করে ছোট্ট ছেলেটি রোগশয্যায় শুয়ে থাকা মা এর কাছে যায়। দুর্বল মা এর বেশি কথা বলবার ক্ষমতা হয় না। চুপ করে থাকেন দুজনেই।

> মা বেশি কথা বলতে পারেন না। আমি চুপ ক'রে মায়ের বিছানায় শিয়রের পাশটিতে ব'সে আছি। বেলা বেশি নেই। পুকুরের চাঁপা গাছে রোদ রাঙা হয়ে এসেছে।
>
> খানিকটা পরে মা বললেন, খোকা, আমি যদি মরে যাই, তুই কি করবি?
>
> আমি কিছু বললুম, না, চুপ ক'রে রইলুম। আমার মনে একটা অদ্ভুত ধরণের বিষাদ।

আর কখনও এ ধরণের ভাব আমার মনে হয় নি। ভয়ানক মন-কেমন করছে কার জন্যে; কার জন্যে যে বুঝতেও পারি না।

মা যেন আপন মনেই বলছিলেন, খোকা, তোকে যে কার কাছে রেখে যাব সেই হয়েছে আমার ভাবনা। কেই বা তোকে বুঝবে!

হঠাৎ মা তাঁর হাতের আংটিটা খুলে আমায় দিয়ে বললেন, যা, এটা লুকিয়ে রেখে দিগে যা, ওরা তোকে কিচ্ছু দেবে না! এটা দিয়ে কিছু মিষ্টিটিষ্টি কিনে খাস, তুই ভালবাসিস পক্কান্ন মেঠাই, তাই খাস। কাউকে দেখাস নি।[৫]

এই কথা বলে মা চুপ করেছিলেন। তার পরদিন ভোরে উঠে ছেলেটি আর তার মা কে দেখেনি কখনও। তার ছেলেমানুষ মা সেই রাত্রের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন চিরকালের মত। ছেলেটি পরে অনেক বড় হয়। অনেকগুলির কয়লার খনির মালিক হন তিনি, অর্থের অভাব ছিল না, তবু তাঁর সেই শৈশবের সহায়-সম্বলহীন রোগশীর্ণ মাতৃমুখ ও ওই একটি দিনের কথা মনে রয়ে গিয়েছিল, যেদিন এক অসহায় অতি অল্পবয়সী ভীরু মা, পরিবারের সকলের থেকে বাঁচিয়ে তার একমাত্র পুত্র'কে হাতের আংটি দিয়ে যান। তা দিয়ে মহৎ কিছু করবার জন্য নয়, সে সাধ্য মেয়েটির ছিলোও না, সামান্য কিছু মিষ্টি কিনে খাওয়ার জন্য!

কালের নিয়মে সেই ছেলেটির মন থেকে মা এর বাকি সব স্মৃতি হারিয়ে গেলেও, সেই পুরনো মনখারাপে রাঙানো বিকেলবেলাটি মনে থেকে গিয়েছে বহুদিন।

ডাক্তার, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর থেকে বছর দশেকের ছোট বিধবা পিসিমার সুখের সংসারে, পাহাড়ের দেশে, যেদিন অতি দূর সম্পর্কের রুগ্ন বধূ আসে শরীর সারাতে, সেইদিন তাকে কেউ প্রত্যাখ্যান না করলেও বধূটি মনে মনে স্বামীর অর্থহীনতা এবং নিজের ভঙ্গুর জীবনের জন্য লজ্জিত হয়ে থাকত। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান তার জীবনের আশা অত্যন্ত কম। চিকিৎসাহীনতা, পুষ্টির অভাব, স্বামীর দীর্ঘদিনের বেকারত্ব তাকে মৃত্যুর খুব কাছে এনে দেয়। চিকিৎসা চলতে লাগলেও রোগ কমলো তো না, বরঞ্চ তা বাড়তে লাগল। বধূটির রান্নায় নুন খাওয়া নিষেধ হয়ে যায়। ডাক্তারের স্ত্রীর এই মেয়েটির জন্য ভারি করুণা হওয়ায় তিনি তাঁর স্বামীকে বলে কয়ে সামান্য বাটি-চচ্চড়ি করে খাওয়ানোর অনুমতি নেন। গল্পের নামও 'বাটি চচ্চড়ি'।

মৃত্যুর আগে এই অসুস্থ বধূ একটি দিনের জন্য জানালার পাশে বসে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল,

> বাতায়নপাশে বসে দূর আকাশের পানে তাকিয়ে দেখতে লাগলো অপরূপ মেঘের খেলা। দূরে অতিকায় ধূমের মত দাঁড়িয়ে আছে আকাশচুম্বী পর্বত। তার নীচে ইতস্ততঃ বৃক্ষলতাশোভিত কালো বর্ণের ছোট ছোট পাহাড়। তাদের গায়ে লাল কাঁকরে বঙ্কিম পথরেখা- মনে হয় যেন কোন্ অচিন দেশে চলে গেছে পাহাড়ের বুক ব'য়ে। বৌমা অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিল...[৬]

মাত্র একটি দিনের অন্যমনস্কতা ধরা থাকে গল্পে, ধরা থাকে সেই অন্যমনস্কতার সঙ্গে জড়িয়ে হয়ে থাকা আরও দু-চারটি ঘটনা। ডাক্তারের বাড়ি থেকে যে পথটি বেরিয়ে পাহাড়ের বুক চিরে কোনও অজানা দেশে চলে গেছে, কেউ জানে না কোনখানে, ঠিক এই বধূটির জীবনের পথটিও এই ভাবে অনির্দেশের দিকে চলে যায়, বধূটি তার কিছুই জানত না। চমক ভাঙে তখন, যখন ডাক্তারের স্ত্রী এসে বাটি চচ্চড়ির কুটনো'র খোঁজ নেন। এই সামান্য বিষয় থেকে বিধবা ছোট ননদ তাকে কঠিন কথা বলে। অসুস্থ শরীর ও মনটিতে সে কথার ধারে রক্তক্ষরণ হয় প্রবল, মেয়েটি বাটি চচ্চড়ির বাটিটি লুকিয়ে ফেলে, তার মৃত্যুর আগে অবধি সে বাটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুঁজে যখন পাওয়া যায়, তখন বধূটি সেই বহুদূরের পাহাড়ের অচেনা পথটিতে বেরিয়ে পড়েছে একা একা।

সেই অভিমান আর বেদনার রাত্রি থেকেই বধূটির দিকভ্রষ্ট হতে থাকে। খোলা দরজা খুলতে যায় বারেবারে। আর শেষ রাত্রিতে সে সারারাত ধরে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়েছিল একের পরে এক, মনে হচ্ছিল আলো হচ্ছে না কোথাও! ডাক্তার আর স্ত্রী যখন আসেন, তখন বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে শেষমেশ আর বাঁচানো যায়নি। মৃতার স্বামী, মেজ ননদ, সবাই আসে কিন্তু তাকে আর ফেরানো যায়না। তার মৃত্যুর পরে কারুর চোখের জল বাধ মানেনি। কেবল একজন ছাড়া।সেই বিধবা ছোট ননদ। যিনি সারারাত অসুস্থ বধূকে বিছানায় একের পর এক দেশলাই জ্বালতে দেখেও একটা কথা বলতে পারেননি মান-অভিমানের জেরে তাদের বাক্যালাপ বন্ধ থাকবার কারণে!

আর একটি গল্পের কথা এই প্রসঙ্গে বলবার। গল্পের নাম 'একটি দিনের কথা'। এ গল্পের কেন্দ্রেও এমনই এক কমবয়সী মেয়ে, তবে অন্য গল্প'র সঙ্গে এর ফারাক হল এইখানে যে এতে মেয়েটির মৃত্যু হয়না, বদলে মারা যান তার স্বামী। যে মেয়েকে গল্প-কথক একদিন তার অবিবাহিত জীবনে পুকুরে রাঙা গামছা নিয়ে অকারণ পুলকে আনন্দ করে নাইতে দেখেছিলেন।

> কি ক্ষণে না জানি মেয়েটিকে যে দেখলুম! কত ছবি চোখের সামনে দিন-রাত আসে যায়, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার ফুলের মত তখন বেশ দেখায়, তারপর কোথায় যায় মিলিয়ে তলিয়ে, কোনো চিহ্নও রেখে যায় না। লক্ষ অখ্যাত ছবির মধ্যে একটি কি করে যে মনের মধ্যে

> সেদিন রেখে গেল! চেয়ে দেখি একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে পুকুর ঘাটে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় নাইতে এসে তখনও জলে নামে নি, মোটামুটি সুশ্রী মন্দ নয়, গায়ের রংটিও ফর্সা, স্বাস্থ্যবতী বটে। বাঁ হাতের একটা সাবানের পাত্র, একখানা রাঙা গামছা দুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে খেলার ছলে জলে ফেলে দিচ্ছে- কিছু না, অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার- অথচ আজও যখন ছবিটা ফাঁকে হঠাৎ মনে এসে পড়ে...[৭]

এর পরে যে দিনটিতে কথকের সঙ্গে এই মেয়েটির দেখা হয়, সেদিন তার স্বামী মারা গিয়েছেন। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় শ্মশানে দাঁড়িয়ে সে, আর তার স্বামীর পরিবারের লোকেরা তার উপরে জুলুম করছে সব গয়না খুলে দেবার জন্য! শেষপর্যন্ত জনসমক্ষে সেই অপমানের জের সহ্য করতে না পেরে, থানা-পুলিশের গোলমালে সব গয়না ফিরিয়ে দিয়ে সে নেহাত নিঃস্ব, অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল! কোথাও ফিরবে এমন ঘর তার নেই, অর্থও নেই। শেষে তাদের দুই ভাই-বোনকে বাড়ি ফেরার দু'খানা টিকিট কিনে দেওয়া হয়। সারাদিনের ঝড়-ঝাপটা আর ঘটনার আকস্মিকতায় যে কাঁদেনি, এতক্ষণ পরে সে কেঁদে ফেলে! কিন্তু সে কান্না যেন ছেলেমানুষের মতন কান্না, বাচ্চা মেয়ের খেলার পুতুল ভেঙে গেলে যে কান্না আসে, তেমন কান্নাই কাঁদতে শিখেছে কিশোরী মেয়েটি। পরিণত ট্র্যাজিক কান্নার হাতেখড়ি তার হয়নি এখনও!

এরপরে সেই মেয়েটির সঙ্গে কথকের আর দেখা হয়নি, কথাও নয়, কেবল তার সেই কিশোরীবেলার পুকুরঘাটের অপ্রাসঙ্গিক স্মৃতিটি মনে রয়ে গেছে।

জীবনের-স্মৃতির মজা এইখানটিতে যে তাদের বাছাইয়ের কাজটি করবার সময় তুচ্ছ-গুরুতর'র জ্ঞান করেনা। ব্যবহারিক জগতে যা মূল্যবান, স্মৃতির দুনিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের থেকে মূল্যহীন পদার্থ কম ই থাকে। যত রাজ্যের অদরকারি জঞ্জালকে আপ্যায়ন করবার কাজে স্মৃতির জুড়ি মেলা ভার। সে পাগল, তার কাজের মানে খুঁজে পাওয়া দায়।

তিনটি গল্পেই মৃত্যু এসেছে, কিন্তু গল্পের কেন্দ্রে থাকে একটি ভুলে যাওয়া দিনের সামান্য সব ফেলে আসা ঘটনা, যে ঘটনা সেই সাধারণ মৃত্যুকে পরিপূর্ণতা দেয়।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের শারদীয়া আনন্দবাজারে প্রকাশিত 'মুক্তি' গল্পটি পরবর্তীকালে, ১৯৪৪ এ 'নবাগত' গল্পগ্রন্থভুক্ত হয়। যুগি বাগদির স্ত্রী নিস্তারিণী একসময় ছিল ডাকসাইটে সুন্দরি, স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার ছিল পরিপূর্ণ, এমনকি ব্রাহ্মণ পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শৌখিন প্রসাধনেরও অভাব হয়নি কোনোদিন। নানানরকম লোভনীয় প্রস্তাবকে

অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করবার মনের জোরের অভাব হয়নি কখনো। কেউ চাল চেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়নি যুগি বাগদির বৌ এর কাছ থেকে।

তারপর বিভূতিভূষণের লেখার নিয়ম মেনেই পেরিয়ে গিয়েছে বহুবছর। স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, মারা গিয়েছে একমাত্র ছেলেটিও। সেদিনের তন্বী যুবতী আজ স্বামী-পুত্রহীনা অসহায় বৃদ্ধা, পুত্রবধূর তীব্র অপমান আর অবহেলার শিকার, হাত পা ফোলা কুৎসিত বৃদ্ধা, তার অবস্থা কিছুটা 'পথের পাঁচালী'র ইন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু কেমন হয় তার মৃত্যু দিনটি?

> সে অসুখের ঘোরে কোন্ বিস্মৃত পথ বেয়ে ফিরে গেল তার যৌবনদিনের দেশে। বাঁড়ুজ্যেদের ন'গিন্নী যেন এসে হেসে হেসে বলচেন, 'আমায় আজ দু'কাঠা চাল ধার দিতে হবে বৌ। বৌমা তাড়িয়ে দিয়েচে বাড়ী থেকে- তুমি না দিলে দাঁড়াবো কোথায়?'... যে সব লোক কত কাল আগে চলে গিয়েচে, তারা যেন এসে দিনরাত ওর বিছানার চারিপাশে ওকে ঘিরে ভিড় করচে। বহুদিন পূর্বের শরৎ-অপরাহ্নের মত হাট থেকে ফিরে ওর স্বামী যেন হাসিমুখে বলচে- ও বড়বৌ, কলা বিক্রির দরুণ টাকাগুলো এই নাও, তুলে রেখে দাও- আর এই ইলিশ মাছটা- ভারি সস্তা আজ হাটে-
>
> ওর সব দুঃখ, সব অপমান, অনাদরের দিনের হঠাৎ আজ এমন অপ্রত্যাশিত অবসান হ'ল কিভাবে? নিস্তারিণী অবাক হয়ে যায়, বুঝতে পারে না কোন্‌টা স্বপ্ন-কোন্‌টা সত্য। সে একগাল হেসে স্বামীর হাত থেকে ইলিশ মাছটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়।[৮]

মৃত্যুর আগে তার শরীরের সব গ্লানি কেটে গিয়েছিল। দীর্ঘদিনের রোগ আর অভাবক্লিষ্ট শরীর শেষ সময়টায় এসে তরতাজা হয়ে যায়! বহুদিনের না মেটা সাধ যে ইলিশমাছ খাবার, মৃত্যুর আগের দোলাচলময় অর্ধচেতনে তার সেই সাধ মিটিয়ে দেন বহুকাল আগে মৃত স্বামী। অবশ্য এসব ঘটনা তার পাশে থাকা জীবিতরা দেখতে পারেননি! পেয়েছিল শুধু নিস্তারিণী। মৃত্যু এসে তার হীন জীবনের মুক্তি ঘোষণা করে সগর্বে।

'ক্ষণভঙ্গুর' গ্রন্থের গল্প 'বুধোর মায়ের মৃত্যু'। বুধোর মা বাল্যবিধবা, তবে তাঁর পেশাটিকে ঠিক ভালো চোখে দেখতো না গ্রামের বাকিরা। সেই বুধোর মা-এর গ্রামের বাইরে বেরনো হয়নি কক্ষনো! প্রথমবার পুরী বেড়াতে গিয়ে সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না তার। কী সমুদ্র, কী মন্দির! গীতার ব্যাখ্যা শুনতে বসে তিনি নানান ছেলেমানুষ সরল প্রশ্নে ঘাবড়ে দিয়ে বিরক্ত করে তোলেন তাঁদের যাঁদের সত্যিই মন ছিল আধ্যাত্মিক আলোচনায়।

ওরা সবাই বসল সেখানে হাত জোড় করে। আরও অনেক বৃদ্ধা সেখানেই উপস্থিত, প্রায় সকলের হাতেই জপের মালা। সকলে একমনে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে।

বুধোর মা কিছুই বুঝলে না। দু-চারবার বোঝবার চেষ্টা যে না করলে এমন নয়, কিন্তু কি যে বলছেন উনি, যদি একটা কথার অর্থ সে বুঝে থাকে! তবুও তার চোখ দিয়ে জল এল- কোনও কারণে নয়, এমনিই। কেমন সুন্দর কথা বলছেন উনি। মুনি-ঋষিদের মত চেহারা। কতবড় উঁচু মন্দির, বাবাঃ! উই কেমন একটা লাল শাড়ি পরা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, কত টাকা খরচ হয়েছে না-জানি এই মন্দির করতে। পাশের একজন বৃদ্ধাকে সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে- মন্দিরডা কারা তৈরি করে'ল মা?

বৃদ্ধা একমনে শুনছিলেন- বিরক্ত হয়ে বললেন- আঃ, একমনে শোন না বাপু-

বুধোর মা অপ্রতিভ হয়ে বললে- না, তাই শুধোচ্ছিলাম।

ওদিক থেকে কে ধমকে উঠল- আঃ!

আর একজন কে টিপ্পনী কাটলে- শুনতে আসে না তো, কেবল গল্প করতে আসে।[৯]

এ গল্পের সৌন্দর্য সেইখানে যে তবুও, গীতার ব্যাখ্যার কিচ্ছু না বুঝেও বুধোর মা এর চোখে জল আসে। মানুষের জীবনের বিশিষ্টতা এখানেই যে তার মনের গতিবিধি সবসময় কারণ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না। অকারণের আনন্দে, অকারণের বেদনায়, অজ্ঞ বিস্মিত মনও কখনও কখনও সৌন্দর্যের সামনে নত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি ব্যাখ্যাতীত। কীকরে ই বা সম্ভব হঠাৎ স্থানান্তরে গিয়ে ঈশ্বরে তীব্র বিশ্বাস তৈরি হওয়া? যে মানুষের সারাজীবন কেটেছে গ্রামের মধ্যে, কেটেছে নির্দিষ্ট পেশায় দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশে, তার পক্ষে এই সীমাহীন বিস্ময়, নির্বুদ্ধিতা ই প্রত্যাশিত। লেখকের আধুনিকতাও ঠিক এখানে প্রকাশ হয় যখন তিনি সমাজ নির্ধারিত 'বয়সোচিত ঔচিত্য'-র বোঝা কারুর ঘাড়ে না চাপিয়ে বাস্তবসম্মত করে আঁকেন তাঁর চরিত্রদের।

'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্প পড়তে বসলে পাঠকের মনে পড়ে যাবে দ্রবময়ীকে, যে দ্রবময়ী কাশী গিয়ে থাকতে পারেননি। চিরকালের গ্রামটিই তাঁর গয়া-কাশী। বুধোর মা'এর যদিও বাড়ি ফিরে আসা হয়নি আর! চিরটাকাল গ্রামের মধ্যিখানে থেকেছেন, রোজগারের জন্য কতকিছুই করতে হয়েছে সারাজীবন, আজ জীবনের শেষ বয়েসটায় এসে তার মনে অনুতাপ থেকে জ্বর আসে। মনে হয় সে মহাপাপী। রথের দিন মৃত্যু হয় তার, বাড়ির, আত্মীয়-সজন থেকে কতদূর বিদেশে।

রাত বারোটার সময় আর একবার জ্ঞান হল ওর। জ্ঞান হলেই বলে উঠল- ও মুখুজ্যে ঠাকুর, আমার সেই সাত গন্ডা ট্যাকা-

খুড়িমা মুখের উপর ঝুঁকে বললেন- কি বলছ, ও বুধোর মা?

-আমায় সেই সাত গন্ডা ট্যাকা আর শাড়ি দেবা না?

-হরিনাম কর। হরি হরি বল। বল, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!

-আমবাগানের তলায় মুখুজ্যে ঠাকুরের সঙ্গে সিঁদুরকৌটো গাছটার কাছে দেখা। ঘাটের পথ। লোকজন যাতায়াত বড্ড। এখান থেকে সরে চল ওদিকি, ও মুখুজ্যেঠাকুর![১০]

না, মৃত্যুকালে বুধোর মা শুভাকাঙ্খীদের হাজার চেষ্টায় বা স্থানমাহাত্ম্যে, কোনো অবস্থাতেই হরিনাম করেননি, বরঞ্চ সেসময় তাঁর মনে এসেছিল গৌরবময়, লাবণ্যময়, বৈচিত্রময় যৌবন দিনের কথা!

'গল্পভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫৪ সংখ্যায় বেরোয় 'অন্তর্জলি' গল্প, পরে তা 'মুখোশ ও মুখশ্রী' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাংলা ১২৭৫ সালে ডুমুরদহের গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জলির জন্য আনা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছেন পুত্ররা এবং আরো নানান গুণমুগ্ধ। সকলে তাঁকে নিয়ে চিন্তিত, বিপন্ন... সকলেই তাঁর মৃত্যুর প্রহর গুনছে৷ কিন্তু এসবের মধ্যে, একমাত্র দীনদয়ালের মনে, আধো ঘুম আধো জাগরণ অবস্থায় ফ্ল্যাশব্যাক চলছে অতীত জীবনের। কেমনভাবে তৈরি হয়ে উঠেছিল শিল্পীর জীবন, সারাজীবন কেমন ভালোবাসা পেয়েছেন দর্শকের কাছে, তেজী অহংকারী প্রতিদ্বন্দ্বীরা কীভাবে সম্মোহিত হয়েছেন তাঁর সৃষ্টির কাছে।

দীনদয়াল কবিয়ালের মৃত্যুকালে কণ্ঠরুদ্ধ হয়, অনেক কথা তৈরি হচ্ছিল মনে, কেবল মুখে তা ফুটে ওঠেনি, তিনি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায়নি সে কথা, যদি শুনতে পেতো, তবে দেখতো স্মৃতি তাঁর এখনো সজীব, যেন কালকের কথা। আদরে জমিয়ে রাখা স্মৃতি সব। বিনোদিনী কীর্তনওয়ালী তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে প্রণয়ের ঈঙ্গিত করেন একসময়, তবে দীনদয়াল ছিলেন দুই শিল্পীর সম্পর্কে সংযমের পক্ষপাতী। দুজনের মধ্যে মাধুর্য্যময় খাঁটি শিল্পীর সম্পর্ক তৈরি হয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে সম্পর্ককে মনে জিইয়ে রেখেছিলেন দীনদয়াল।

আবার দেখলেন, বিনোদিনী সামনে বসে হাসি-হাসিমুখে বলচে,- "আপনি যে গুণী ঠাকুর। আপনার সেবা ক'রে ধন্য হই। খান।"

দীনদয়াল বিনোদিনীকে বললেন- "দ্যাখো, কি চমৎকার ছেলেটি! নিজের খরচে আমাকে সূচিকাভরণ দিতে কবিরাজ ডেকে এনেচে। ভালবাসার সূচিকাভরণ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে তোমরা সবাই। নবাই ঠাকুরকে একদিন এই ওষুধে আমি বশ করেছিলাম, ও বিনোদিনী, মনে পড়ে?"

বিনোদিনী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো বালিকার মত।[১১]

এই ছিল দীনদয়ালের শেষ ভাবনা। এরপর তাঁর মৃত্যু হয়।

এই গল্পের সূত্র ধরে প্রায় একই ধরণের দুটি গল্পের উল্লেখ আবশ্যক। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নায়ক' (১৯৬৬) ছবিতে এককালের প্রখ্যাত অহংকারী অভিনেতা মুকুন্দ লাহিড়ী-(বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত) কে আমাদের মনে আছে। যেসময় তিনি খ্যাতির শীর্ষে, সেসময় একদিন 'দেবী চৌধুরাণী'র শ্যুটিং চলাকালে উঠতি অভিনেতা অরিন্দম-(উত্তমকুমার অভিনীত) কে সেট্-এর মধ্যেই তীব্র অপমান করেন। তৎকালীন খ্যাতনামা অভিনেতাকে একটি কথাও বলার স্পর্ধা হয়নি অরিন্দমের, কিন্তু এমন একদিন আসে, যখন সেই মুকুন্দ লাহিড়ীকেই আসতে হয় অরিন্দমের কাছে, সামান্য পার্ট পাবার আশায়। অরিন্দম ততোদিনে 'নায়ক'। শিল্পীদের চাহিদা পরিবর্তিত হয় জনরুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, একদিন যার আদর ছিল খুব, পরে হয়তো তাকেই লোকে অবহেলা করে। 'কবি কুম্ভুমশাই' এবং 'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' দুটি গল্পেই রয়েছে দুই শিল্পীর সারাজীবনব্যাপী লড়াইয়ের কথা। শেষদিনটি পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের শিল্পের কাছে সৎ ছিলেন। কবি কুম্ভুমশাই মৃত্যুর আগে তাঁর কবিতার খাতা কয়টি দিয়ে যান কথককে, কথকই একমাত্র তাঁর জীবনভোর দারিদ্রের সঙ্গে লড়েও কবিতা লিখে যাবার ভালোবাসাকে সম্মান জানিয়েছিলেন। আর যদুহাজরা একটিমাত্র দিন পেট ভরে মাংস খেতে পেরে মনের আনন্দে সেই বহুবছর আগে যাত্রার স্টার যদুহাজরাকে ফিরিয়ে আনেন কথকের কাছে, মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ অভিনয়, তাঁর যৌবন বয়সের অভিনয়কেও ছাপিয়ে যায়। এই তৃপ্তিটুকুর প্রতীক্ষাতেই বোধহয় তাঁরা বেঁচে ছিলেন এতদিন, দীর্ঘদিনের দারিদ্রে যে না পাওয়া সঞ্চিত হয়েছিল মনে, তার অবসান হয়। তারপরে সেই পাওয়ার তৃপ্তিতে দুজনের জীবনেই আসে মৃত্যু।

এমন নামহারা বিচিত্র চরিত্রদের লেখক ভালোবাসতেন, তাঁর জীবনে নিঃসন্দেহে দেখা মিলেছে এই মানুষদের সঙ্গে, 'স্মৃতির রেখা' বইতে তিনি বলেছেন, "জীবনে বার কয়েক এ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং আমি এদের ভালও বাসি।"

আপাতত আর একটি গল্পের কথা বলতে হবে, গল্পের নাম 'ঝগড়া', বই 'কুশল পাহাড়ী' (চৈত্র, ১৩৫৭)। সত্তর বছরের বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলীর জীবনটা স্ত্রী-কন্যা নিয়ে শেষবয়সে সুখীই হতে পারতো, তবে হয় না। অকথ্য অপমান করে আপনজনরাই বাড়ি থেকে বের করে দেন রাত্তিরবেলা। নিজের স্ত্রী, নিজের মেয়ে, যারা তাঁর কম বয়সের কর্মক্ষম দিনগুলিতে পাশে ছিল, যাদের ভালো রাখবার জন্য তাঁর চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না, তারাই তাঁর মৃত্যুকামনা করে। অসহায়ভাবে এর ওর বাড়ি ঘুরে, অনেক অভিমান নিয়ে, সেই প্রথম বিবাহের পরে নবদম্পতি যেখানে থাকতেন, যেখানে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়, সেই নবযৌবনের স্বপ্নভরা দিনগুলিতে, সেই তিনপাহাড় স্টেশনে কোনোমতে পৌঁছোন। সেইখানে মৃত্যু হয় তার। তবে মৃত্যুর আগে তিনিশেষবারের মতন ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের সেরা দিনগুলিকে আবার, পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী'র সঙ্গে কাটানো সেই ভালোবাসা ভরা দিনগুলি, পেয়েছিলেন বহুদিন আগে মৃত শিশুপুত্র সান্টুকে, দু'দিনের জন্যে। হয়তো সেই ফিরে পাওয়া সাধারণ মানুষের হিসেবনিকেশে আদপেই 'বাস্তব' নয়, কিন্তু কেশব গাঙ্গুলীর কাছে জীবনের শেষ দুই দিনে তার চেয়ে বেশি সত্যি আর কিচ্ছু ছিল না।

-সান্টু-বাবা-সান্টু!

আজ কোথায় গেল খোকা?

পঞ্চাশ বছর আগে সে এই ঘোড়ানিম গাছটার তলায় যে খেলা করতো!

যেন শান্তি পেলেন কেশব গাঙ্গুলী যৌবনের হারানো দিনগুলোর মধ্যে আবার ফিরে এসে, তিনপাহাড়ের নির্জন প্রান্তরে, প্ল্যাটফর্মে, অন্ধকার আকাশের তলায় এসে। তিনি আবার ছাব্বিশ বছরের যুবক কেশব গাঙ্গুলী, এই ইস্টিশনের তার-বাবু-বুকে কত আশা, কত বল, কত উৎসাহ, চোখে কত স্বপ্ন! তাঁর খোকা সান্টু আছে কাছে, তার তরুণী মা মুক্তকেশী আছে।

সব তিনি ফিরে পেয়েছেন।

-সান্টু, আয় আমার কোলে আয়। রামদেও এখন তোকে বাসায় নিয়ে যাবে না।

খেলা করে বেড়া প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মের ঘোড়ানিম গাছটার তলায় দুদিন কেশব গাঙ্গুলী শুয়ে রইলেন।

নির্জন স্টেশন, বিশেষ কেউ লক্ষ্য করতো না। সত্যি কি অপূর্ব আনন্দে কাটলো এই দুটো দিন। সব ফিরে পেয়েছিলেন আবার।

পঞ্চাশ বছর আগেকার হারানো সব দিনগুলি।[১২]

তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরে স্ত্রী, কন্যা খবর পান। তাঁকে তো চিরকালের মত হারান স্ত্রী মুক্তকেশী, কিন্তু তিনি স্ত্রী-কন্যাকে ফাঁকি দিয়ে যাননি। কেশব গাঙ্গুলির একমাত্র স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, কুরুভাইজার ফ্রেরিসের ঘড়িটা মৃত্যুর পরে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যায়।

এরকম আর একটি গল্পের নাম, 'বেনীগীর ফুলবাড়ি'(১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'প্রত্যাবর্তন'। গল্পের ছেলেটি অন্য লোকের অনুগ্রহে পাল্লা-হরিশপুরের মাইনর স্কুলে পড়ে। বাড়ি ছেড়ে এখানে থেকে পড়াশুনা করতে তার কষ্ট হয়। প্রথমত এক বছর ধরে সে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, আর তারপরে তার ছোট ভাইটিকে ছেড়ে খুব মনকেমন করে। এরকমই একটা দিন জ্বর গায়ে, বোর্ডিং থেকে বিতাড়িত কারণে সে দীর্ঘপথ পেরিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এ তার প্রত্যাবর্তনের গল্পই বটে। তবে কেমন হয় সেই ফেরা? কেবল হাঁটতে হাঁটতে পা আর চলতে চায় না। গা বমি বমি করে। কেবল মা এর কাছে পৌঁছোন'র আগ্রহে সে চলতে থাকে। তার চলার একমাত্র শক্তি ছিল এই যে, যেভাবেই হোক, মা'কে দেখতেই হবে। প্রতিমুহূর্তে তার মনে হতে থাকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এবার অন্ধকার নামবে। জ্বরের ঘোরে সে দেখে গোপাল তাকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, পুরুত ঠাকুরের স্ত্রী বিরক্ত হয়ে যা তা বলছেন, আর ননী মাস্টার বলছে, এবার সে মারা যাবে।

শেষপর্যন্ত ছেলেটির প্রকৃত প্রত্যাবর্তন হয়নি। এ গল্পকে তার প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে'র গল্প বলা যায়। তার জীবনের চিরসন্ধ্যা নেমে এসেছিল সেদিন পথেই।

কিন্তু লেখকের অপরিসীম উদারতা এবং অনুগ্রহের হাত থেকে স্কুলের ছেলেটি বঞ্চিত হয় না। এভাবেই বিভূতিভূষণ অনেক মর্মান্তিক মৃত্যুর গল্পকে শেষখানে এসে পরিণত করেন ইচ্ছেপূরণের গল্পে। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবার মতন মমত্ব যেমন জীবন কখনও দেখায় না, তেমনই মৃত্যুকে রোধ করে জীবনকে জিতিয়ে দেবার পক্ষপাতী লেখক নন, তবে তিনি মৃত্যুর পথটাকে মসৃণ করে দেন শেষ ইচ্ছাপূরণের সামগ্রীগুলি সাজিয়ে।

পথে মৃত্যু হল যে ছেলেটির, মা এর সঙ্গে সত্যি দেখা করবার কোনও সুযোগ যার হল না, তার সেই অফুরন্ত যন্ত্রণাদায়ক পথে একসময় সে দেখতে পায় জামতলাতে আঁচল বিছিয়ে বসে আছেন তার মা, তারই পথ চেয়ে। ছেলেটি টলতে টলতে গিয়ে মা এর কোলে শুয়ে পড়ে। মাথায় চোট লাগে। সেই শেষ।

এই কয়েকটি গল্পের মধ্যে একটি মিল পাওয়া যায়। আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি, জানি না মৃত্যুমুহূর্তের প্রকৃত স্বরূপ, কেমনভাবে জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে আসে মানুষের কাছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ এই চরিত্রগুলির শেষসময়টুকু সহনীয় করে তুলেছেন, সারাজীবন তাঁরা যত অশান্তি আর কষ্টই পান না কেন, সহানুভূতিশীল লেখকের হাতে তাদের জীবনে মৃত্যুর আগমন হয় মোহনরূপে।

সময়ের বড়ো বিচিত্র প্রয়োগ দেখেছি বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে, চোখের পলকে পেরিয়ে যায় দশ পনেরো কুড়ি বছর। সময়ের পুঁজিবাদি ধারণা, তার হিসেবনিকেশের সঙ্গে তাল মেলাতে পারতেন না এই বেহিসেবি লেখক।

'জন্ম ও মৃত্যু' বইয়ের (ফাল্গুন, ১৩৪৪) 'অন্নপ্রাশন' গল্প 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা (আশ্বিন ১৩৪৩)-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবার সান্যালদের শিশুপুত্রের অন্নপ্রাশনের দিনকেই সে বাড়ির কর্মচারী কেশবের দশ মাসের সন্তানের মৃত্যু হয়, কয়েকদিন পরে তারজন্যও ছিল মুখেভাতের পরিকল্পনা, কেবল পয়সার অভাবে ঠিক জোগাড় করে ওঠা হয়নি, আর সেই সুযোগ সে না দিয়েই চলে গিয়েছে দূরে। সন্তানশোকের কিছুমাত্র উপশমের আশায় কেশব আর তার স্ত্রী'কে সারাদিন ব্যস্ত রাখে সান্ন্যালরা, রাত্রে পেট ভরে খাবার খাওয়ার পরে খোকার শোক যেন কিছু কমেও যেতে থাকে, কেবল রাত্রে, বৃষ্টিতে শূন্য ঘরে ফিরে কেশবের মনে পড়ে যায়,

> সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল- সর্বনাশ! ভয়ানক বৃষ্টি আসিয়াছে! খোকা, কচি ছেলে, নিউমোনিয়ার রোগী, বাঁশতলায় তার ঠান্ডা লাগিতেছে যে!... পরক্ষণেই ঘুমের ঘোরটুকু ছুটিয়া যাইতেই নিজের ভুল বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ভাবিল- আহা, যখন পুঁতি, তখনও ওর গা গরম, বেশ গরম ছিল...[১৩]

'ভিড়' গল্পে মৃত্যুর ব্যবহার অন্য গল্পগুলোর চেয়ে কিছুটা অন্যরকম। 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ ১৩৫০-এ এই গল্প প্রকাশিত হয়। পরে বিভূতিভূষণের সপ্তম গল্পগ্রন্থ 'নবাগত'র অন্তর্ভুক্ত হয় গল্পটি। ১৩৫০ সাল বাংলার ইতিহাসে যে গভীর ক্ষত তৈরি করে রেখে গিয়েছে স্থায়ীভাবে, তার কারণ এই বছর সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, যা কি

না মানুষেরই সৃষ্টি। মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষের লোভ কীভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের না খেয়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সে গল্প আমাদের পরিচিত। ক্ষুধা মানুষের সব মূল্যবোধকে যে কেড়ে নিতে পারে, এ দৃষ্টান্ত ও বাংলা সাহিত্যে অপ্রতুল নয়। তবে সরাসরিভাবে এই গল্পে মৃত্যু নেই। আছে একটি রেলস্টেশনের বর্ণনা। গল্পের কথকের কাছে এই বর্ণনা একেবারে নতুন, প্রথমত ভিড়, দ্বিতীয়ত পরিস্থিতির চাপে, বিপদে পড়ে মানুষ যেন কীভাবে তার এতদিনের অর্জন যে মমত্ব তা হারিয়ে রূঢ়-কঠোর হয়ে পড়েছে। কীভাবে অন্যকে টপকে, অন্যকে বিপদে ফেলে নিজের সুবিধাটুকু লাভ করে নেওয়া যায়, তারই দিকে সবার নজর, সহযোহিতা তো দূরের কথা, পরিস্থিতি মানুষ আর পশুর ফারাকটুকুকে মিলিয়ে দিয়েছে যেন।

কিন্তু যে মুসলমান লোকটিকে গল্পের শুরুর থেকে জঘন্য খুনী বলে মনে হচ্ছিলো, দেখা যায় যুদ্ধের বাজারে, অনাহার আর দুর্ভিক্ষের বাজারে সেই লোকটিরই অজানা জ্বরে পুত্রবিয়োগ হয়েছে। ট্রেনের কদর্য ভিড়ে, গালাগাল আর অসন্তোষের বন্যায় যে পরিস্থিতি ছিল তীব্র বিরাগপূর্ণ, একটি মুহূর্তে সব পালটে যায়, এক অচেনা সহযাত্রীর সন্তানশোকের সমব্যথী হয়ে ওঠে প্রত্যেকে। ছেলেহারা বাবাকে নেমে যাবার মুহূর্তে আশীর্বাদ করেন এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ট্রেনের ভিড়, যুদ্ধের বাজারে সংকুচিত স্বার্থপর মন অথবা ধর্ম, কোনো কিছুই তাকে সমবেদনা জানানোয় আর বাধা হয়ে থাকেনা।

> এইবার যে স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়াল, সেখানে লোকটি নেমে যাবে! গাড়ির এক কোণে একটি দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ব'সে ছিল, সে আবেগভরে বললে,- এখানে নামবে? আচ্ছা বাবা, ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন, আমি বুড়ো বামুন, আশীর্বাদ করছি, ভালো হবে তোমার, ভালো হবে।[১৪]

'বিপদ' গল্পটি বিভূতিভূষণের দ্বাদশ গল্পগ্রন্থ 'অসাধারণ'(১৩৫৩)-এ সংকলিত। পথের মধ্যে, নিজের আত্মমর্যাদা আর নির্লোভ মনকে নীচু করতে পারেননি রাধারমণ ভট্টাচার্য। সামনে সব প্রলোভন ছিল, দিব্যি টাকা পয়সা সিধে নিয়ে বেঁচে যাবার উপায়ও ছিল, তবু লেঠেল ডাকাতদের হাতেই পুজোর দিনে প্রাণটা দিতে হয় ওঁকে। মৃত্যুকালে ছোট্ট ছেলেটি আর স্ত্রী কাদম্বিনীর কথা বড় মনে পড়েছিল পুরোহিত রাধারমণের।

'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' ('আচার্য কৃপালনী কলোনী', ১৩৫৫) গল্পে লোকটির নামে একটা 'সাহেব' শব্দ ছিল বটে কিন্তু কথা বলতেন যশোরের বাংলায়, স্ত্রী-কন্যা মারা

যাবার পরেও আজন্মকালের বাংলাদেশেই থেকে যান তিনি, নিজের বলতে ছিল দেশের লোক, আর বহুদিন আগে পরলোকগত বাবা-মা এর স্মৃতি। শুধু একটি আকাঙ্খা ছিল তাঁর, সে ইচ্ছে তার পূরণ হয়।

> ফালমন্ সাহেব বলিতেন- এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালবাসি। যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলাডায় কবর দিও, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবে।[১৫]

সাহেব বলতে মনের মধ্যে তৈরি হওয়া এক অপরিচিত সুদূরের বোধ 'জ্যোতিরিঙ্গন' (চৈত্র, ১৩৫৫) বইয়ের 'থনটন কাকা' গল্পেও আছে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাংলার গ্রামে এক স্কুল মাস্টারের বাড়িতে ভাত-ডাল খায়, বাংলায় নাম সই করতে শেখে। মোটা ভাতকাপড়ে অভ্যস্ত মাস্টারকে দিয়ে যায় এদেশের অজানা কয়লাখনির সন্ধান। সেই জমি কিনে, সমৃদ্ধির নানান ধাপ পেরিয়ে আজ মাস্টারের উত্তরপুরুষ সাত-আটটা কয়লাখনির মালিক। বাড়িতে সেই ছেলেটি রেখেছে তাদের ছেলেবেলায় দেখা থনটন কাকার ছবি। আর্টিস্ট দিয়ে আঁকানো। ছেঁড়া প্যান্টপরা সাহেব ভাঙা সান্‌কিতে ভাত খাচ্ছে। দেশে ফিরে থনটন সাহেব কোনও খবর দেয়নি, সম্ভবত জাহাজেই তার মৃত্যু হয়। কোন অচেনা থেকে এসেছিল যেন কোন সুদূরের অতিথি। অজানা সমৃদ্ধির হদিস দিয়ে আবার কোথায় হারিয়ে গেল। আজকের প্রাচুর্য এই বাঙালি পরিবারটির অনায়ত্ত থেকে যেত, যদি না তারা পেত ভিখারীর বেশে আসা মেরিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আনুকূল্য।

অপরের দেশকে ভালোবেসে, দেশের সাধারণ মানুষকে ভালোবেসেছিলেন ফালমন্ সাহেব বা থনটন কাকা, কারুর মৃত্যু হয় এ দেশের মাটিতেই, কারুর বা দেশের ফেরার পথে। এ গল্পের মধ্যে আছে সেই পিছুটানের সুর, যে পিছুটান পথের সঞ্চয়। মৃত্যুতে যে পিছুটান তার অন্তিম পরিণতি পায়।

> আখাউড়া থেকে আগরতলা মাইল পাঁচ-ছয় দূরে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অনেকদিন ধরে দেখবার বড় সখ ছিল। আমি যে সময়ের কথা বলচি, তখন মোটর বাস হয়নি, আখাউড়া থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আগরতলা গিয়ে পৌঁছুলাম বেলা প্রায় দশটার সময়।
>
> কোথায় গিয়ে উঠবো কিছু ঠিক ছিল না, গাড়িতে একজন বলেছিল বিদেশী ভদ্রলোক গেলে মহারাজার অতিথিশালায় উঠতে পারে...
>
> ...

> আমি গিয়ে দেখি অত বড় বাংলোতে একজন মাত্র সঙ্গী- আর কোনো অতিথি তখন নেই। জিগ্যেস করে জানলুম তিনি প্রায় মাসখানেকের বেশি আছেন রাজ-অতিথি রূপে। ইনি অদ্ভুত ধরণের মানুষ, একাধারে ভবঘুরে দার্শনিক, কবি ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।
>
> অনেকদিন হয়ে গেলেও এই ভদ্রলোকের কথা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইগুলির দু-একটি চরিত্রের মূলেও ইনি প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান।[১৬]

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান,

> সম্ভবতঃ ইনিই থনটন কাকা, শরৎ সান্যাল প্রভৃতি চরিত্রের উৎস।[১৭]

'অবিশ্বাস্য' ('কুশল পাহাড়ী', ১৩৫৭) গল্পে রয়েছে ঠিক দুটি দিনের ছবি। একদিন এক গরিব ইস্কুল মাস্টারের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে আসে তার ছেলেবেলার বন্ধুর আমন্ত্রণপত্র, আপাতত যিনি এরোড্রামের চিফ এন্‌জিনিয়ার। বড়োলোক বন্ধুর বাড়ি যাবার যে সংকোচ, তা সেই বন্ধুর পরিবারের সহজ, সমবেত আতিথেয়তায় কেটে যায়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে যে চাহিদা কখনোই পূরণ হবার নয়, সেই সখ আহ্লাদ একটি দিনের জন্য পূর্ণ হয়। বাড়ি ফিরে ইস্কুল মাস্টারের স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়েন পরবর্তী নিমন্ত্রণের আয়োজন করতে। তাঁদের ইচ্ছা হয় এই ভালোবাসার বিনিময়ে তাঁদের সাধ্যমত খাইয়ে, নিমন্ত্রণ করে ভরিয়ে দিতে। পরের সপ্তাহে বন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেন গল্পকথক। ব্যবস্থাও হয়ে যায় যথাসাধ্য। কিন্তু ঠিক নির্দিষ্ট দিনের আগেরদিন খবর আসে ডিনামাইট ফেটে সেই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। কোনো কথা ছিল না বহুবছরের পরের এই পুনর্মিলনের, পুনর্মিলন যে আসলে চিরবিচ্ছেদের স্টেজ রিহার্সাল তা কাহিনির চরিত্ররা কেউ বুঝতে পারেন নি।

কিন্তু বিভূতিভূষণের পাঠকরা সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন। এই হল লেখকের স্বাভাবিক প্রবণতা, বহু আদর যত্নে লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, আত্মজ-আত্মজাদের বড় করে তোলেন, তাদেরকে খুন করবেন বলে। গল্পের চরিত্রদের ঘিরে পাঠক যখন বুনে ফেলেন সম্পর্ক, ভালোবাসতে থাকেন তাদেরকে, সেই ভালোবাসায় একমাত্র অনুঘটকের কাজ করে লেখকের কলম, ঠিক সেই আন্তরিক মুহূর্তে, পাঠকের বিন্দুমাত্র মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া লেখক নিজে হত্যা করেন সন্তানদের। প্রায় প্রতিটি গল্পের নাম হয় অত্যন্ত সাধারণ, যার মধ্যে ভয়াবহতা বা মৃত্যুর কোনো ঈঙ্গিত থাকে না, গল্পের লেখনী আর তার বিষয়ের মধ্যে থাকে একধরণের বিপ্রতীপতা বা কনট্রাস্ট। কাহিনিগুলি সম্পর্কের, একজনের সঙ্গে আরেকজনের অথবা একাধিক মানুষের সম্পর্ক

কিংবা কোনোকিছুর সঙ্গে গড়ে ওঠা গভীর সম্পর্ক, যে সম্পর্কের অনিবার্য পরিণতি মৃত্যু।

বিভূতিভূষণের গল্পে অনেক সময় একই বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে। এসেছে একইরকম চরিত্ররা তাদের একইরকম আনন্দ, যন্ত্রণা, অসহায়তা বা দারিদ্র নিয়ে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরিণতি হয়েছে প্রায় এক। কিন্তু তবুও গল্পগুলি অনন্য হয়ে উঠেছে তাদের নিজস্বতায়। সেই স্বাতন্ত্রের প্রধান বাহন বিভূতিভূষণের ভাষা, তাঁর সৃষ্ট সংলাপ।

একটি গল্পের নাম 'খেলা', অপরটি 'দাদু' এবং তৃতীয়টি 'নিষ্ফলা'। একটি শিশুর ও তার পিতার গল্প, অন্যটি বৃদ্ধ আর তাঁর পুত্রের, তৃতীয়টি একটি মেয়ে আর একটি অসুস্থ কুকুরের। পত্রিকায় প্রকাশকাল না জানা গেলেও, 'দাদু' গল্প 'জ্যোতিরিঙ্গন' বইয়ের, 'খেলা' 'কুশল পাহাড়ী'র, 'নিষ্ফলা' গল্পটি 'বেনীগীর ফুলবাড়ি'র। প্রথম দুটি গল্প প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৯ এবং ৫০ সালে, আন্দাজ করা যেতে পারে প্রথম দুই গল্প লেখবার মধ্যে হয়তো ব্যবধান খুব বেশি সময়ের নয়।

> খোকা ডাঙা থেকে ডাকলে- ও বাবা-বাবা-
>
> দূর থেকে মতিলাল উত্তর দিলে- কি?
>
> -আমি যাই-
>
> -না, আর নদীতে নামে না। ঠিক থাকো।
>
> -ও বাবা-
>
> -থাক্ দাঁড়িয়ে ওখানে-
>
> খানিকটা পরে বাবাকে আদৌ আর না দেখতে পেয়ে খোকা ডাকতে লাগলো- বাবা-বাবা-
>
> কোনো সাড়া নেই।
>
> -ও বাবা- ও মতিলাল-
>
> কোনো দিকে মতিলালের দেখাও নেই।
>
> -ও মতিলাল, ভয় কব্‌বে-
>
> খানিকটা চুপ করে থেকে সে ভয়ের সুরে বললে- ছিয়াল! বাবা, ও বাবা-[১৮]

ছেলে যেমন বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারত না, বাবারও ছিল একই হাল। ছেলেকে একটি মুহূর্তের জন্য চোখের আড়ালে রাখবার ক্ষমতা তার ছিল না। তাদের এই

ভালবাসা, মান-অভিমানের খেলায় ছেলের মা পাত্তা পেতেন না। সেই বাবা মতিলালকে ছেলের এমন মিনতিভরা ডাক উপেক্ষা করতে হয়েছিল, কুমীর টেনে নিয়েছিল তাকে। পিতৃহারা প্রাণের আকুল কান্না নিয়ে এক বছর পরে সেও বাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে অজানা পথে। গল্পের নাম 'খেলা'। অল্পদিনের ছেলেখেলা তাদের, অল্পদিনে শেষ হয়ে যায়। পিতা-পুত্র দুজন মিলে বেরিয়ে পড়ে অল্পদিনের ব্যবধানে, অচেনা পথে খেলবে বলে।

অত্যন্ত বৃদ্ধ, অবুঝ, ছেলেমানুষ দাদুকে মা বা নাতি নাতনিরা এক্কেবারে মেনে নিতে পারতো না, তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সমস্ত ছেলেমানুষি আবদার মেটাতেন বাবা। দাদুর একমাত্র ছেলে। সেই ছেলে বৃদ্ধকে ফেলে মারা যান।

দুষ্টু কুকুরটির বাড়িতে নানান কান্ড বাঁধিয়ে রাখায় ছিল জুড়ি মেলা ভার। বাড়ির গৃহিনী এই নিয়ে বিরক্ত ছিলেন। তাও সুশ্রী বিলিতি কুকুরও নয়, দেশী কুকুর 'বেবী'। মাস দুয়েক আগে এই বেবী'র জীবনের যাত্রা শুরু হয়। আস্তাকুঁড়ের অশেষ দুর্ভোগ থেকে তাকে বাড়ির আরাম দিয়েছিল এ বাড়ির বধূটি। এই কুকুর শাবককে ঘিরে বাড়িতে নিত্যদিন অশান্তি আরম্ভ হয়, শুরু হয় স্বামীর সঙ্গে মান-অভিমান। এত করেও, এত সেবা-শুশ্রূষার পরেও বেবীকে বাঁচানো যায় না। পরিবারের আর কারুর তেমন কিছু এসে যায় না রোম ওঠা, হাড় বের করা অসুস্থ কুকুরের জন্য। কেবল সেই নিঃসন্তান বধূটি, রমা, তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে হারিয়ে শোকে অধীর হয়ে পড়ে।

'দাদু' আর 'খেলা' অথবা 'নিষ্ফলা', তিনটি গল্পই পাঠককে চূড়ান্ত অস্বস্তি দেয়। প্রতি ক্ষেত্রে অসহায় নির্ভরশীল মানুষদের থেকে তাদের ভরসার লোকটিকে কেড়ে নিয়ে যান লেখক।

বিভূতিভূষণের মৃত্যু নিয়ে এক বিচিত্র মোহ ছিল। সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্র যে যখনই যাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, অবশ্যম্ভাবীভাবে মৃত্যু ঘটেছে সেখানে। জীবনের এই বিচিত্র পথে যাতে একা একা চলতে শেখে তাঁর সন্তানরা, তেমন স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তিনি তাদের।

'নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব' এবং 'থনটন কাকা'- দুই গল্পেই আমরা পেয়েছিলাম পিছুটানের কথা। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে পিছুটান চিরকালীনতা পেয়েছে। সেইরকম আর

দুটির গল্পের কথা উল্লেখ্য এখানে। গল্প দুটিতে মৃত্যুর আকস্মিকতা নেই, মৃত্যুর নিষ্ঠুরতাও নেই। প্রত্যাশিত দুই মৃত্যুর গল্প 'আহ্বান' ও 'দুই দিন'। দুটি গল্প যথাক্রমে 'উপল খন্ড' (১৩৫২) এবং জ্যোতিরিঙ্গন' (চৈত্র, ১৩৫৫) বইতে প্রকাশিত।

'আহ্বান' গল্পের কথক বহু বছরের পরে দেশের বাড়িতে ফিরে এক বৃদ্ধাকে দেখে করুণা হওয়ায় কিছু সাহায্য করেন। নিছকই করুণা, ভালোবাসার লেশমাত্র তার মধ্যে ছিল না। কথক ব্যাপারটা যেখানে চুকে যাবে ভাবেন, সেইখান থেকে সেই বুড়িকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সূত্রপাত হয়। ঘটনার মতন ঘটনা নয়, বুড়ি এই একদিনের আন্তরিক সাহায্যকারীকে ভুলতে পারেনি। জনসমক্ষে 'গোপাল' বলে ডেকে বিব্রত করতে ছাড়েনি সে কথককে! যতই বৃদ্ধা তাকে নিজের ছেলে বলুক, সকলের সামনে সেই সম্পর্ক স্বীকার করায় একধরণের লজ্জা আছে। তবুও তার সেই টান তার পরবর্তী জীবনটুকুতে অক্ষুণ্ন ছিল। বুড়ি ছিল মুসলমান, কথককে আদর করে গোপাল সম্বোধন করতে তার কোনখানে একটুও অসুবিধা হয়নি! বিভূতিভূষণ তাঁর লেখায় এই উদাহরণ দিয়েছেন বারেবারে। দেখিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে, বাইরে থেকে কোনও শক্তি প্রভাবিত না করলে, ধর্মাচরণ ইত্যাদির তেমন জোর থাকেনা। সেই মনুষ্যত্বকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা ধর্মের সীমিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে বহুদূর প্রসারিত। বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছা ছিল এই যে তার গোপাল যেন মরে গেলে তার কাফনের কাপড়টা দেয়।

বহু অবহেলার পরেও কথক সেই অনাত্মীয়ের একান্ত আত্মীয়তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেননি! মৃত্যুর পরদিন এসে তিনি কাফনের কাপড় দিয়ে যান, আর তার কবরে অল্প একটুখানি মাটি।

> একটি গরুর গাড়ির পুরনো কাঠামোর ওপর বৃদ্ধাকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেছে। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়চে। কবর দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বল্লে- দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমিও দ্যাও
>
> -তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠান্ডা হবে-
>
> দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো
>
> -অ মোর গোপাল।[১৯]

'দুই দিন' এ আছে দুইটি দিনের কথা, যদিও সেই দুই দিনের ব্যবধান আটষট্টি বছর। একদিনের যিনি নববধূ, দীর্ঘ প্রায় সাত দশকের ব্যবধানে তাঁর শ্বশুরের ভিটেটি ছেড়ে যেতে পারেননি কোনখানে। এ পিছুটান ভয়ংকর। একদিন যারা এই বাড়িতে ছিল, তারা একে একে পাড়ি দিয়েছে। পড়ে ছিলেন শুধু সেই বৃদ্ধা, সব স্মৃতি আগলে। এই বাড়ির যে কাঁঠাল গাছটির তলায় একসময় তাঁর বিবাহ হয়, যে গাছের তলায় তিনি দুধে আলতায় গোলা পাথরের খোরায় পা দিয়ে নতুন গৃহে প্রবেশ করেন, সেই গাছতলাতেই তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হয়। তাঁর ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত হন, নাতিরাও... কেবল তাঁকে কেউ এই বাড়ি থেকে স্থানান্তর করতে পারেননি। এতদিনের লালিত সম্পর্ক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি পায়।

এইখানে এসে ছোটগল্প'র আলোচনার উপসংহারে আসা যাক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মেঘমল্লার' থেকে শেষের দিকের গল্পের বই 'জ্যোতিরিঙ্গন', 'কুশল পাহাড়ি'... বইয়ের গল্পগুলিকে ক্রমানুযায়ী পড়লে তাঁর মৃত্যুকে ছোটগল্পে প্রয়োগের ধারাবাহিকতা বুঝতে সুবিধা হয়। যদিও এই আলোচনার ক্ষেত্রে, সম্ভবমতন, ধরণ অনুসারে ভাগ করবার চেষ্টা করা হয়েছে গল্পগুলিকে। দেখা গিয়েছে কখনও কখনও তিনি মৃতদের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ, কখনও আবার মৃত্যুগুলিতে যেমন অপরিসীম নিষ্ঠুরতা, তেমনই নিষ্ঠুর সেই মৃত্যুর ফলশ্রুতি।

সাহিত্যের বাস্তবের সঙ্গে দৈনন্দিন বাস্তবের সামঞ্জস্য কতটা, এ বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ। তবু গল্পগুলির সঙ্গে একাত্ম হতে সুবিধা হয় লেখকের অনায়াস সুবোধ্য ভাষার বিন্যাসে, পরিস্থিতি গুলিও অত্যন্ত চেনা হয়ে ধরা দেয়, মনে হয় এ ঘটনার সাক্ষী আমরা সকলেই থেকেছি কখনও না কখনও।

মহাকাশ নিয়ে আগ্রহের উল্লেখ আমরা ওঁর দিনলিপিতেই পেয়েছি।

> আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রি, এই নির্জ্জন মুক্ত জীবন ভালবাসি। প্রাণ ভ'রে ভালবাসি। বাংলার বারান্দায় ডেক চেয়ার পেতে বহুদূরের জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলাম--- কালীধরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তার মাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশের রহস্য বার্ত্তার মত একটা বড় নক্ষত্র নির্জ্জন ঝাউ ঝাড়ের মাথায় জ্বল জ্বল করছে- হু হু পশ্চিমে হাওয়া বইছে। কি এক অপূর্ব্ব রহস্য মনে যে নিয়ে আসে! কি সব চিন্তা আনে? কি মাধুর্য্য..... মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! কেবল বহুদূরের কথা মনে পড়ে।[২০]

পেয়েছি আকাশ বা নক্ষত্রমন্ডলী দেখে বিস্মিত হবার কথা। সেই বিপুল, ধরাছোঁয়ার বাইরের যে জগৎ, তা তাঁর মনে জন্ম দিতো অনন্তের বোধ, এই বিশাল নিত্যপ্রবহমান ধারায় অতি, অতি ছোট মানুষের জীবন-মৃত্যু-জীবনের চক্র যে আনন্দ এনে দিতো, তা তিনি লিখেছেন। ব্যক্তিমানুষের জীবনে যে মৃত্যু বহন করে আনে যন্ত্রণা, বিশালের প্রেক্ষিতে তা সাধারণ, মৃত্যুর এই ধারাবাহিকতাই আবার নতুন কে নিয়ে আসবে। এই যাত্রা সেই বিচিত্র আনন্দ যাত্রা, অতি তুচ্ছ, নগণ্য হয়েও মানুষ যে যাত্রা পথের পথিক। সেই বোধ তাঁর মন আনন্দে ভরে তুলেছে বারে বারে। আর সেই পথের অনন্ত আনন্দযাত্রার আশ্চর্য তিলকই তো তিনি অপুর ললাটে পরিয়ে তাঁকে ঘরছাড়া করেছেন, হাজার মৃত্যুতেও ক্ষতবিক্ষত হয়েও যে পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। বিভূতিভূষণ 'স্মৃতির রেখা'য় নিজে বলেছেন,

> সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।[২১]

সাময়িকভাবে যা বিষাদের জন্ম দেয়, পরবর্তীতে তাই হতে পারে মুক্তির জানলা।

সেভাবেই তাঁর প্রতিটি গল্পে, মৃত্যুর প্রতি মুগ্ধতা নতুন জীবনকে আবাহন করবার ঈঙ্গিত নিয়ে আসে। যে মৃত্যুতে আপাত মলিনতা, যন্ত্রণা থাকলেও তা অনিবার্য বলে, সত্যি বলে, সুন্দর হয়ে উঠেছে। যাওয়া-আসার সেই খেলার দর্শক থেকেছে প্রকৃতি।

সাধারণ মানুষ এসব ভাবেনা, তা নিয়ে মনখারাপ ছিল বিভূতিভূষণের, হয়তো এ কারণেই তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের ভাবানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এক অনন্ত আনন্দধারার শরিক করতে চেয়েছিলেন পাঠকদের, প্রয়োজনে তার জন্য তীব্র নিষ্ঠুর হয়েছেন, প্রয়োজনে নির্লিপ্ত। কিন্তু নাড়িয়ে দেবার কাজটি তিনি করতে পেরেছেন সফলভাবে, একইসঙ্গে প্রবল কষ্ট আর অপরিসীম ভালো লাগার এক আশ্চর্য পথ রোমন্থন করেছেন পাঠকরা।

এই অধ্যায়ের শেষে একটি কথা বলা আবশ্যক। বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলির থেকে ছোটগল্পের মধ্যে যে মৃত্যু দেখানো হয়েছে তা ঠিক কোনখানে আলাদা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। তা কি কেবলমাত্র লেখার ধরণের তফাৎ, নাকি তার থেকে অন্য কিছু?

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমাদের আলোচ্য চারটি উপন্যাস, 'দৃষ্টি-প্রদীপ', 'অনুবর্তন', 'ইছামতী' এবং 'অশনি-সংকেত'-এ, একমাত্র শেষেরটি বাদ দিলে বাকি তিনটি

উপন্যাসই কম-বেশি বিভূতিভূষণের আত্মজীবনের অংশ। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক তেমন নয়।

উপন্যাস বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে লেখা হবার কারণেই সম্ভবত তা আত্মজীবন নিরপেক্ষ হয় না। কিন্তু ছোটগল্প গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিরপেক্ষ, বিভূতিভূষণের জীবনের অভিজ্ঞতার অংশ। এই মৃত্যুগুলি একেবারেই অপরের মৃত্যু, এই মৃত্যুকে অনেক নিস্পৃহ, কুটিলভাবে দেখা। তাঁর উপন্যাস এবং ছোটগল্প তৈরি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভাবনাগত, দর্শনগত তফাৎ থাকে। উদাহরণ হিসাবে যদি আলোচিত 'মৌরীফুল' গল্পের কথাই ধরা যায়, সেখানে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে গার্হস্থ্য হিংসার ছাপ। যা বিভূতিভূষণের রচনার ক্ষেত্রে অভিনব। বিভিন্ন মানবচরিত্রের দ্বন্দ্বের প্রকাশ এই গল্পগুলি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে।

১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী ভাগলপুরে বিভূতিভূষণ তাঁর দিনলিপির একটি পাতায় যে কথা লেখেন, সেই কথা গুলি এই ছোটগল্পের প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে।

> বৎসরে বৎসরে এরকম বসন্ত কত আসে- কত নতুন মুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম- মাথার উপরে নিঃসীম নীল শূন্য অনন্তের প্রতীক- এই নীল আকাশের তোলে বৎসরে বৎসরে এরকম কচি পাতা ওঠা গাছপালা, বনফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি ষাঁড়া বাঁশবনের আড়ালে যে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিমবনের আমবনের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেছে, তারই কথা লিখতে হবে। ওদের হাসিখুসি ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশা ভরসার যে কাহিনী, ওই দিয়ে দিতে হবে- তাদের জীবনের যে দিক আশাহত ব্যর্থতায় দীনতায় চোখের জলে অপমানে উদাসকরুণ, চাঁদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্ চিক্ করে, ফাল্গুন-দুপুরের অলস গরম দমকা হাওয়ায় যাদের দির্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যা যাদের মনের মত ঝুলিঝুলি অন্ধকার ভরা নির্জ্জন--- তাকেই আঁকতে হবে--- মানুষের এই suffering এতো বড়।[২২]

মানুষের এই চিরচেনা, অতি সাধারণ কিন্তু সুতীব্র এই বেদনা, যন্ত্রনা, আনন্দকে তুলে ধরেছেন বিভূতিভূষণ তাঁর ছোটগল্পে। মৃত্যু সেসব গল্পের পরিণতি নিঃসন্দেহে কিন্তু জীবনের খুঁটিনাটি তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে নিখুঁতভাবে।

তথ্যপঞ্জি :

১।বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মৌরীফুল*-কথা ও কাহিনী সিরিজ (পঞ্চম সংখ্যা), দেবী, কিরণলেখা (সম্পা.), কলকাতা : প্রকাশক অনুল্লেখিত, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৫।

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মেঘ-মল্লার*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৬২।

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র*-প্রথম খন্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১১৭।

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৬।

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৭।

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০১।

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা৭০৯।

৯।বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *গল্প-পঞ্চাশৎ*, কলকাতা : মিত্রওঘোষ, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা৩৪৮।

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫১।

১১।বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মুখোশ ও মুখশ্রী*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১২৪।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *কুশল পাহাড়ী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩৬।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ, *জন্ম ও মৃত্যু*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩৬২, পৃষ্ঠা ১৪৩।

১৪।বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *গল্প-পঞ্চাশৎ*, কলকাতা : মিত্রওঘোষ, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা ৫৯।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়,বিভূতিভূষণ, *আচার্য্য কৃপালনী কলোনি*, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৩।

১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অভিযাত্রিক*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

১৭। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২৫।

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *কুশল পাহাড়ী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭১-৭২।

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতিভূষণ গল্প সমগ্র*- প্রথম খন্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৩০০।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা*, কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৮২।

২১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮।

২২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮-২৯।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভূতিভূষণের নির্বাচিত উপন্যাসে মৃত্যু

চারটি উপন্যাস, 'দৃষ্টি-প্রদীপ', 'অনুবর্তন', 'ইছামতী', 'অশনি-সংকেত' যথাক্রমে ১৯৩৫, ১৯৪২, ১৯৫০ এবং ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে শেষটি আংশিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই চারটি উপন্যাসকে সামনে রেখে তাঁর মৃত্যুভাবনার খোঁজ করা হবে এই অধ্যায়ে।

সময়ের ক্রম অনুযায়ী উপন্যাস চারটির মধ্যেকার মৃত্যুকে আলোচনা করাই হবে এই অধ্যায়ের কাজ। এবং আলোচনার পরে সিদ্ধান্তে আসা যাবে এই মৃত্যুগুলি উপন্যাসের ক্ষেত্রে জরুরি ছিল কীনা, বা এর দ্বারা উপন্যাস গুলি আদৌ প্রভাবিত হয়েছে কীনা।দেখে নেওয়া যাবে, কেবলমাত্র কাহিনি অনুযায়ীই নয়, প্রতিটা উপন্যাসের উপস্থাপনার ধরণের ভিত্তিতে কেমন করে একটির থেকে অন্যটি পৃথক হয়ে যায়।

ক. 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এ মৃত্যু :

বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস 'দৃষ্টি প্রদীপ' লেখা হয় 'অপরাজিত'(১৯৩২) প্রকাশ হবার মাত্র মাত্র তিন বছর পরে, ১৯৩৫ সালে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জিতু'র মধ্যে অপু'র ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তবে জিতু'র সঙ্গে তার পার্থক্যও বিস্তর।

> দেখতে দেখতে কত দিন হয়ে গেল।
>
> তার পর সাত-আট বছর কেটে গিয়েছে। ...
>
> আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে অনেক দিন। তবু সে-সব দিনের ছন্নছাড়া মুহূর্তগুলোর জন্য এখনও মাঝে মাঝে মন কে'মন করে উঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারানো-বসন্তের জন্যে আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথে অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে... তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।[১]

জিতুর সঙ্গে অপুর প্রধান ফারাকটি তৈরি হয় এই জায়গাতে যে কোন অবস্থাতে অপুর ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়েনি। বলা যেতে পারত যে অপুর পরিস্থতি জিতুর চেয়ে আলাদা হওয়ার কারণেই তাকে থামতে হয়নি। কিন্তু যখন দেখা যায় অপু তার নাবালক

সন্তানকে গ্রামসম্পর্কিত দিদির কাছে রেখে চলে যায় দূর বিদেশে তখন কেবল পরিস্থিতির কথায় সীমাবদ্ধ থাকা যায়না। অপু কখনো তার এগিয়ে চলবার সঙ্গে আপোষ করেনি, সেই চলা টুকুই তার জীবনের সার্থকতা, সেটাই তার বেঁচে থাকবার আনন্দ, কোনও বাধাই সেখানে আর বাধা থাকেনা।

নীতু, জিতু আর সীতা তিন ভাইবোন বড় হচ্ছিল পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা এক চা বাগানে, জন্মে থেকে তাদের হিমালয়ের সঙ্গে পরিচিতি। তাদের বাবা চা-বাগানের কর্মচারী হবার সুবাদে নানান সুযোগ সুবিধা তারা ছোটবেলা থেকে পেয়েছিল। খাওয়া পড়া ছিল উন্নত, সাহেবী ধরণের। তাদের মা এর সঙ্গে ভাই, বোন সকলে মিলে বিদেশিনীদের কাছে পড়াশুনা, বুনন ইত্যাদি শিখেছিল যত্নে। স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের সঙ্গে নিকটাত্মীয়তার সুবাদে বাংলাদেশের সমতলের সঙ্গে সামান্যতম আলাপ হবার সুযোগ তাদের ঘটে উঠতে পারেনি। পাহাড়ে তাদের কোনও অভাব ছিল না। কেবল একটি মাত্র ঘটনা তাদের পাহাড়ে কাটানো দিনগুলিতেও বিব্রত করে তুলত। তাদের বাবার ছিল মদের নেশা। সেই নেশার ঘোরে স্ত্রী এবং অন্যান্য সন্তানদের মারধোর করতে তিনি পিছপা হতেন না, আবার নেশা কাটতে সেই আগের হাসিখুশী, উদার মানুষটি।

জিতুর বাবার এই বিপদজনক নেশাই তাদের সুখ আর সমৃদ্ধির সংসারে তীব্র সংকট ডেকে আনে, তাঁর চাকরি যায়। এবং তারপরে তারা সপরিবারে বাংলাদেশে তাদের পৈত্রিক গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। চব্বিশ বছরের অনুপস্থিতির পরেও সন্তান কাজলকে নিয়ে অপু ফিরে গিয়েছিল তাদের ছেলেবেলার নিশ্চিন্দিপুরে, কিন্তু জিতুর আর জীবনে কোনদিন পাহাড়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তার ছেড়ে আসা হয় চিরকালের। তবে এও ঠিক যে অভাব এবং সমৃদ্ধি থাকলেও জিতুর পাহাড়ের সঙ্গে অপুর নিশ্চিন্দিপুরের তফাৎ ছিল অনেক। অপুরা একদিনের জন্যেও সমৃদ্ধির মুখ দেখেনি। তীব্র দারিদ্র সহ্য করতে হয়েছে। তবু সেই দরিদ্রে মালিন্যের স্পর্শ ছিল না। জিতুর শৈশব আর প্রথম কৈশোরে ছিল নেশাগ্রস্থ বাবার হাতে মার খাবার আতঙ্ক আর তারপরে দেশে ফিরে আসবার পরে আসে প্রতিনিয়ত নিজেরই আত্মীয়দের কাছে অপমানিত হয়ে, তীব্র অভাবের মধ্যে এক অতি মলিন কর্কশ জীবনযাপন।

পাহাড়ে থাকা কালেই জিতু একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পেরেছিল, সে বুঝেছিল একটা বিশেষ কারণে সে তার অন্য ভাই-বোন বা প্রায় সকলের থেকেই আলাদা। এমন জিনিস সে চোখের সামনে দেখতে পেত যা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা দেয় না।

এই কাঞ্চনজঙ্ঘার সম্পর্কে আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে। ...

সেদিনটা আমাদের বাগানের কলকাতা আপিসের বড় সাহেব আসবেন বাগান দেখতে। তাঁর নাম লিন্টন সাহেব। বাবা ও ছোট সাহেব তাকে আনতে গিয়েছেন সোনাদা স্টেশনে- আমাদের বাগান থেকে প্রায় তিন-চার ঘন্টার পথ। ঘোড়া ও কুলী সঙ্গে গিয়েছে। তখন মেমেরা পড়াতে আসত না, বিকেলে আমরা ভাইবোনে মিলে বাংলোর উঠোনে লাট্টু খেলছিলাম। সূর্য্য অস্ত যাবার বেশী দেরি নেই- মা রান্নাঘরে কাপড় কাচবার জন্যে সোডা সাবানজলে ফোটাচ্ছিলেন, থাপা লণ্ঠন পরিষ্কারের কাজে খুব ব্যস্ত- এমন সময় আমার হঠাৎ চোখে পড়ল কাঞ্চনজঙ্ঘার দূর শিখররাজির ওপর আর একটা বড় পর্ব্বত, স্পষ্ট দেখতে পেলাম তাদের ঢালুতে ছোট-বড় ঘরবাড়ি, সমস্ত ঢালুটা বনে ঢাকা, দেবমন্দিরের মত সরু সরু ঘরবাড়ির চূড়া ও গম্বুজগুলো অদ্ভুত রঙের আলোয় রঙীন- অস্তসূর্য্যের মায়াময় আলো যা কাঞ্চনজঙ্ঘার গায়ে পড়েছে তা নয়- তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব ধরনের। সে-দেশ ও ঘরবাড়ি যেন একটা বিস্তীর্ণ মহাসাগরের তীরে- কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথার ওপর থেকে সে মহাসাগর কতদূর চলে গিয়েছে, আমাদের এদিকেও এসেছে, ভুটানের দিকে গিয়েছে। তার কূলকিনারা নেই; যদি কাউকে দেখাতাম সে হয়তো বলত আকাশ ওই রকম দেখায়, আমায় বোকা বলত। কিন্তু আমি বেশ জানি যা দেখচি তা মেঘ নয়, আকাশ নয়- সে সত্যিই সমুদ্র।...[২]

ছোটবেলা জিতু এরকম দেখতে পেত খুব ঘনঘন, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার হার খানিকটা কমে যায় কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। এই যা দেখা যায়না তাকে দেখতে পাবার প্রভাব জিতুর জীবনে পড়েছে।

পাহাড় ছেড়ে গ্রামে ফিরে আসবার পরে তাদের যে অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়, তা অত্যন্ত করুণ। নিজেদের আত্মীয়রা সম্বলহীন এই কয়েকটি মানুষকে মাথা গোঁজবার আশ্রয়টুকু ছাড়া আর কিছু তো দেয়নি বটেই, উপরন্তু প্রতিনিয়ত তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করেছেন। জিতুরা তো বটেই, এমনকী তাদের মা ও দীর্ঘকাল পাহাড়ে থাকবার কারণে বাংলাদেশের সংস্কার পূজা এবং সে সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন খুব একটা জানতেন না। এই কারণে প্রতিনিয়ত তাদের শুনতে হয়েছে তারা বিধর্মী, খ্রীষ্ঠান... কিন্তু মানুষ হিসাবে তাতে অসুবিধা কী, এর অর্থ জিতু বুঝতে পারেনি। এ বাড়ির নিয়মকানুনের বাড়াবাড়ি তার সবসময় খুব চোখে লেগেছে। ঠাকুর পুজোর নামে মানুষকে যেখানে চরম অবহেলা করা হয়, সে জায়গাকে জিতু কিছুতে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি।

চাকরি খুঁজতে খুঁজতে ক্রমান্বয়ে ব্যর্থতায় জিতুর বাবার মধ্যে অদ্ভুত কিছু পরিবর্তন দেখা হয়। বাংলাদেশে ফিরে আসবার পরে তিনি আর কখনও মদ খাননি, কিন্তু তার মধ্যে কাজ করেছে এমন এক অপরাধবোধ, যা তাকে মনে মনে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল। আসতে আসতে তিনি পাগল হয়ে যেতে থাকেন।

একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতে জিতু দেখে ঘরের মধ্যে জ্যাঠাইমা, খুড়তুতো, জাঠতুতো ভাইবোনের দল সবাই দাঁড়িয়ে। মা কাঁদছেন। আর বাবা এক আশ্চর্য কাজ করছেন, বালিশের তুলো ছিঁড়ে পুঁটুলি বাঁধছেন। এবং বলছেন ছোট সাহেব তার করেছেন, তাদের আবার পাহাড়ে ফিরে যাবার ডাক এসেছে।

বিভূতিভূষণ তাঁর নরম প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে, সমগ্র সৃষ্টির বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রেখেছেন পরম নিষ্ঠুরতা। এই দৃশ্য, এই আক্ষেপ অনুশোচনা ভরা পাগলামির দৃশ্য তারই একটা উদাহরণ মাত্র।

এরপরে একটি ছোট ঘটনায় অমঙ্গলের এমন আশ্চর্য প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, মনে হয় যেন ক্ষণিকের জন্য মানুষের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে অসাড় করে দিল।

> পাড়ার চার-পাঁচজন ছেলে সঙ্গে আছে, মধ্যিখানে বাবা। ওরা বাবার সঙ্গে বাজে বকছে, শিকারের গল্প করচে, বাবাও খুব বকচেন। নিতাই আমাকে বাবার সামনে যেতে বারণ করাতে আমি আর দাদা পিছনেই রইলাম। ওরা মাঠের রাস্তা ধরে অনেক দূর গেল, একটা বড় বাগান পার হল, বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঘেমে আমরা সবাই নেয়ে উঠলাম। রোদ যখন পড়ে গিয়েছে তখন একটা বড় বিলের ধারে সবাই পৌঁছলাম। নিতাই বলল- ওই তো পাড়াগাঁয়ের জলা- চল, বিলের ওপারে নিয়ে যাই- ওই হোগলা বনের মধ্যে ছেড়ে দিলে আর পথ খুঁজে পাবে না রাত্তিরে। আমরা কেউ ওপারে গেলুম না- গেল শুধু সিধু আর নিতাই। খানিকটা পরে ওরা ফিরে এসে বললে, চল্ পালাই- তোর বাবাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়ে এসেছি- বসে বসে টানছে। চল, ছুটে পালাই।[৩]

বাবা পাগল, ছেলে তাকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, গ্রামের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বাইরে রেখে গেল, যাতে বাবা আর বাড়ি ফিরতে না পারে। বাবা বাঁওড়ের ধারে বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন।

একসময়ের অবস্থাপন্ন চাকুরিরত ভদ্রলোক যাবার পথটিতেও জানতেন না কী ঘটতে চলেছে তাঁর অদূর ভবিষ্যতে। কদিন পরে তিনি আবার ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ফেরার দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনও উঠতে পারেননি। সেই বালিশ ছিঁড়ে তুলো বের

করবার রাতটিতেই সম্ভবত তার প্রায় মৃত্যু হয় শারীরিকভাবে। মনের মৃত্যু যদিও হয়েছিল তারও অনেক আগেই চাকরি যাওয়ার পরের সেই চূড়ান্ত অসহায়তার দিনগুলিতে। যন্ত্রণার ব্যাপার তাঁর মৃত্যুতে সন্তানেরা শোক করেনি তেমন, অভিমান করেছে কিন্তু শোক নয়। ভুলের মাশুল তাঁকে দিতে হয়েছে জীবন দিয়ে।

জিতুরা গ্রামে আসবার পরে তাদের থেকেও গরিব একজনকে দেখেছিল। গ্রামে আসবার পরে, বিশেষত বাবার মৃত্যুর পরে আশ্রিতের মতন লাঞ্ছনায় মুখ বুঁজে জীবন কাটাতে হত তাদের। কিন্তু হীরু ঠাকুরের অবস্থা ছিল তাদের থেকেও খারাপ। অতি অপরিচ্ছন্ন পোশাক, কাঁচা-পাকা দাড়ি, লোকের বাড়ি খেয়ে বেড়ানোই খাদ্য জোগাড়ের উপায়। দাদা নীতু'র সঙ্গে হীরু ঠাকুরের ভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

এই হীরু জ্যাঠা অসহায় অবস্থায় জ্বর গায়ে জিতু দের কাছে আসে আশ্রয়ের জন্য। আশ্রিতদের কাছে আশ্রয় চাইতে আসার বিপদ অনেক। হাঁপোকাশের রুগীর বাড়িতে জায়গা হয়নি। সেজকাকা আর জ্যাঠামশাই দত্তদের কাঁটালবাগানের ধারে পোড়ো জমিতে খেজুর পাতার কুঁড়ে বেঁধে তাকে জায়গা করে দেন। কয়েকদিন এই অবস্থায় অর্ধাহারে থেকে তার মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুর দিন গভীর রাত্রে জিতু ঘুমের মধ্যে যে হীরুকাকাকে স্বপ্ন দেখে, তা রোগশীর্ণ অসহায় হীরু ঠাকুর নয়। তার মুখের কথা জিতু স্পষ্ট শোনে। তিনি অভিশাপ দিয়ে যান জিতু'র জ্যাঠামশাই এর পরিবারকে। পরে জিতু জানতে পেরেছিল, তার সামান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে একেবারে পথের ভিখিরি করে দেওয়ার পিছনে এই পরিবারটির বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরদিন সকালে হীরু জ্যাঠার মৃতদেহ দেখা যায়, ঠিক যেন ঘুমোচ্ছেন। নিতান্ত অভাগা হীরু জ্যাঠা'র মৃত্যুতে জিতুর সরল, ভালোমানুষ, সুদর্শন দাদা ছাড়া আর কেউ চোখের জল ফেলেনি। হীরু জ্যাঠা সেই চোখের জলের মূল্য দিয়েছিলেন তার বহু বছর পরে, কিন্তু সে খবর জিতু ছাড়া আর কেউ কখনও জানতে পারেনি।

জিতুর বাবা কিংবা হীরু ঠাকুর, দুজনেরই শোচনীয় মৃত্যু হয়।

জিতুর এ বাড়ির কাকা-জ্যাঠা'র ছেলেরা কেউই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত না কখনও। তাদের মুখে গালাগালি আর খারাপ কথা লেগেই থাকত। কেবলমাত্র একজন ছাড়া। সে জিতুর কাকার মেয়ে। বয়েস বছর সাত-আট। নাম পানী। সেই পানী অসুখে পড়ে। বড় ডাক্তার এসেও সে অসুখ ভালো করতে পারলেন না।

তারও মৃত্যুর আগের দিনে জিতু আবার দেখতে পায়। দেখতে পায় এক মহিলাকে যিনি এ বাড়ির কেউ নন, যাকে এখানে সে কখনও দেখেনি। তিনি বলেন তিনি পানী কে নিয়ে যেতে এসেছেন, তাঁর কাছে গেলে সে ভালো থাকবে। নির্ম্মলাকে এই কথা জানাতে। বেচারা জিতু জানত না নির্ম্মলা আসলে পানীর মা, তার কাকিমা। তার কথা তখন বাড়িতে কেউ বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। শুধু জিতু জানত যে সে আবার তাই দেখতে পাচ্ছে যা আর কেউ দেখতে পায়না।

কেবল পানীর মৃত্যুর পরে একদিন তার শোকগ্রস্থা মা জিতুকে এসে জানিয়ে যান যে জিতু যাকে দেখেছিল তিনি আসলে পানীর দিদিমা। পানীর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি মারা যান, পানীকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারতেন না।

জিতুদের এই পৈত্রিক বাড়িতে, একসময় চা বাগানের আদব-কায়দায় চলা জিতুর মাকে থাকতে হত অতি কষ্টে। জ্যাঠাইমা যেখানে ঠাকুরঘরে পবিত্র দেহে-মনে জপ আহ্নিক করতেন, সেখানে জিতুর মা কে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হত। তাঁর হাতে বাড়ির কেউ জল পর্যন্ত খেতেন না, অপরাধ তাঁর এই যে তিনি নাস্তিক মাতাল কেরানীর স্ত্রী, মেমের কাছে লেখাপড়া শিখে জাত খুইয়েছেন।

জিতুর মনে হত ঠাকুরও কেবলমাত্র বড়মানুষদের পূণ্যর জন্য, সে ধনীদের বিলাসিতার উপকরণ মাত্র! সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত, গরিব জিতুর মা বা বাড়ির কাজের লোক ভুবনের মা এর সময় কোথায় সেই ঠাকুরকে ছুঁতে পারেন। ঠাকুর যেন কেবল তাঁর উপকরণের, বিধি-নিষেধের খাঁচাটিতে আটকে পরে রয়েছেন। এইভাবে জিতু সারাজীবন একটা সমান্তরাল ঈশ্বর ধারণায় বিশ্বাস করে গিয়েছে। যে ঈশ্বর অর্থহীন সংস্কারে বদ্ধ নন।

বাবা'র মৃত্যুর পরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জিতর দাদাকে পড়াশুনা ছাড়তে হয়, নরম মনের ছেলে এই নীতু সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে চাইলেও স্বল্প পড়াশুনায়, সরলতায় রোজগারের পথটিতে পিছিয়েই ছিল। বোন সীতা'র ও আর পড়া হয়নি সেই ছেলেবেলার পাহাড়ের দিনগুলির পরে। কেবল জিতুই লেগে রইল জেদ করে। গ্রাম সম্পর্কিত এক দিদির শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুরে থেকে বহু কষ্টে লেখাপড়া এগিয়ে নিয়ে যায় জিতু। সে বাড়ির ছোটবৌঠাক্রুনের প্রতি অল্প বয়সের প্রথম দুর্বলতা তৈরি হয় জিতু'র। যদিও সে বাড়িতে থাকবার মেয়াদ তার অল্পদিনেরই ছিল, ভারি আদরে নিজের ঘরের লোকের মতন যত্নে সেই কয়েকটি বছর কাটে জিতুর।

ছোটবেলা থেকে খৃস্টান ধর্মের প্রতি জিতুর আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল। তা ধর্মগ্রন্থ পড়ে প্রভাবিত হয়ে নয়। শৈশবে পাহাড়ের দিনগুলিতে মেমসাহেবদের দেওয়া যীশু'র ছবি, সেই ছবির কারুণ্য জিতুকে আকর্ষণ করে। তাঁর সহিষ্ণুতার গল্প জিতুকে এই মানুষটিকে ভালোবাসতে শেখায়। আর তার পরবর্তী জীবনে পৈত্রিক বাড়ির দমবন্ধ করা ধর্মপ্রাণ আচারের অন্তরালে হিন্দুধর্ম বা তার ঠাকুরকে ভালোবাসবার সুযোগ জিতু পায়নি। বরঞ্চ তাঁর এই অন্যায্য পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত, ক্লান্ত হয়ে উঠেছে বারেবারে।

শ্রীরামপুরে কলেজে পরবার দিনগুলিতে অধ্যাপক পিকারিং সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয় জিতু'র। ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ হলেও তাঁর ধর্মমত জিতুর কাছে সেই জ্যাঠাইমাদের ধর্মমতের মতই গোঁড়া লাগে। ধর্ম সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন, নানান অতি যৌক্তিক জিজ্ঞাসা জিতু'র মনে ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল প্রতিটি ধর্মের অহংকার আর পক্ষপাতিত্ব নিয়েও। খৃস্টান ধর্মের প্রতিও তার কোনও ফারাক হয়নি।

কলেজের পরে জিতু চাকরি পায়, বড়লোকের বাড়িতে। সে চাকরি জীবন জিতুর কাছে তেমন সুখের হয়নি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, বিশেষত দরিদ্রকে বঞ্চিত করে, তাকে শোষণ করে যে ধর্ম কলেবর বৃদ্ধি করে তার প্রতি আস্থা রাখা জিতুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধর্মের নামে জীবনের, এমনকী সন্তানের তুচ্ছতম সম্বল দান করে দেয় মানুষ, ফলাফল এই যে দরিদ্র তাতে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। এইভাবেই জিতুর আলাপ হয় নিমচাঁদের সঙ্গে, যে নিমচাঁদ গরিব, মারা যায় কলেরায়, চিকিৎসার অভাবে বড়লোকের বাড়ির ধর্মানুষ্ঠানে এসে। এই নিমচাঁদ, তার স্ত্রী ভগবান কী জানেও না, চেনে তারা শুধু বটতলার গোঁসাইকে।

> ওদের রঙীন কাপড়-পরা ঝি-চাকরের লম্বা সারির দিকে চেয়ে মনে হ'ল এই বড়মানুষির খরচের দরুণ নিমচাঁদের স্ত্রী তিনটে টাকা দিয়েচে। অথচ এই হিমবর্ষী অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে হয়ত সে অনাথা বিধবার খেজুরডালের ঝাঁপে শীত আটকাচ্ছে না, সেই যে বুড়ী যার গলা কাঁপছিল তার সেই ধার-করে-দেওয়া আট আনা পয়সা এর মধ্যে আছে। ধর্ম্মের নামে এরা নিয়েচে, ওরা স্বেচ্ছায় হাসিমুখে দিয়েচে।
>
> সব মিথ্যে। ধর্ম্মের নামে এরা করেচে ঘোর অধর্ম্ম ও অবিচারের প্রতিষ্ঠা। বটতলার গোঁসাই এদের কাছে ভোগ পেয়ে এদের বড়মানুষ ক'রে দিয়েচে, লক্ষ গরীব লোককে মেরে- জ্যাঠামশায়দের গৃহ-দেবতা যেমন তাদের বড় করে রেখেছিল, মাকে, সীতাকে ও ভুবনের মাকে করেছিল ওদের ক্রীতদাসী।

> সত্যিকার ধর্ম্ম কোথায় আছে? কি ভীষণ মোহ, অনাচার ও মিথ্যের কুহকে ঢাকা পড়ে গেছে দেবতার সত্য রূপ সেদিন, যেদিন থেকে এরা হৃদয়ের ধর্ম্মকে ভুলে অর্থহীন অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মের আসনে বসিয়েছে।[৪]

এই বিকল্প ধর্মের খোঁজে, মানুষের ধর্মের কাছে পৌঁছোতেই জিতুর চাকরি ছেড়ে পথে বেরনো। অপুও একদিন এমনি ভাবে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়েছিল ট্রেনে চড়ে, অবশ্য অপু'র চাকরি গিয়েছিল। কেবলই অজানা পথের আকর্ষণ তাকে ঘরছাড়া করে আনে। জিতুর ক্ষেত্রে সেই পথের খিদে অপুর মতন ছিল না। জিতুর জীবনের পরিণতিই সেই কথা প্রমাণ করে দেয়। তবে পথে বেরিয়ে নানান মানুষের সঙ্গে আলাপ হবার অভিজ্ঞতার থেকে জিতুও বঞ্চিত হয়নি।

সীতার এক খারাপ পরিবারে বিবাহ কিংবা মা এর মৃত্যুর পূর্বাভাষ, জিতু তার সেই ছোটবেলায় না চাইতে পাওয়া ক্ষমতার মাধ্যমে পেয়েছিল। মা এর মৃত্যুর আগে তাই মা এর কাছটিতে থাকতে পারে সে।

এরপরে জিতুর দীর্ঘ পথচলা, পথে অচেনা মানুষের বাড়িতে আশ্রয়, এভাবে কাটতে কাটতেই দ্বারবাসিনীতে একদিন আলাপ হয় মালতীর সঙ্গে। জীবনে এই প্রথমবারের জন্য জিতু তার জীবনের গোপনতম কথা ভাগ করে নেয় কারুর সঙ্গে। বহু সুখ-দুঃখের বিনিময় হয় কিছু সময়ে। জিতু যখন মালতীকে বলে মহাপুরুষদের কোন জাত হয়না, তখন যেন বিভূতিভূষণ জাত-ধর্মের সংকীর্ণতার অনেক উঁচুতে উঠে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রকৃত মানবিক গুণের দিকে দৃষ্টি দেন। যা তার ঈশ্বরভাবনাকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। যে ঈশ্বর সার্বজনীন এবং এক, যিনি ধর্মনিরপেক্ষ। যে ধর্ম সেখানে একমাত্র তা মানবধর্ম।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে একটি জিনিস এর পরেও দেখা যায়, তা হল যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, কোনও নিবিড় প্রেমের মুহূর্তে, গভীর প্রেমে আবদ্ধ দুটি মানুষের কোনও একজনকে জলে ডুবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন অপরজন। জিতুও মালতীকে জলমগ্ন অচৈতন্য অবস্থায় বাঁচিয়ে তোলে।

কয়েকবছর মালতীর সঙ্গে থাকার পরে নানান প্রতিকূলতায় একদিন জিতুকে মালতীকে ছেড়ে যেতে হয় দ্বারবাসিনীর বৈষ্ণব আখড়া। সে বাধ্যতই, তবু তারপরে আর জিতু মালতীকে কখনও দেখতে পায়নি। অনেকদিনের পরে, তখন জিতু বিবাহিত, সেসময়

একদিন রাণাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আখড়ার পরিচিত বৈষ্ণব খবর দেন মালতীর মৃত্যুর।

ইতিমধ্যে মৃত্যু হয় আরও দুইজনের। একজন জিতুর দাদা, অপরজন তারই দশমাসের কন্যাসন্তান। জিতুর দাদার মৃত্যুর সময়ে জিতু সেইখানে উপস্থিত ছিল। জিতুর চোখে সেই দাদার মৃত্যু শোকাবহের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে ওঠে বিস্ময়কর। সে স্পষ্ট দেখতে পায় তার দাদার মৃত্যুশয্যাটি ঘিরে তার মৃত্যুকালে উপস্থিত হয়েছেন সমস্ত মৃত ঘনিষ্ঠরা। একসময়ে জীবিত অবস্থায় যাঁরা ভালোবাসতেন নীতুকে। মা, বাবা, হরু ঠাকুরের সঙ্গে সে দেখতে পায় তাদের ছোটবেলার নেপালি চাকর থাপাকে। যে তার দাদাকে অনেক বছর আগে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। উপন্যাসের শুরুতে একবার তার প্রসঙ্গ থাকলেও, বাকি উপন্যাসে সে আর কোথাও ছিল না। তার মৃত্যুর খবর জিতুরাও পায়নি সমতলে চলে আসবার পরে। নীতুর মৃত্যুর দিনে কোনও বহু পূর্বে ফেলে আসা দায়িত্ববোধ থাপাকে আবার ফিরিয়ে আনে তার কাছটিতে। সমালোচকের দৃষ্টিতে জিতুর এই দিব্যদর্শন কখনও কখনও গ্রন্থের দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। 'পরিচয়' পত্রিকার মাঘ-চৈত্র, ১৩৪২ সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র লিখছেন,

> খবর পাওয়া গেল--- আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যে গহন রহস্য লুকানো, যে বিশ্ব প্রসারিত, সেই অদৃশ্য বিশ্বের আবছায়া রূপ মাঝে মাঝে দেখতে পায় বালক জিতু তার অস্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে- যে অন্তর্দৃষ্টির বুদ্ধি বা যুক্তির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না বড় বেশী। আপত্তি নেই। কিন্তু তার জন্য জিতুর clairvoyance- এর উপর বাণিজ্য করার দরকার ছিল না। St. Francis of Assisi-র জীবনচরিত জিতুই পড়ুক বা বিভূতিবাবুই পড়ুন, রসসৃষ্টির দিক থেকে এই অতীন্দ্রিয়তার সংযম বিশেষ দরকার ছিল। ফলত জিতুর জীবনের নাক্ষত্রিক বিলাস তার সমস্ত অস্তিত্বকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। পাতায় পাতায় তার নাক্ষত্রিকতা আর clairvoyance আমাদের পীড়িত করে তোলে। অতীন্দ্রিয় বিলাস একটি বিশেষ কোন কবিতায় ঐক্য পেতে পারে। কিন্তু তাকে তিনশো পাতা ব্যাপী বইয়ে ছড়িয়ে দিলে পাঠকমন্ডলী লেখকের ওপর প্রসন্ন হতে বাধ্য নয়।...[৫]

'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ, ১৩৪২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ-সমালোচনায় শান্তা দেবীর বক্তব্য অনেকটা একই রকম।

> 'দৃষ্টিপ্রদীপ' নামের সার্থকতা নায়কের তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি হইতে। এবং নায়কের দেশাচারমুক্ত ধর্মবুদ্ধিও গল্পের একটি বিশেষত্ব। কিন্তু এই দুইটি বিশেষত্বের কোনটিই গল্পের পরিণতির পথে নায়ককে কোনও সাহায্য করে নাই, গল্পটিকে কিংবা নায়কের চরিত্রকে কোন বিশেষরূপ

দান করিতে চেষ্টা করে নাই; তাহারা যেন একসময়ে আকস্মিকভাবে নায়কের জীবনে আসিয়াছে, আবার আপনি মিলাইয়া গিয়াছে।...[৬]

অবশ্য আমাদের সমসময়ের সমালোচক জিতুর এই বহুবিতর্কিত বিশেষ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এইভাবে,

নিসর্গজগৎ পেরিয়ে 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ জিতু এসে পৌঁছেছে মনোজগতে। বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, মনোজগতে ইনটুইশনের গতি হল আলোর গতি। স্বভাবতই জিতুর শরীরী চোখ যতটা দেখে তার মনের চোখ স্বজ্ঞার দৃষ্টিপ্রদীপে অনেক দ্রুত অনেকটা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায়।[৭]

এই কাহিনির করুণতম মৃত্যুগুলির একটি যদি হয় জিতু'র বাবার মৃত্যু, অপরটি তবে নিঃসন্দেহে নীতুর শিশুসন্তানের মৃত্যু। নীতু'র মৃত্যু পরে তার স্ত্রী ও প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়লে, অভাবে, কার্যত অনাহারে মৃত্যু হয় শিশুটির। সংসারের সব দায়িত্ব সামলে জিতু'র পক্ষে সম্ভব হয়নি শিশুটি'র সর্বোচ্চ যত্ন করা। খুকী'র একটি আশ্চর্য গুণ ছিল এই যে, কিচ্ছু না পেয়ে, মা এর কাছে পাওয়া অতি ন্যায্য মাতৃস্তন্য বা আদরটুকুও না পেলেও সে হাসতে ভুলত না।

কিন্তু খুকী আমায় সব চিন্তা থেকে মুক্ত ক'রে দিলে। তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল।[৮]

খুকীর তুলনীয় মৃত্যু বিভূতিভূষণ নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর 'তৃণাঙ্কুর' গ্রন্থে এই ঘটনার প্রায় আক্ষরিক প্রতিবেদন লিপিবদ্ধ।

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচে ছিল--- কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ও আপন মনে হাস্‌তো- কিন্তু সবাই বল্‌তো "আহা কি হাসেন, আর হাস্‌তে হবে না, কে তোমার হাসি দেক্‌চে?"--- ওর অপরাধ- ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল; ওর মার ও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হোল--- ওকে কেউ দেখ্‌তো না। ওর খুড়ীমা বল্লে- টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দিই। ওকে নারকোল তলায় চট পেতে শুইয়ে রাখ্‌তো উঠানে--- আমার কষ্ট হোত। কিন্তু আমি কি করবো? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারিনে। ওর রিকেট্‌স্ হোল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল--- তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাস্‌তো-সেদিনও তেম্‌নি হাস্‌তে দেখে এসেচি--- ও শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। Unwanted Smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে--- খয়রামারির মাঠে ওর

> বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি--- এছাড়া আর কোনো চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও। Poor little mite! কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত,--- এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলে ফুলে কত কাল ধরে ফুটে আস্‌চে--- কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য--- খুকীর হাসিও তেম্‌নি।[৯]

উল্লেখ্য যে, এই খুকী বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবীর অকাল প্রয়াতা কন্য।[১০]

শেষপর্যন্ত কামালপুর গ্রামের পাঠশালার হিরন্ময়ীকে বিবাহ করে জিতু। তারপরে হয়তো ভবঘুরে জিতু সংসারী হয়েছিল, বাকি জীবনটা সেভাবেই কাটায় সে পরিচিত সুখ-দুঃখের মধ্যে।

এইখানেই শুরু হয়েছিল এ উপন্যাসের আলোচনা। জিতুর সারাজীবনের পাথেয় তার মুক্ত মন। যে মন তাকে ধর্মের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন করতে শেখায়। আর ভবঘুরে জীবনের অর্জন তিনটি প্রেম; কলেজ জীবনের ছোট বৌঠাকরুন, পথিক জীবনের মালতী আর পরিণত বয়সের হিরণ্ময়ী।

উপন্যাসে মৃত্যু এসেছে বারেবারে, যা উপন্যাসের কাহিনিকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সবচাইতে ভয়ানক রূপে এসেছে জিতুর খামখেয়ালী বাবার মৃত্যু আর দশ মাসের শিশুর মৃত্যু। তবে অপু'র মতই হয়তো জিতুকেও মৃত্যুগুলি তীব্রভাবে প্রভাবিত করলেও গতি রোধ করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত জিতুকে এসে নতজানু হতে হয়েছে জীবনের কাছে। একসঙ্গে বাঁচবার কাছে। জিতুও নক্ষত্রদের দেখে মুগ্ধ হয়েছে নানানসময়ে, দ্বারবাসিনীর রাত্রিগুলি তার এই অজ্ঞাতপরিচয় নক্ষত্রদের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে কেটেছে। জীবন যদি হয় আকাশ, তবে সেই আকাশের পটে তারার মতন খচিত রয়েছে মৃত্যু। সেই তারার আলোকেই আলোকিত হয় রাত্রির দিশাহীন পথ। ঠিক তেমনই মৃত্যু'র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন আর বেঁচে থাকা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, বারেবারেই।

খ. 'অনুবর্তন'-এ মৃত্যু :

১৯৪১ সালের শেষে স্কুলের চাকরি ছাড়বার পরে প্রথম যে উপন্যাস লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ সেখানেই খেলাত স্কুল হল মডার্ন ইনস্‌টিটিউশন আর ক্লারিজ হলেন ক্লার্কওয়েল।[১১]

'অপরাজিত' উপন্যাসে কানাডিয়ান সাহেব অ্যাশবার্টন অপুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কুলি-মজুর আমদানীর সার্থকতা ঘোষণা করে

নীরব হয়ে যাবে, তা হতে পারেনা। সেখানে অপুর মতন আর্টিস্ট লোকের প্রয়োজন আছে। এই বাংলার প্রকৃতিশোভায় সাহেব একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন।

> যতক্ষণ সাহেব শুধু ডাক দেয় সুদুর ফিজি-সামোয়ার প্রান্ত থেকে, যতক্ষণ ভিক্ষাবৃত্তি অচেনা সাহেবের ছদ্মবেশমাত্র, ততক্ষণ জীবন আর শিল্পের আবর্তে জটিলতা কম। কিন্তু যদি কোনো অল্পবিত্ত কালোসাহেব নিচ্ছন বাঙালীর প্রভু হয়ে বসে, সেই শিল্প তো হবে অনেক কঠিন বাস্তবে দীর্ণ।[১২]

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'র লেখক একদিন কলকাতা শহরের অলিগলিতে নিম্নবিত্ত বাঙালি স্কুলমাস্টারদের ক্লিন্ন, দুরূহ জীবনের রাস্তাকে চিনতে আর চেনাতে চাইলেন। জীবিকার লড়াইয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া সেসব বাঙালি শিক্ষকদের মাথায় বসালেন জি. বি. ক্লার্কওয়েলকে। বিভূতিভূষণের সাহিত্য আলোচনায়, এভাবেই মনে রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ, অ্যাশবার্টনের সুদূরের আহ্বান থেকে ক্লার্কওয়েল সাহেবের ইস্কুলে পৌঁছোনোর এই পরিক্রমাকে।

এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে, আসসিঙড়ি, কমলাপুর, বেড়াবেড়ির মত অবিভক্ত বাংলার যেসব গ্রামে মডার্ন ইনস্টিটিউশনের গরিব মাস্টারদের সামান্য ভিটেমাটি আছে অথবা হারিয়ে গেছে, কোনও আত্মীয়সজন আছে অথবা নেই, তেমনই এক গ্রাম চব্বিশ পরগনা জেলার আটঘরা। দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসে আটঘরার জমিদার বাড়ির ছেলে ইংরেজি শিখে চা-বাগানে সাহেবের চাকরি করতে গিয়েছিল। তার বউ ছেলেমেয়ে ইংরেজি শেখে, শেখে কেক, বিস্কুট বানাতে। সাহেবের চাকরি খুইয়ে যখন চা-বাগানের বাঙালি বাবু আটঘরায় ফিরে এল, জমিদার বাড়িতে তার অংশ তখন বিত্রি হয়ে গেছে।

চা-বাগানে মিস নর্টনকে ছেড়ে এসেছিল বালক জিতু। সেই নর্টন, যার কাছে বাল্যে জিতু পেয়েছিল সুন্দরের উপমা। কাঞ্চনজঙ্ঘার আশ্রয়ে সেই মেমসাহেব তাকে শিখিয়েছিলেন যীশুর আরাধনা করতে। সেই আভাস মিলবে মডার্ন ইনস্টিটিউশিনের সেইসব নাবালক ছাত্রের মধ্যে, ক্লার্কওয়েলের সঙ্গিনী মিস সিবসনকে বিদায় দিতে যারা দুঃখ পেয়েছিল।

সাবালক জিতুকে যদি বিভূতিভূষণ অপু'র উত্তরসূরী বানাতে না চাইতেন, যদি তাঁর না থাকত তাকে নায়ক বানানোর দায়, তাহলে হয়তো জিতুও সহজেই আভাস দিতে পারত ক্লার্কওয়েলের স্কুলের শিক্ষকদের। আটঘরার জীবন থেকে যে ভবঘুরে হয়ে যেতে চায়, মালতীর আকর্ষণেও যে লোচনদাসের আখড়ায় চিরস্থায়ী জীবনের কথা

ভাবতে পারেনা, তার সঙ্গেই কোথাও মিলে যেতে পারেন নারাণবাবু, ক্ষেত্রবাবুরা! অবশ্য কে-ই বা বলতে পারে যে জিতুর বিবাহ পরবর্তী জীবন তাদের মতই হয়ে গিয়েছিল কীনা।

গরমের ছুটিতে বরিশালে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে গরীব স্কুলমাস্টার নারাণবাবুর প্রাণ ওষ্ঠাগত। কথা বলবার লোক সেখানে পঞ্চানন মোক্তার। যিনি বিশ্বাস করেন কবিরাজ গোস্বামী'র পরে আর বই হয় না। বাংলায় তারপরে আর কোনও বই লেখা হয়নি। বিভূতিভূষণ লেখেন এরকম লোকের সঙ্গে লেস্‌লি স্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণবাবু কী তর্ক করবেন। কলকাতায় ফিরে নারাণবাবু ক্লার্কওয়েলকে বলেন কলকাতার মত জায়গা হয়না। সাহেবও সেই কথা স্বীকার করেন।

পৈতৃক গ্রাম আসসিঙড়িতে আমকাঁঠাল আর খাঁটি দুধের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সপরিবারে হাঁপিয়ে ওঠেন ক্ষেত্রবাবু। 'অনুবর্তনে' আছে, ক্ষেত্রবাবু নিজেই নিজের মনের ভাব দেখে অবাক হয়ে যান। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল কে তিনি এত অপছন্দ করেন, চাকরিকে যার জেলখানা ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না, সেই স্কুলের বিরহ তাকে ব্যথাতুর করে তুলছে।

এমনকী অতি অল্প শিক্ষিত থার্ড পন্ডিদেরও নোয়াখালি গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কলকাতা ছাড়া এঁদের জীবনে কোনও বিকল্প পান না এঁরা।

ক্লার্কওয়েলের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা জীবিকার তাগিদে, বেঁচে থাকবার জন্য দৈনন্দিনের অভ্যাসে কলকাতার পরবাসকেই জীবন মেনেছে। যতই মলিন হোক সেই জীবনের স্বরূপ, ফেলে আসা ভিটে-মাটি হারানো সেইসব মানুষের অস্তিত্বে মূল থেকে জন্মস্থান হারিয়ে গেছে। এমন ভাবেই হয়তো সাম্রাজ্যের ক্ষমতা আর উপনিবেশের শক্তি, দেশ হারানো মানুষদের একমাত্র যাত্রাপথ নির্দিষ্ট করে দেয়, অতীত বিচ্যুত এক উচ্ছিষ্ট জীবনে।

এরই মধ্যে ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী নিভাননী'র নীরব মৃত্যু ঘটে, ক্ষেত্রবাবু যথাযথ দেখভাল করতে পারতেন না, চাকরি আর টিউশনের গোলোকধাঁধায়। বরঞ্চ নারাণবাবু বোনের মতন দেখা এই মহিলাকে দেখতে যেতেন প্রায়শই, সাধ্যমতো ফল কিনে নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। একদিন গিয়ে দেখেন তার সেই রোগশয্যাটি চিরকালের মতন ফাঁকা করে চলে গিয়েছেন তিনি।

স্কুলে ছাত্র'রা নানান কান্ড বাঁধাত মাঝেমধ্যেই। এমনি একদিন খেলতে গিয়ে বল লেগে চোখ বেরিয়ে আসে। তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেটির বল লেগে আধ ইঞ্চি পরিমাণ চোখ ঝুলে বেরিয়ে আসে। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, অপারেশন হয়, আপাত কঠোর মনের ক্লার্কওয়েল প্রায় রোজ ছেলেটিকে দেখতে যেতেন, যেতেন মেমসাহেব, নারাণবাবু। ছাত্রঅন্তপ্রাণ এঁদের।

> একদিন বিকালে হেডমাস্টারকে দেখিয়া ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখনও তাহার বাড়ি হইতে লোকজন আসে নাই। সাহেব গিয়া বসিয়া বলিলেন, ডোন্ট্ ইউ ক্রাই মাই চাইল্ড্- দেয়ার ইজ এ লিট্ল্ ডিয়ার- বি এ হিরো- এ লিট্ল্ হিরো।
>
> মুশকিল এই যে সাহেব বাংলা বলিতে পারেন না ভাল, ছোট ছেলে তাঁহার ইংরেজি বুঝিতে পারে না। মুখে কথা বলিতে বলিতে হেডমাস্টার বিপন্ন মুখে ছেলেটির মাথাও ও পিঠে সান্ত্বনাসূচকভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন; কান্না করে না, কান্না লজ্জার কঠা আছে- ইট্ ইজ এ শেম্, বয়, টু ক্রাই, বুঝেছ? ভাল বালক আছে, সারিয়া যাইবে। কিচ্ছু হইবে না-
>
> এমন সময় ছেলের মা ও বাড়ির মেয়েদের আসিতে দেখিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, টোমার মা সামনে কান্না করে না। দেয়ার ইজ এ গুড বয়- আমার স্কুলের বালক কাঁদিবে না- আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেস্টিজ অফ ইওর স্কুল- আই ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড-
>
> ছেলেটি খানিকটা বুঝিল, খানিকটা বুঝিল না; কিন্তু সে কান্না বন্ধ করিল, আর কখনও কাহারও সামনে কাঁদে নাই। এমন কি, মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভয় কি দুর্বলতাসূচক একটি কথাও তাহার মুখে কেহ শোনে নাই।[১৩]

শঙ্খ ঘোষ একটি সাক্ষাৎকারে এই মৃত্যুটি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির স্মৃতিচারণ করেছেন :

> ক্লার্কওয়েলকে নানা বিরূপ চিহ্নে ধরা আছে উপন্যাসে, ক্ষয়ে-আসা ব্রিটিশ রাজত্বের একটা উপমান হিসেবে তাঁকে চেনাও যায়, কিন্তু সেসবের চেয়ে আমার অনেক বেশি মনে থেকে গেছে চোখে আঘাত লাগা সেই মরণোন্মুখ ছেলেটির কথা, ক্লার্কওয়েল যাকে বলেছিলেন, 'কান্না করেনা, কান্না লজ্জার কঠা আছে... আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেস্টিজ অব ইয়োর স্কুল...'। একথা শোনার পর ছেলেটিও বন্ধ করল কান্না, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার মুখে কোনো ভয়সূচক বা দুর্বলতাসূচক কথা কেউ আর শোনেনি। ছাত্র আর শিক্ষকের মিলিত এই ঘটনাটা গোটা স্কুলকেই উজ্জ্বল করে তুলত, বাবার কথা মনে পড়ত আমার।[১৪]

এই নামহীন কিশোরের মৃত্যু পাঠকের মনে অদ্ভুত ধাক্কা দিয়ে যায়। এবং এই মৃত্যু'র আলোতে ক্লার্কওয়েল সাহেব হৃদয়ের কিছুটা কাছাকাছি চলে আসেন।

এ স্কুলের মাস্টারমশাই নারাণবাবুর সাতকূলে কেউ নেই, ইস্কুলে থাকেন। একটি ছাত্র, নাম তার চুনি, তার প্রতি তাঁর মায়া প্রবল। নিঃসন্তান নারাণবাবু কল্পনা করতে ভালোবাসেন, একদিন চুনি বিবাহ করে তার বউ নিয়ে আসবে। রূপবান ছেলের লক্ষ্মী-প্রতিমার মতন বধূ। কক্ষনও না হতে পারা বাবার মতন, এক বুক স্নেহ নিয়ে বসে থাকেন ক্ষেত্রবাবু। তাঁর শেষ বয়সে এই তাঁর পুত্রসম চুনি আর তার স্ত্রী'ই তো তাকে দেখবে, এই সামান্য ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে মনে!

সেই চুনি তাঁকে বলা-বাহুল্য কখনও পিতার আসনে বসায় নি। জীবনে তাঁর কত ছাত্রের যাওয়া-আসা হয়েছে। জীবন-সায়াহ্নে সেসব আনন্দময় মুখগুলিই মনে পড়ে। নারাণবাবু বুঝেছিলেন জীবনের পথ বহু পথিকের আসা-যাওয়ার পদচিহ্নে ভরা, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

> আজ মনে এত আনন্দ কেন?
>
> কী অপূর্ব আনন্দ, একটা তরুণ মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। অনুকূলবাবু বলিতেন, দেখ নারাণ, একটা বেলগাছে বছরে কত বেল হয় দেখেচ? একটা বেলের মধ্যে কত বিচি থাকে, প্রত্যেক বিচিটি থেকে এক হাজার মহীরুহ জন্মাতে পারে। কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের ষাট-সত্তর বৎসরব্যাপী জীবনে অত বিচি থেকে গাছ জন্মায় না- অন্তত দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়, আবার বহু বেল ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পুষ্টির ইঞ্জিনীয়ারিং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা। স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয়? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো-একটা মানুষ বার হলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক। এই ভেবেই আনন্দ পাই নারাণ। প্রত্যেক শিক্ষক, যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য- এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ। দেশের সেবায় সব চেয়ে বড় অর্ঘ্য তাঁরা যোগান-মানুষ।[১৫]

অনেক দিন আগে অনুকূল বাবু আর নারাণবাবু মিলে বহু কষ্টে এই ইস্কুল দাঁড় করান, ক্লার্কওয়েল সাহেব তখন ছিল না। দেশের জন্য কিছু সজীব নির্ভিক প্রাণ কে নির্মাণ করার জন্যই এই দুই শিক্ষাব্রতী ঝাঁপিয়েছিলেন স্কুল নির্মাণের কাজে। অনুকূল বাবু মারা যান, কত স্বপন ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তবু নারাণবাবু হাল ছাড়েননি, প্রকৃত শিক্ষক তিনি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। যদুবাবুর মতন লোভী, হীন, আদর্শচ্যুত নন তিনি। অ্যাস্ট্রনমি নিয়ে আকর্ষণ নারাণবাবুর।

কখনও কখনও লেখক নানান ছোট ঈঙ্গিতে কোনও চরিত্রের মৃত্যু'র জমি প্রস্তুত করেন। যে রাত্রে হঠাৎই জীবনের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরে অকারণ আনন্দে ভরে

গিয়েছিল হারাণবাবুর মন, সেই রাত্রি থেকেই তাঁর জ্বর আসে। জ্বরের ঘোরে ভয়ানক পিপাসা পায়, জ্বরের ঘোরে শুধু চুনির মুখ মনে পড়ে, একা শুয়ে যাবার বেলাটিতে এই ইচ্ছেই হয় যে এত ছাত্র আছে, চুনি আছে, কেউ তাঁর শিয়রে বসে সেবা করুক। সারাজীবন এঁরা কেবলমাত্র অপরের জন্য করে গিয়েছেন, কারুর হাতের সেবা পাননি কখনও। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখতে এসে স্কুলের মাস্টাররা যখন খবরের কাগজে বেরোন খুনের সংবাদ শুনিয়ে যান, নারাণবাবুর বারেবারে মনে হয় মানুষ কী করে খুন করতে পারে। মৃত্যুর দিনকয়েক আগে, কোনকালে কয়েকটা ডেয়ো-পিঁপড়ে মারবার স্মৃতি তাঁকে মনে মনে ব্যথিত করে তোলে। জীবহত্যা করবার দুঃখ অভিমানে নিজেকে নীচ বলে মনে হয় খুব। "কী জানি, মানুষকে বিচার করার ভার মানুষের উপর নাই। তিনি যে খুনী নহেন, তাহা কে বলিবে?"

শুয়ে শুয়ে বারেবারে তাঁর মনে আসত শৈশবে ফেলে আসা গ্রামের স্মৃতি। আজ আর সেই গ্রামে নিজের বলতে কেউ বেঁচে নেই। অসুস্থ শরীরে নিঃসঙ্গ মাস্টারমশাই দিনের পর দিন তৃষিত হয়ে অপেক্ষা করেন কবে প্রিয়তম ছাত্রটি দেখতে আসবে। সেই গভীর স্নেহের প্রতিদান দিতে কেউ আসেনি তাঁর জ্ঞান থাকা পর্যন্ত।

চুনি যখন দেখতে আসে, নারাণবাবু আর তাকে চিনতে পারেননি। লোকে বলেছিল তাঁর জ্ঞান নেই। সেকথা আসলে ঠিক নয়। তিনি তখন ছেলেবেলা ফেলে আসা তারজোল গ্রামের মাঠে, বনে, দামোদরের বাঁধে বাল্যসঙ্গী, বহু বছর আগে মৃত ছুনু আর গদাই নাপিতের সঙ্গে খেলা করতে ব্যস্ত ছিলেন। মৃত্যুমুহূর্তের সেই ছেলেখেলার আনন্দযজ্ঞ থেকে তাঁর আদরের চুনির ডাকও তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি।

ঠিক এমন মৃত্যু হয় 'ইছামতী' উপন্যাসের নীলকর সাহেব লর্ড শিপটনের। সে প্রসঙ্গে আসতে হবে কিছু পরে।

কলকাতার জীবনে অভাব আছে, আছে অপমান, উঞ্ছবৃত্তির জীবিকা। কিন্তু ক্লার্ক ওয়েলের স্কুলের মাস্টাররা এই দাসত্বকে মেনে নিয়েছিলেন। তাকে আস্থা করতেও শুরু করেন। তার চেয়ে ভাল কোন বিকল্প ওঁদের সামনে ছিল না। অতি সংকীর্ণ গৃহস্থালীতে, অথবা মেসের জীবনে, বাড়ি বাড়ি ছাত্র পড়িয়ে ক্লান্ত দেহে ও মনে বাড়ি ফেরায়, ক্লার্কওয়েলের খোলা দরজার হুমকিতে, তাঁর নিয়মানুবর্তিতার নিগড়ে, চা এর দোকানের গতানুগতিক আলাপে জীবনের যে একটি ছক তৈরি হয়েছিল, তার উপরে যে আরও কোনও বিশৃঙ্খল অরাজকতার প্রচন্ড আঘাত এসে পড়তে পারে, তা তাঁদের কল্পনার

বাইরে ছিল। তাদের জীবন-জীবিকার আখ্যান তো চেনা-জানা চির পরিচিত দুঃখ-কষ্টের, অপমান-লাঞ্ছনার অনুবর্তনেই চলবে, কিন্তু লেখকের সামনে ছিল সেই শৃঙ্খলা ভাঙার চ্যালঞ্জ। তাই এই নায়কবিহীন উপন্যাসে, চল্লিশের গোড়ার দিকের অশান্ত আলোহীন কলকাতা হয়ে ওঠে প্রধান প্রতিনায়ক। জাপানি বোমা পড়বার গুজব ছড়ায়, আর একে একে সব জীবিতদের গ্রাস করে মৃত্যুভয়। যে কোনও মুহূর্তেই আসতে পারে সেই অজানা মৃত্যু। বিভূতিভূষণের আর কোনও উপন্যাসে এভাবে মৃত্যুভয় মৃত্যুর পথরোধ করে দাঁড়ায়নি। বোমা ফেটে মরতে হতে পারে যে কোনও মুহূর্তে, তখন ডেডবডি সনাক্তকরণের পদ্ধতি... সেই সুপরিচিত শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বস্তির রাত কখন পালটে বিভীষিকা হয়ে যায়।

যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু... কেউ সেই ভয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা পান না।

এমন অরাজকতা কখনও ক্লার্কওয়েলের রাজ্যে ছিল না। এই কলকাতায় দশটাকা ভাড়ার বাসাবাড়িতে যদুবাবু থেকেছেন। স্কুলের সামান্য বেতনে আর দু'টাকার টিউশনিতে কোনরকমে দিন কেটেছে। অতি তুচ্ছ খাদ্য, অক্লান্ত পরিশ্রম, ছাত্র পড়াতে ছুটেছেন। এই শহরেই ক্লার্কওয়েল দিনের পর দিন যদুবাবুকে খোলা দরজার হুমকি দিয়েছেন। ছাত্র ধর্মঘটের দিন ছেলেরা ক্লাস করতে এলে তাদের পালাতে উস্কানি দিয়েছেন। অভিভাবকরা যদুবাবু'র ফাঁকিবাজির অভিযোগ করেছেন, অভিযোগ এসেছে তিনি ক্লাসে পড়ান না। ছাত্রদের টিফিনের ডাল-রুটিতে যদুবাবু চুরি করে ভাগ বসিয়েছেন। ছাত্রদের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গিয়ে তাদের টিফিনের টাকায় গ্লোব রেস্টুরেন্টে ভালোমন্দ খেয়েছেন। ছাত্রদের সেরেছেন রুটি মাখন খাইয়ে। ছাত্র প্রজ্ঞাব্রতকে নিঃসন্তান যদুবাবু ভালোবাসতেন। তাকেও ডেকে খাইয়েছেন। কিন্তু সে ছাত্র যদুবাবুর একটি দিনের ভালোমন্দ খাবার গল্প ইস্কুলে বলে দিয়েছে, যদিও এইটি বলেনি যে তিনি তাকেও খাইয়েছিলেন। যদুবাবু এমন ই। তিনি বাড়িওলার ভাড়া ফাঁকি দেন। পুজোর ছুটির আগে বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে রেষারেষি বাঁধিয়ে সব ক্লাসের ছাত্রদের থেকে ভাল ভোজ আদায় করতে চান। প্রতারণা করে স্ত্রীকে জ্ঞাতির বাড়ি ফেলে রাখেন মাসের পর মাস। চিঠিতে মিথ্যা কথা লেখেন। যদুবাবুর এই দীর্ঘদিন ধরে লালন করা দৈনন্দিন দীনতায়, প্রতারণায়, ফাঁকিতে, অপমানে তুচ্ছ লোভে, অসহায়তায় এতদিন যে নিয়ম ছিল; এই অযাচিত মৃত্যুভয় সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। সারারাত ধরে যদুবাবু গাড়িঘোড়ার শব্দ শোনেন। কলকাতা ছেড়ে মানুষ পালানোর শব্দ।

এই কলকাতা শহরেই অবসরপ্রাপ্ত স্কুলমাস্টার আর বিফল নোটবই লেখক রাখালবাবুর দুর্দশা দেখে, সম্ভবত নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই শিউরে ওঠেন ক্ষেত্রবাবু।

কিন্তু এইসব কলকাতা থেকে পালানো মানুষগুলো যায় কোথায়! কলকাতার অতি নিকৃষ্ট জীবনেরও কোনও বিকল্প যাদের ছিল না, কী হল তাদের জাপানি বোমার ত্রাসে! যাদের গ্রামে ঘরবাড়ি আছে তারা গ্রামেই চলে গিয়েছিল। আসসিঙড়ি গ্রামে চলে যাব ক্ষেত্রবাবু। আর যদুবাবু যেদিন শেষপর্যন্ত কলকাতা ছাড়বার ট্রেনে উঠতে পেরেছিলেন, মনে হয়েছিল পুনর্জন্ম হল। জাপানি বোমা আর যাই হোক হুগলি অবদি পৌঁছোতে পারবে না। তবে 'পুনর্জন্ম'র মাসখানেক পরেই যদুবাবুকে ম্যালেরিয়ায় ধরে।

সেসময় ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের অবস্থাও সঙ্গীন।

> ১৯৪২-এর ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র খবর, 'জরুরি এলাকায় বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে খোলা যাইবে না।' যেসব শিক্ষক কলকাতার ক্ষীয়মান ছাত্রসংখ্যার ফলে জীবিকা হারাতে বসেছেন, তাঁদের জন্য ১৯৪২-এর ১৫ জানুয়ারির নিখিল-বঙ্গ শিক্ষকসমিতির সম্মেলনে চার রকম সুপারিশ করা হয়। মফঃস্বলে বর্ধিত ছাত্রসংখ্যার চাহিদা মেটাতে যে নতুন স্কুল হবে, সেখানে তাঁদের কাজ দিতে হবে; যাঁরা এ.আর.পি-তেঢুকতেরাজি, তাঁদেরবেতনদিয়েএ.আর.পি-র কাজে নিযুক্ত করতে হবে। সরকারি সাহায্যে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া এবং বিদ্যালয়ের অর্থভাণ্ডার থেকে তাঁদের ধার দেওয়ার সুপারিশও ছিল (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৪২)। ৪ ফেব্রুয়ারি দ্বারভাঙা হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যে সমাবেশ হয়, সেখানে প্রশ্ন ওঠে, কী করে চলবে সেইসব টিচারদের, যাদের স্কুলে জানুয়ারি থেকেই বেতন বন্ধ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)। সরকার অবিলম্বে প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়মাবলী পরিবর্তন করুন, প্রভিডেন্ট অর্থের সম্পূর্ণ টাই দিয়ে দিন শিক্ষকদের। এই ছিল ৪ ফেব্রুয়ারির সম্মেলনের দাবি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২)।[১৬]

এইসব খবর কি আসসিঙড়ি'র মতন গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল? মডার্ন ইনস্টিটিউশনের মাস্টাররা, জানুয়ারি তো দূরে থাক, গত বছর নভেম্বর মাস থেকেই কোন বেতন পাননি। সেই স্কুলের টাকাই বা কোথায় যে মাস্টাররা ধার পাবেন! ক্ষেত্রবাবুর দ্বিতীয় স্ত্রী অনিলা বাপের বাড়ি থেকে সামান্য যা কিছু আনে তা ফুরিয়ে যায়। তারপরেও বহুদিন স্কুল খোলে না, ক্লার্কওয়েল তখন নাগপুরে। ভৃত্য কেবলরামের থেকে দু-একজন সহকর্মীর আর সাহেবের খবর নিলেন ক্ষেত্রবাবু। পাঁচ মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়বার খবরও পান। বাড়িওলা কয়েকমাস দেখে, ইস্কুল না খুললে, দরজায় ঝুলিয়ে

দেবে 'টু লেট'- এর নোটিস। সেই যে মহান শিক্ষাব্রতী ক্লার্কওয়েল সাহেব, এই বিপদের দিনে তার খবর আর কেউ রাখেনা। সেই পুরনো চা এর আড্ডায় গিয়ে ক্ষেত্রবাবু বলে আসেন, তার সহকর্মী কেউ এলে যেন বলে দেওয়া হয় যে তিনি তাদের ভোলেন নি।

কমলাপুরে যদুবাবুর সংসারে কষ্টের সীমা নেই। বোমা পড়া, মৃত্যুভয়ে যদুবাবু প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার খোঁজ পর্যন্ত নিতে পারেন না। কিচ্ছু কমে না যদুবাবুর জীবনে, না অভাব, না শারীরিক কষ্ট, না মৃত্যুভয়। তাঁর স্ত্রী সামান্যতম গহনা বিক্রি করে সংসার চালান, ওষুধপথ্যের জোগাড় করেন।

কলকাতায় থাকাকালে, বহুকালের পরিচিত চা এর দোকানটিতে বসে যদুবাবুর মনে হয়, মিউনিসিপ্যালিটির কসাইখানায় বসে রয়েছেন তিনি, চারিধারে গরু'র পরিবর্তে মানুষের কাটা হাত পা, শবের উপরে শব জমা হয়ে চলেছে, উগ্র কর্ডাইটের গন্ধ, মৃত্যু, আর্তনাদ। কমলাপুর হয়ে ফের জ্ঞাতিভ্রাতা'র বাড়ি বেড়াবেড়ি, রাতে তুচ্ছ গুবরে পোকার ডাকে ভয় পেতেন যদুবাবু। বেড়াবেড়ি গ্রামে রোগশয্যায় শুয়ে ভয় লাগে তাঁর। নারকেল গাছে ঠায় বসে থাকা গিরগিটিটাকে দেখতে দেখতে। মনে হয় ও যদি ওখান থেকে সরে তবে ওঁর শরীরও সারবে। তাড়ানোর পরে ফের দেখেন গিরগিটি একই জায়গায় বসে। মৃত্যু'র আগে তাঁর তীব্র মৃত্যুভয়ের প্রতীক হয়ে আসে একটা গিরগিটি। যদুবাবুর 'পুনর্জন্মে' কি তবে মুক্তি নেই? বিভূতিভূষণের সাহিত্যের পরিচিত শৃঙ্খলাবোধ তবে কি আসবে না এইসব নিরীহ মাস্টারদের জীবনে!

চারিদিকে নিশ্ছিদ্র আঁধার, শহরে-গ্রামে, অলিতে-গলিতে, মানুষের মনের ভিতরে-বাইরে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে এদের চিরকালের অভ্যাস। মনের ভিতরে গেঁথে দিয়েছে এক মর্মান্তিক অনিশ্চয়তা। এই নির্মম ভাঙনই কি অনুবর্তনের শেষ! এই উপন্যাস কি বিভূতিভূষণের পরিচিত ধরণের এক নির্মম ব্যতিক্রম?

লেস্‌লি স্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণ চাটুজ্যে এই বিশ্বাস নিয়ে মরতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ সরকারের রাজ্যে বাইরের শত্রুর ভয় নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলকাতা তাঁকে দেখতে হয়নি। এই আমৃত্যু কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষককে বিভূতিভূষণ যুদ্ধ না দেখার শান্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ পেরিয়ে যদি কোনও মুক্তি থাকে তার জন্য বেছে নিয়েছিলেন ফাঁকিবাজ মাস্টার যদুবাবুকে।

১৯৪২ সালে যদুবাবু বেড়াবেড়ি গ্রামে রোগশয্যায় শুয়ে ভেবেছিলেন আবার তিনি কলকাতা দেখবেন, জাপানিরা চলে যাবে, আবার আসবে সাহেবের সেই শৃঙ্খলার প্রাচীর।

তারই অল্প কিছুদিন পরে স্কুল খোলে, ক্লাসে ক্লাসে কয়েকজন করে ছাত্র, স্কুল ভরা অনিশ্চয়তা। তারই মধ্যে ক্লাসে ক্লাসে ফেরে সাহেবের সারকুলার বই,

> স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুজ্জ্যের পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধ রহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে উনিস বৎসর এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলে যে অপরিসীম ক্ষতি হইল... ইত্যাদি ইত্যাদি[১৭]

এই 'ইত্যাদি ইত্যাদি' শব্দদ্বয়ের মধ্যে লেখকের একই সঙ্গে যে বিদ্রুপ এবং বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে, তা লক্ষ করেছেন বিভূতিভূষণের জীবনীকার রুশতী সেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে---

> নিয়মানুবর্তিতার পরাকাষ্ঠা এই সাহেবের খোলা দরজার হুমকির সবচেয়ে নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন যদুবাবু। আজ যখন সেই ফাঁকিবাজ লোভী মাস্টারের গুণকীর্তন সাহেবের সারকুলার বইতে লিপিবদ্ধ হয়, তখন, লেখক তার অনিবার্য অসংগতিকে পরম মমতায় এবং নির্মম কৌতূকে বুঝতে এবং বোঝাতে চান। ঠিক সেইকারণেই উপন্যাসের অন্তিমে 'ইত্যাদি ইত্যাদি' শব্দ দুটি আশ্চর্য অর্থ পেয়ে যায়।[১৮]

সারাজীবনের লোভী, সুবিধাবাদী, নিঃসন্তান, অতি দীন, অসহায় মাস্টারমশাই যদুবাবুর কী মনে হয়েছিল মৃত্যুর আগের সময়টুকুতে? নারাণবাবুর মতন সৎ জীবনযাপন তিনি করেননি। তাঁর মতন মৃত্যু'র সময়ে ঘোরের মধ্যে চলে যাননি তিনি। নারাণবাবু যেসময় শৈশবের দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিলেন মনে মনে, সেসময় যদুবাবু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছিলেন ঈশ্বরের কাছে। সারাজীবনে কখনও তিনি ভগবানের কথা ভাবেননি। কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে তাঁর উপস্থিতি তিনি টের পান। তাঁর আনন্দময় ব্যাপ্তি অনুভব করেন মনে মনে, যেন স্ত্রী'র সঙ্গে পরিস্থিতিতে পড়ে করা প্রতারণার জন্য, একা ফেলে বহুদূর চলে যাবার সময় হয়ে আসবার পরে কিছুটা স্বস্তি পান। আর সারাজীবন যে ধরে করে আসা অতি নগণ্য সব অপরাধের জন্য কুণ্ঠিত হন। নিঃসন্তান মাস্টার ভাবেন তাঁর কৃতকর্মের দায় তাঁর সারাজীবনের স্নেহের ছাত্র'রা নিজের কাঁধে তুলে নেবে ভালোবেসে। পরপারের দরবারে তারাই সাক্ষ্য দেবে।

চুরি করে খাবার খাওয়া, টাকার জন্য মানুষকে টুকরো টাকরা মিথ্যে বলা, স্ত্রী'কে দিনের পর দিন আত্মীয়ের ঘরে ফেলে রাখা, এর বেশি কিচ্ছু করবার দৌড় নেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত যদুবাবুর।

> দুই-একটা অন্যায় কাজ, দুই-একটা-চুরি ঠিক বলা যায় না- চুরি নয়, তবে হাঁ, একটু আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন, এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান গরিব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।[১৯]

মৃত্যুর নিকটে এসে যদুবাবু নিজের ভুলটুকু স্বীকার করে নেন নিজের কাছে এটুকু লেখকের উদারতা।

তবুও, নানান উপন্যাসের সিঁড়ি পেরিয়ে 'অনুবর্তন' এ পৌঁছে লেখক যেন দেশকাল, সমাজ-সংসারের সেই কঠিন অসংগতিকেই দেখবেন আর দেখাবেন ঠিক করেন। তাই এই নায়ক-নায়িকবিহীন উপন্যাস দীন-হীন-তুচ্ছ জীবনের মর্মান্তিক বিন্যাসে হয়ে রইল বিভূতিভূষণের সাহিত্যের মর্মান্তিক ব্যতিক্রম।

গ. 'ইছামতী'-তে মৃত্যু :

বারোশো সত্তর সালের নীলকর শাসিত বাংলার পটভূমিকে কেন্দ্রে রেখে শুরু হয় যে উপন্যাস, তার নাম 'ইছামতী'। উপন্যাসে কেন্দ্রে থাকা চরিত্র ভবানীর অপু'র সঙ্গে মিল ছিল তাঁর অল্পবয়সে। ভবঘুর জীবন দীর্ঘদিন কাটিয়ে শেষপর্যন্ত যখন সংসারে এসে ধরা দিলেন, একেবারে তিনজনকে বিয়ে করলেন একসঙ্গে। কুলীন স্বামীর স্ত্রী'দের অবস্থা তো ইন্দির দিব্যি মনে করিয়ে দেন, কুলীন কন্যাদের দুর্ভাগ্যজনক জীবনের উদাহরণ এই তিন বোন তিলু-বিলু-নীলু, যাদের একইসঙ্গে ভবানী বিবাহ করেন, কিছুটা তিনজনকে সামাজিক অবহেলা অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচাতেই। ঘটনাচক্রে তাঁদের চারজনের বিবাহিত জীবন সুখেরই ছিল, অন্তত আপাতভাবে। তিনবোনের দাদা রাজারাম রায় ছিলেন মোল্লাহাটির নীলকুঠির চূড়ান্ত প্রভাবশালী দেওয়ান, যাঁর প্রভাবের মাত্রা কখনও কখনও নীলকর সাহেবদের প্রভাবকেও ছাপিয়ে যেতে দ্বিধা করত না।

দীর্ঘ উপন্যাসে মূল চরিত্রের জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেই এসেছি আরও নানান চরিত্রকে কেন্দ্র করে নানান আবর্তন। কাহিনি বর্ণনা লেখাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে, সরাসরিভাবে তাই এসে পড়া যাক মৃত্যুপ্রসঙ্গে। উল্লেখ্য এই যে, আগে আলোচ্য দৃষ্টিপ্রদীপ বা অনুবর্তনের মতন মৃত্যু এখানে কাহিনির সেইভাবে মধ্যে কোনও

নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়নি। অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র'র মৃত্যু ঘটনার গতিবিধি কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তাকে ঠিক অনিবার্য বলা যায় না। তবু উপন্যাসে নানান সময়ে ঘটে যাওয়া চারটি মৃত্যু পাঠকদের মনে প্রভাব ফেলে যায়। ভবানীর মেজ স্ত্রী বিলু, ভবানীর শ্যালক-দেওয়ান রাজারাম রায়, তাঁর স্ত্রী এবং নীলকুঠির বড় সাহেব লর্ড শিপটন। এছাড়া নীলকুঠি এলাকায় সাহেব-দেওয়ানদের যৌথ প্ররোচনায় নানানরকম খুনের ঘটনা ঘটেই থাকে এলাকায়।

সাধারণ ভাবে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মৃত্যু সম্পর্কিত আলোচনায় খুন বা যে কোনও দুর্ঘটনা বা অস্বাভাবিক মৃত্যুকে বাদ রাখা হয়েছে। কিন্তু রাজারামের মৃত্যু খুন হলেও তা উল্লেখ করা প্রয়োজন এই উপন্যাসের দিক থেকে।

সারাজীবন পেশায় নীলকুঠির জাঁদরেল, সুবিধাবাদী, কিঞ্চিৎ অসৎ, অত্যাচারী দেওয়ান হলেও বাড়ী ফিরে রাজারাম চিরকাল আপাদমস্তক মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক। এই চরিত্র বৈশিষ্ট তিনি লালন করেছেন, পেশাকে মিলে যেতে দেননি পরিবারের সঙ্গে। যদিও কর্মক্ষেত্রের গুরুত্ব তাঁর জীবনে ছিল সর্বোচ্চ, তবু পারিবারিক কর্তব্যকে অবহেলা করেননি কখনও। সেসময়কার বাংলার গ্রাম-সমাজে চন্ডীমন্ডপের আড্ডার প্রতিপত্তি, গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য। ধনী রাজারামও এইখানে প্রায় নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার দায়িত্বে অবহেলা করেননি। দ্বিতীয়ত, এই আড্ডার প্রভাবশালী কর্ণধার চন্দ্র চাটুজ্যে ছিলেন রাজারামের বোনেদের একমাত্র স্বামী'র মামা। এই সুসম্পর্ক বজায় রাখবার দায় ছিল উভয়পাক্ষিক। রাজারাম রায় ছিলেন সমাজের কর্তাদেরই একজন, তবে তাঁর সব কাজের খোঁজ তিনি ছাড়া তাঁর স্ত্রী জগদম্বা পর্যন্ত জানতেন না। অতি সচেতন গোপনীয়তা বজায় রেখে তাঁর মাধ্যমে ঘটে যেত দুর্ধর্ষ সব ক্রাইম।

যে রামকানাই কবিরাজকে একসময় মিথ্যা সাক্ষী না দেওয়াতে পেরে রাজারাম চুনের গুদামে ফেলে রেখে যাঁর উপর তীব্র শারীরিক অত্যাচার করেন, সেই কবিরাজই রাজারামের মৃত্যুর আগে সতর্ক করে দিতে যান। চিরকালের বেপরোয়া রাজারাম বৃদ্ধের কথা মানেননি। ষষ্ঠীতলার মাঠে ঘোড়া পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের বিপদ ঘনিয়ে আসে। কানসোনার বাগ্‌দিদের হাতে খুন হন রাজারাম রায়।

> তাঁর মাথায় একটা লাঠির ঘা লাগলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। আবার তাঁর বাঁ দিকের পাঁজরে খুব ঠান্ডা তীক্ষ্ণ স্পর্শ অনুভূত হল। কি হচ্ছে তাঁর? এত জল কোথা থেকে আসচে? কে একজন যেন বললে- শালা, রামুর কথা মনে পড়ে?

> রাজারাম হাত উঠিয়েচেন সামনের একজন লোকের লাঠি আটকাবার জন্যে। এত লোকের লাঠি তিনি ঠেকাবেন কি করে? এত জল এল কোথা থেকে? অতি অল্পক্ষণের জন্য একবার চেয়ে দেখলেন নিজের কাপড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রাজারামের যেন বমির ভাব হল। খুব জ্বর হোলে যেমন মাথা ঘোরে, দেহ দুর্বল হয়ে বমির ভাব হয়, তেমনি। পৃথিবীটা যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে...
>
> তিলুর সুন্দর খোকাটা দূ মাঠের ও প্রান্তে বসে যেন আনমনে হাসচে। কেমন হাসে! রাজারাম আর কিছু জানেন না। চোখ বুজে এল।[২০]

রাজারাম রায়ের মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেই দায়ী। তবুও তাঁর মৃত্যুর সময়টি ঠিক তেমন হয়না, যেমন হওয়া 'উচিত' কোনও অপরাধীর। কারা কীভাবে খুন করল তাঁকে, তা উপন্যাসের বাকিরা জানতে পারেন, কিন্তু তিনি কিছু জানেন না, আর জানেন পাঠক। বহু অপরাধে অপরাধী নিঃসন্তান রাজারাম শেষবেলায় তাঁর বোনের শিশুসন্তানটিকেই দেখতে পান। রাজারাম রায়ের পরিবারের আর কেউ এমন দুঃসাহসী পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, সবাই সাধারণ মধ্যবিত্ত, যারা পরিবার-সন্তান নিয়ে পৃথিবীর এক কোণে নিজের মতন করে সুখ খুঁজে নেন। সেই সহজ জীবনের ভালোটুকুই রাজারামের মৃত্যু-মুহূর্তকে আলোকিত করে তোলে। আর জীবনভোর অপরাধী রাজারামের প্রতি পাঠকের মনে একটু সহানুভূতি থেকে যায়। এই সেই বিভূতিভূষণসুলভ উদারতার প্রকাশ।

স্বামীর মৃত্যুর পরে রাজারামের স্ত্রী জগদম্বা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে চাইলে তাঁকে সকলে সাময়িকভাবে থামাতে পারলেও তারই অল্পদিন পরে মাত্র তিনদিনের জ্বরে জগদম্বা মারা যান। সারাজীবন স্বামীর প্রতিপত্তি দেখেছেন, তাঁর চিরকালীন নীরবতা জগদম্বাকেও সারাজীবনের মতন থমকে দেয়।

কুলীন কন্যাদের উদ্ধার করবার দায় ছিল ভবানীর উপরে। অবিবাহিতা তিন বোনকে রক্ষা করতে, কার্যত কিছুটা জনহিতকর কাজ করবার প্রকল্প নিয়ে একইসঙ্গে তিলু, নীলু, বিলুকে বিবাহ করেন ভবানী। বিবাহ তিনজনকেই করলেও স্বাভাবিক মানবিক গুণসম্পন্ন ভবানী চিরজীবন ভালোবেসেছেন স্ত্রী তিলু'কে। বাকি দুজন তারই ছায়ামাত্র হয়ে থেকেছেন। কর্তব্যের কোনও খামতি তাদের প্রতি ভবানী রাখেননি। কিন্তু তিনজনকে সমান ভালবাসা দেওয়ার মতন কোনও অতিমানবিক ক্ষমতা তাঁর ছিলনা। এই ভালোবাসার তারতম্য খুব স্বাভাবিক কিছু পক্ষপাতিত্ব ডেকে আনত, যদিও সেই তারতম্যের দিকগুলিকে তিন আশ্চর্য সহিষ্ণু বোন কখনও তুলে ধরেননি।

রাজারামের মৃত্যুর কিছুদিন পরে সামান্য অসুখে বিলু চলে যায়! তবে বিদায়বেলাটিতে সেই সরল, আমৃত্যু পরিস্থিতির হাতে বঞ্চিত গৃহবধূটির কী মনে হয়, তা অতি স্বাভাবিক কিন্তু লেখকের অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গিতে চরম যন্ত্রণার দলিল হয়ে থাকে। এ কথা অনস্বীকার্য যে ভবানীর বাকি দুই স্ত্রী'র তুলনায় বিলু ছিল সবচাইতে ম্লান, বোকা, কাহিনির সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় চরিত্রটি, তার মৃত্যুতে তার কাছের মানুষদের কষ্ট হলেও কাহিনির একচুল হেরফের হয়না কোথাও, উপন্যাসে এমন একটি কাজও সে করেনা, যার জন্য পাঠক তাকে মনে রাখতে পারেন। তবুও চিরদুঃখী বিলুর, ভবানীর সঙ্গে শেষ ঘোর লাগা কথোপকথনটি বিভূতিভূষণ ভরিয়ে তোলেন এমন সকরুণ বেদনায়, যা তাঁর মহত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

তিন বোন কিছু বেশি বয়সে অতি সচ্চরিত্র, দেবতুল্য, সুদর্শন ভবানীকে বিবাহ করতে পেরে আপ্লুত হয়ে যান। স্বামীর বড়দির প্রতি দেওয়া অতিরিক্ত গুরুত্বে তারা কখনও ভবানীকে মজা করে টিটকিরি দিলেও সত্যি অভিযোগ একবারও করেনি। তবুও নীলু তার ছেলেমানুষি, বুদ্ধিদীপ্ত আচরণের মাধ্যমে ভবানীর কিছুটা নিকট হলেও বিলুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবার তেমন কোনও সুযোগই হয়নি। কেবল মৃত্যুর আগে একটি মাত্র রাত, সেই আসন্ন মৃত্যুর ঈঙ্গিত বহন করে বিলুকে ভবানীর কাছে আনেন। তারপরেই মৃত্যুর দিনটি, জ্ঞান ফিরে আসে বিদায়ের পূর্বে। কিচ্ছু চায় না বিলু ভবানীর কাছে, কোনও অভিযোগ নেই তার। কেবলমাত্র দিদি আর বোনের অবর্তমানে সে অতি গোপনে জানায়, সামনের জীবনেও সে ভবানীকেই পেতে চায়, তবে একান্তে, কেবল তার নিজের করে। এই কথাটি সে ভবানীকে বলে যায়। তিলুর খোকা এ জন্মে তার অতি আপন, কিন্তু পরের জন্মে সে বোধহয় নিজের জন্ম দেওয়া একটি খোকা চেয়ে যায়। মানুষের জীবনব্যাপী সব চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে, আপন করে পাবার ইচ্ছেটি বড় ভোগায়। সারাজীবনের প্রতীক্ষায় হয়তো কারুর সেই সামান্য সাধ পূরণ হয় না। বিলু তাদেরই দলে। এ যন্ত্রণা একদিকে যেমন একজন কুলীন কন্যার বিবাহ কেন্দ্রিক যন্ত্রণা, অপরদিকে দেশ-কাল নির্বিশেষে এ যন্ত্রণা চিরকালীন ও বটে। যতদিন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, ভালোবেসে তৃপ্তি পাবে না মন, ততদিনই এই না পাবার বোধ, এই যন্ত্রণার অতৃপ্তি তাকে বহন করে বেড়াতে হবে। এক অনন্ত বিরহের শরিক হয়ে থাকতে হবে ততদিন।

> বিলু নেই। গত আষাঢ় মাসের এক বৃষ্টিধারামুখর বাদলরাত্রে স্বামীর কোলে মাথা রেখে স্বামীর হাত দুটি ধরে তিন দিনের জ্বরবিকারে মারা গিয়েচে!

মৃত্যুর আগে গভীর রাত্রে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো- তুমি কে গো?

ভবানী মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে- আমি। কথা বোলো না। চুপটি করে শুয়ে থাকো, লক্ষ্মী-

-একটা কথা বলবো?

-কী?

-আমার উপর রাগ করনি? শোনো- কত কথা তোমায় বলি নাগর-

-কাঁদচ নাকি? ছিঃ, ও কি?

-খোকনকে আমার পাশে নিয়ে এসে শুইয়ে দ্যাও। দ্যাও না গো?

-আনচি, এই যাই- তিলু তো এই বসে ছিল, দুটো ভাত খেতে গেল এই উঠে- তুমি কথা বোলো না।

খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর ভবানীর মনে হল বিলুর কপাল বড় ঘামচে। এখন কপাল ঘামচে, তবে কি জ্বর ছেড়ে যাচ্চে? তিলু খেয়ে এলে রামকানাই কবিরাজের কাছে তিনি একবার যাবেন। খানিক পরে বিলু হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে বললে- ওগো, কাছে এসো না- আপনারে তুমি বলচি, আমার পাপ হবে? তা হোক্ বলি, আর বলতি পারবো না তো? তুমি আবার আমার হবে, সামনের জন্মে হবে?-

হয়ো, হয়ো- [২১]

এক অব্যক্ত না পাওয়ার সুতীব্র বেদনাবোধ বিলুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় অসময়ে, নিঃশব্দে।

আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের মৃত্যুর কথা বলবার থাকে এ উপন্যাস প্রসঙ্গে। যদিও 'অনুবর্তন' উপন্যাসের বহুদিনের মাস্টারমশাই নারাণবাবুর মৃত্যু দৃশ্যটিও কিছুটা এমনভাবেই সাজান বিভূতিভূষণ। তবুও পরিস্থিতি, কাহিনির বিন্যাস অনুসারে দুই ঘটনার বিস্তর ফারাক।

দোর্দন্ডপ্রতাপ নীলকর সাহেব শিপ্টনের মৃত্যু। মোল্লাহাটির কুঠিতে নির্দয় বিলাশবহুল সময় কাটিয়েছেন জীবনের দীর্ঘ সময়। এইসব নীলকর, যারা ভারতে এসে এখানকার দরিদ্র মানুষদের উপরে নির্দ্বিধায় অত্যাচার করেছেন, তাঁরা স্বদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সাধারণ জীবন কাটাতেন। শিপ্টন্ ও একসময়ে নিজের দেশে ছিলেন নিতান্ত

মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। সব আতিশয্যকে ছাপিয়ে ঘোর লাগা মৃত্যুপথে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর প্রায় বিগত জন্মের অতীতে। সাহেবের নাভিশ্বাস চোখে দেখা কষ্ট হচ্ছিল কর্মচারীদের, কিন্তু তিনি তা টের পাননি।

> কিন্তু শিপ্টন্ সাহেবের কষ্ট হয় নি। কেউ জানতো না সে তখন বহুদূরে স্বদেশের ওয়েস্টমোরল্যান্ডের অ্যাল্ডরি গ্রামের ওপরকার পার্বত্যপথ রাইনোজ পাস্ দিয়ে ওক্ আর এল্ম্ গাছের ছায়ায় তার দশ বছরের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চলেছিল খরগোশ শিকার করতে, কখনো বা পার্বত্য হ্রদ এল্টার-ওয়াটারের বিশাল বুকে নৌকোয় চড়ে বেড়াচ্ছিল, সঙ্গে ছিল তাদের গ্রেট ডেন কুকুরটা কিংবা কখনো মস্ত বড় পাইপ আর কার্প মাছ বঁড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তুলতে ব্যস্ত ছিল... আর সব সময়েই ওর কানে ভেসে আসছিল তাদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘন্টাধ্বনি, বহুদূর থেকে তুষার-শীতল হাওয়ায় পাতা ঝরা বীচ্ গাছের আন্দোলিত শাখা-প্রশাখার মধ্যে দিয়ে দিয়ে...[২২]

এই তিনটি প্রধান মৃত্যুকে লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায় 'ইছামতী' বিভূতিভূষণের প্রকৃতই বেশি বয়সের রচনা। এ তাঁর সে বয়সের উপন্যাস, যখন তাঁর সন্তান তারাদাস জন্মেছেন। ঠিক ই কারণেই তিনি ভবানীর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারেন না, যে নিষ্ঠুরতা তিনি অক্লেশে দেখিয়েছেন অপুর প্রতি। অপুর গতিময় জীবনের যাতে অবসান না হয়, কোনও পিছুটান ই যেন তার বাধা না হয়ে উঠতে পারে, তাই তাঁর যাত্রাপথ থেকে নির্দ্বিধায় তিনি সরিয়ে দেন একে একে সব প্রিয়জনদের, শেষপর্যন্ত অপর্ণাকেও সরে দাঁড়াতে হয় অপুর পথে ছেড়ে। পরিস্থিতি অপুকে এমন কঠিন, দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে যে সে অনায়াসেই শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে চলে যায় কোনও অতিদূর স্থানে, যেখান থেকে সে কখনও ফিরবেন কীনা সে নিজেই জানে না। ভবানীর ক্ষেত্রে তা হয়নি, ভবানী অল্পবয়সে ভবঘুরে থাকলেও বয়সে সে হয়ে দাঁড়ায় তিন স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্বপূর্ণ স্বামী। তাঁরও স্ত্রী মারা যান, কিন্তু সে তিলু নয়, সে নিলু, যে তাঁর জীবনে অপরিহার্য নয়। ভবানীকে এমন কিছু হারাতে হয়নি অপুর মতন, পিতা বিভূতিভূষণ অপুর প্রতি যত নির্মম হতে পেরেছিলেন, বাবা হবার পরে, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভবানীর প্রতি তেমন হতে পারেন না। ভবানী খোকার বাবা, হাজার বন্ধন আর পিছুটানে বাঁধা পড়ে যাওয়া এক আগাগোড়া সংসারী মানুষ। যে সেই বদ্ধতার মধ্যেই খোলা আকাশের তলায়, নক্ষত্রকে দেখে দেখে খুঁজে নিতে পারে মুক্তি। বিস্মিত হতে পারে তার শিশু খোকাটির মত।

মূলত তিনটি তিন রকমের মৃত্যু, যে মৃত্যুগুলিকে কোনওভাবে একসূত্রে গাঁথা যায়না, সে মৃত্যু এমন যা উপন্যাসের মধ্যে তেমন হেরফের ঘটায় না। কিন্তু তবুও সেই গ্রামের পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে যাচ্ছে, লোকের চিতার ছাই ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে, সেই প্রবাহ চলতেই থাকে। যে কত আশা করে কলাবাগান করেছিল উত্তর মাঠে, কত ছোটখাটো সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা চোখের জল মিশে আছে সেই ইছামতীর অনন্ত প্রবহমান ধারায়। কত সুন্দরি তরুণী বধূর পা এর চিহ্ন পড়েছে নদীর দু'ধারে, ঘাটের পথে, আবার কত প্রৌঢ়ার পা এর দাগ মিলিয়ে গিয়েছে। যে ব্যথা বেদনা একদিন চিরকালের মনে হয়েছিল, সময়ের স্রোতে কখন তারা মিলিয়ে হারিয়ে গিয়েছে।

> মৃত্যুকে কে চিনতে পারে, গরীয়সী মৃত্যুমাতাকে? পথপ্রদর্শক মায়ামৃগের মতো জীবনের পথে পথে দেখিয়ে নিয়ে চলে সে, অপূর্ব রহস্যভরা তার অবগুণ্ঠন কখনো খোলে শিশুর কাছে, কখনো বৃদ্ধের কাছে... তেলাকুচো ফুলের দুলুনিতে অনন্তের সে সুর কানে আসে... কানে আসে বনৌষধির কটুক্তি সুঘ্রাণে, প্রথম হেমন্তে বা শেষ শরতে। বর্ষার দিনে এই ইছামতীর কূলে কূলে ভরা ঢল ঢল রূপে সেই অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখতে পায় কেউ কেউ... কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐ সব মাঠ, ঐ সব ভিটের ঢিপি- কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো![২৩]

সময়ের প্রবহমানতায় মৃত্যু জীবনের চলমান ধারার ই একটি ধাপ মাত্র, একথা মানুষ, তার অতি অস্থায়ী জীবন নিয়ে মানতে চায়না হয়তো, কিন্তু আকাশের যে তারাটি দির্ঘদিন ধরে এই যাতায়াত পর্যবেক্ষণ করছে, তার কাছে এ নিত্যদিনের ঘটনা। এই নামহীন মানুষের মৃত্যুকে যত্নে বলেছে এই উপন্যাস। আলোচ্য অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এর অন্যতম তফাৎ এইখানে যে এই কাহিনির কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নেই, যেমনভাবে একটি ধরাবাঁধা গন্ডির মধ্যে ধরা যায়না মানুষের জীবনকে।

ঘ. 'অশনি-সংকেত'- এ মৃত্যু :

> ট্র্যাজেডি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল নেপোলিয়ন আর গ্যয়টে-র। নেপোলিয়ন বললেন, আধুনিক যুগে মানুষকে আর ভাগ্যের একান্ত অধীন বলে মানা হয় না, প্রাচীন নিয়তির স্থান নিয়েছে রাজনীতি, La politique est la fatlaite. ভাগ্যের আধুনিক রূপ হিসেবে ট্র্যাজেডিতে প্রয়োগ করতে হবে একেই- পরিস্থিতির অরোধ্য শক্তি, ব্যক্তিসত্তা যার কাছে নত হতে বাধ্য।

> কথাগুলো মনে পড়ে যায় 'অশনি-সংকেত' প্রসঙ্গে। সাম্রাজ্যর বাঁটোয়ারা নিয়ে লড়াই লাগল জার্মান আর ইংরেজে- তার ফলে, হাজার হাজার মাইল দূরে, মারা পড়ল বাংলার পঁয়ত্রিশ লাখ মানুষ। বোমা খেয়ে নয়, কিছুই না খেতে পেয়ে।[২৪]

মন্বন্তর, ক্ষুধার কাছে মানুষের সব মূল্যবোধ হারিয়ে যায় নিমেষে। আগেও বাংলায় ঘটে গিয়েছে এমন মন্বন্তর। কিন্তু ১৩৫০-এর মন্বন্তর ছিল এ সবের থেকে আলাদা। মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধের রসদ জোগাড় করে রাখতে হবে। দেশের সব ধান-চাল কিনে নিল ব্রিটিশ সরকার। বাংলার মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে তারা ভাবিত নয়। এ ঘটনা তীব্র ভাবে নাড়িয়ে দেয় বাংলার সব মানুষকেই প্রায়। কারণ এই দুর্ভিক্ষে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হন তারা, যারা এতদিন ফসল ফলিয়েছেন। কৃষকরাই মূলত সম্পূর্ণ অনাহারে, গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে মারা যান। সব মানুষের উপর কম-বেশি প্রভাব পড়লেও এদের মত ক্ষতিগ্রস্থ আর কেউ হননি। একদিনের সমৃদ্ধ কৃষক কয়েকটি দিনের মধ্যে পথের ভিখারীতে পরিণত হন এবং তারপরে অভুক্ত অবস্থায় ভয়াবহ মৃত্যু। সকলেই এই দুর্ভিক্ষর মুখোমুখি হয়ে কিছুটা প্রভাবিত, কুণ্ঠিত, লজ্জিত হলেও মজুতদারদের কোনও হেরফের হয়নি। যদিও মজুতদারদের মানুষ বলে ভুল করারও কোনও কারণ নেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে একটা ধারণা প্রচলিত, তা হল তিনি ভাববাদী সাহিত্যের স্রষ্টা। পরিচিত এই মতে যাঁরা চলতে চান, তাঁদের কাছে 'আশনি-সংকেত' একটা মূর্তিমান বাধা হয়ে এসে দাঁড়ায়। আমাদের পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছে বিগত শতাব্দীতে, যার সামনে জ্ঞানবুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে যায়। নাৎসী বন্দীশিবিরের বীভৎসতা, কিংবা হিরোশিমা নাগাসাকির কাহিনি। জার্মানি, পূর্ব ইওরোপ, জাপানের মত বাংলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও গণহত্যায় পিছিয়ে ছিল না। বিভূতিভূষণের অন্য সব উপন্যাসের নিরিখে সেইজন্য 'অশনি-সংকেত'কে মাপা অসম্ভব, এ এক অস্থির সময়ের দলিল।

মূল উপন্যাসের আলোচনায় আসা যাক। 'পথের পাঁচালী' শুরু হয়েছিল হরিহরের পূর্বপুরুষদের জীবনকথা দিয়ে। 'ইছামতী'তে বিভূতিভূষণ চেষ্টা করেছিলেন হরিহরেরও কয়েক পুরুষ আগের এক কুলীন ব্রাহ্মণ ও তার গ্রামের ছবি ধরে রাখতে। 'অশনি-সংকেত'-এ তেমন কোনও চালচিত্র নেই। তবু, মনে রাখা ভাল, গঙ্গাচরণ চক্রবর্তীও

এসেছেন একই ধরণের পরিবার থেকে। অপু যদি মনসাপোতায় থেকে যেত, পঞ্চাশের মন্বন্তরে তাকেও যে-অবস্থায় পড়তে হত- 'অশনি-সংকেত' তারই গল্প।

'ইছামতী'র ভবানী, 'পথের পাঁচালী'র হরিহর অথবা 'অশনি-সংকেত' এর গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী- তিনজনেই যশোরের কোনও দূর গ্রামের মানুষ। গঙ্গাচরণকেও হরিহরের মত জ্ঞাতিদের হাতে ঠকতে হয়েছে, তবু হরিহরের মত তার স্বপ্ন দেখার রোগ নেই। কবিয়াল হওয়ার শখ নেই। বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়লেও তিনি কাশী বা কলকাতা যাননি, গেছেন যশোরেরই অন্য গ্রামে। হরিহরের মত তার মনে কোনও ভাবগত পিছুটান ও ছিল না। হরিহরপুর ছেড়ে তিনি বেরোন বাঁচবার তাগিদে। তারই ধাক্কায় বাস করেন ভাতছালায়, বাসুদেবপুরে এবং শেষে কাপালীদের নতুন-গাঁয়ে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সুযোগসন্ধানী চরিত্র এই গঙ্গাচরণের। গঙ্গাচরণ বেছে বেছে এমন গ্রামেই বাস করেন যেখানে অন্য ব্রাহ্মণের বাস নেই। কারণ তাতে তার পসার বেশি হবে। তবে এও ঠিক যে সবই পেটের দায়ে, খেয়ে পড়ে একটু ভালো করে বেঁচে থাকাই তাদের লক্ষ্য, বড়লোক হওয়া নয়। এ উপন্যাসে গঙ্গাচরণের মতন আরও দুই চরিত্রকে পাওয়া যায়, তবে পার্থক্য এই যে তারা গঙ্গাচরণের মত করিতকর্মা নন। একজন হলেন বৃদ্ধ পুরোহিত দীনু ভট্চায আর লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিত দুর্গাপদ বাঁড়ুয্যে।

এমন সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগল। সরকার শুরু করল চাল মজুত করতে। অত্যন্ত নিখুঁত খুঁটিনাটি সহ এই পরিস্থিতি'র বর্ণনা করেন বিভূতিভূষণ। চাল যে আক্রা হতে পারে, একথা সেসময়ের বাংলার গ্রামের কোনও একজনও বিশ্বাস করতে পারেননি। যত অভাবই হোক, পেট ভরাবার অন্ন টুকু মিলছে না, এই স্মৃতি বিশ শতকের তিন-চারের দশকের গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে গল্পকথার মতই অলীক এবং অসম্ভব ছিল। ফলত চালের দাম বাড়বার কথাকে তারা গুজব বলে উপেক্ষা করে যায়, কেউ গায় মাখেনা। কামদেবপুর থেকে ফেরবার পথে একদিন দীনু ভট্চাজের কাছে গঙ্গাচরণ শুনলেন, যুদ্ধের ফলে চালের দাম বাড়ছে হু হু করে। দুই, চার, ছয়... মণ প্রতি দাম এই অকল্পনীয় হারে বাড়তে থাকে। এই যুদ্ধের ব্যাপারটা সেসময় খবরের কাগজ মারফত শহরের মানুষের কাছে কিছুটা স্পষ্ট হলেও, গ্রামের লোকের কাছে কিছুতেই পরিস্কার হয়নি যে সুদূর ইওরোপে যুদ্ধ হলে বাংলার গ্রামের মানুষ কেন না খেয়ে মরবে! গঙ্গাচরণ বা তার স্ত্রী অনঙ্গ, চাল পাওয়া যাবে না, নুন পাওয়া যাবে না, একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। আস্তে আস্তে বাজার থেকে কেরোসিন তেল উধাও হতে থাকে।

একদিন গংগাচরণের চোখের সামনে চালের দোকান লুঠ হয়ে যায়। এত কিছু ঘটে যেতে থাকে চোখের সামনে, তবুও অনঙ্গ বা গঙ্গাচরণ কেউ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে এমন দিন তাদের জীবনে আর কয়েকদিনের মধ্যেই অপেক্ষা করছে, যখন খাদ্য নেই।

বিভূতিভূষণ প্রথম থেকেই সাজিয়ে গুছিয়ে অনঙ্গ বৌ আর গঙ্গাচরণের সমৃদ্ধি'র ছবি আঁকেন। ধনী তারা নয়, কিন্তু চাল, ডাল, তেল, ঘি, দুধ, কখনও কখনও ক্ষীর পর্যন্ত, অভাব হয়নি সেটুকু'র। তাদের সাজানো সংসারের প্রতীক যেন তাদের বিকেল বেলার জলখাবারটি। তার ঠিক পরে তাদের সেই সমৃদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীতে এলো অনাহার। অনঙ্গ নিজে না খেয়ে স্বামী, পুত্রের খাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। মাত্র কয়েকদিন আগে যে অনঙ্গ দুর্গাপন্ডিতকে পেট-পুরে খাইয়েছে ভাত, ডাল, আলুসেদ্ধ, পেঁপের ডালনা, বড়াভাজা, মোচার ঘন্ট... তেমন কিছু নয়, তাও সব মিলে এক পরিপূর্ণতার ছবি। আজ বিপদের দিনে হঠাৎ-ই গৃহস্থ বাড়ির অনঙ্গকে রাত্রে না খেয়ে কাটাতে হয়। মাছ না থাকুক খাদ্যতালিকায়, না হয় দুধ টুকুও নাদ গেল, বা হয়তো সাধের জলখাবারটাও। সব বিলাসিতাটুকু বাদ দিয়ে পেট-ভরানোর ভাত মিল্বে না, এ ভাবনা ছিল অবিশ্বাস্য।

দেখা গেল কারুর ঘরেই চাল নেই। লোভে পড়ে যারা ছ'টাকা দরে চাল বিক্রি করেছিলেন, তাঁদের তখন কিনে খেতে হচ্ছে কুড়ি টাকা দরে। ধান-চাল থাকলেও লোকে স্বীকার করতে চায় না সহজে।

> ক্রমে নানাস্থান থেকে ভীতিজনক সংবাদ আসতে লাগলো সব। অমুক গ্রামে চাল একদম পাওয়া যাচ্চে না, লোকে না খেয়ে আছে। অমুক গ্রামের অমুক লোক আজ পাঁচদিন ভাত খায় নি- ইত্যাদি। তবুও সবাই ভাবতে লাগলো, মানুষ কি সত্যি সত্যি না খেয়ে মরে? কখনই নয়। তাদের নিজেদের কোনো বিপদ নেই।[২৫]

এইখানেই উপন্যাসের মধ্যভাগ, অনাহারে মৃত্যু হয় না এই অবোধ বিশ্বাসে ভর করে গঙ্গাচরণ ঘুরে বেড়ান চালের খোঁজে। অনঙ্গ-বৌ অন্যের বাড়ি ধান ভানতে যান গোপনে। মণে দু কাঠা করে চাল বানি পাওয়া যায়। তবুও শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি এতো আশাবাদী অনঙ্গ পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়। কোথাও এক দানা চাল পাওয়া যায় না।

চালের দাম বেড়েই চলল, চব্বিশ, চল্লিশ, পঞ্চান্ন, পঁয়ষট্টি... অন্যান্য ঘটনার বিবরণের সঙ্গে এই অঙ্ক গুলো দিয়ে চলেন বিভূতিভূষণ। সেই সঙ্গে আটা, সুজি, ময়দা, কলাইয়ের

দামও। ডকুমেন্টারি বিবরণ। অবস্থা ক্রমেই আরও খারাপ হতে থাকে। কলাই সেদ্ধ দূরস্থান, জঙ্গুলে মানকচু ও গেঁড়ি গুগলি ছাড়া আর কিছু জোটে না। আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব আস্থা ঘুচে যায় মতি মুচিনীর মৃত্যুতে।

> অনাহারে মৃত্যু এই প্রথম, এর আগে কেউ জানত না বা বিশ্বাসও করেনি যে অনাহারে আবার মানুষ মরতে পারে। এত ফল থাকতে গাছে গাছে, নদীর জলে এত মাছ থাকতে, বিশেষ করে এত লোক যেখানে বাস করে গ্রামে ও পাশের গ্রামে, তখন মানুষ কখনো না খেয়ে মরে? কেউ না কেউ খেতে দেবেই। না খেয়ে সত্যিই কেউ মরবে না।
>
> কিন্তু মতি মুচিনীর ব্যাপারে সকলেই বুঝলে, না খেলে মানুষ তাহলে মরতে পারে। এতদিন যা গল্পে-কাহিনীতে শোনা যেত্র, আজ তা সম্ভবের গন্ডির মধ্যে এসে পৌঁছে গেল। কই, এই যে একটা লোক মারা গেল না খেয়ে, কেউ তো তাকে খেতে দিলে না? কেউ তো তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারলে না? সকলের মনেই একটা বিষম আশঙ্কার সৃষ্টি হোল। সবাই তো তা হোলে না খেয়ে মরতে পারে।
>
> ...
>
> মতির মৃতদেহ আমতলাতেই পড়ে আছে। কত লোক দেখতে আসচে। দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে চলে যাচ্ছে। আজ যা ওর হয়েছে, তা তো সকলেরই হতে পারে! ও যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটি মূর্তিমান বিপদের সংকেত স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েচে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি সংকেত।[২৬]

পথের ধারে, না খেতে পেয়ে এককালের গৃহস্থ মতি মারা যায়। মৃত্যুর আগে সে ছড়া বলে, "বিলির ধারে পদ্মফুল/ নাকের আগায় মোতির দুল..."। তার মনে পড়ে নিজের গাঁ ভাতছালার কথা। সেই ভাতের অভাবে মরে যায় মতি। মতি তো মরে যায় সরাসরি, আর বাকিরা? মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনে বসে বসে, তাদের জন্যও অপেক্ষা করে আছে এমন দিন। অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে আকাশে।

এইখানে বোঝা যায় বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসের প্রায় শেষে পৌঁছে গেছেন। এই জন্যই এর নাম 'অশনি-সংকেত'। অনাহার-মৃত্যুর এই ঘটনাতে আসার প্রস্তুতি চলছিল আখ্যানের মধ্যভাগ থেকে। উপন্যাসটি কোনও পরিণতিতে পৌঁছোয় না, একথা জানা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না কী হতে পারে এই অনাহারের পরিণতি। শেষে কি গঙ্গাচরণকেও স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে বেরোতে হবে গ্রাম ছেড়ে, শহরের লঙ্গরখানার দিকে? নাকি এই নতুন-গাঁয়েই মৃত্যু হবে তাদের! কাপালীদের ছোট-বৌ চলে যেতে

পারত যদু পোড়ার সঙ্গে, গেলে হয়তো না খেয়ে মরতে হত না, কিন্তু শেষ অবদি অনঙ্গকে ছেড়ে, এই গ্রাম ছেড়ে সে যেতে পারল না।

একটি মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুকে সামনে রেখে আরও হাজার হাজার মৃত্যু। এখনো হয়তো মরেনি তারা, শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র! গঙ্গাচরণের নতুন শিশুটি জন্মই মৃত্যুর কোলের মধ্যে। এক বিরাট গণহত্যার প্রতিফলন হিসাবে ধরা থাকে এই উপন্যাস।

আলোচ্য চারটি উপন্যাস। কাহিনির ভিন্নতা এবং বৈচিত্রের মধ্যে চার রকমভাবে উপস্থিত হয়েছে মৃত্যু। 'দৃষ্টি-প্রদীপ' বা 'ইছামতী' তে জীবনের অংশ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে এসেছে মৃত্যু। তার সঙ্গে সমসাময়িক কোনও প্রসঙ্গ যুক্ত থাকেনি। তবে বাকি দুটি উপন্যাস, 'অনুবর্তন' বা 'অশনি-সংকেত', দুটিতেই সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং মৃত্যু প্রায় হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছে। যা বিভূতিভূষণের পরিচিত সাহিত্য-ধরণের থেকে উল্লেখযোগ্যরকম আলাদা! বর্ণনার নিষ্ঠুরতা স্তম্ভিত করেছে পাঠককে। তবে প্রতি ক্ষেত্রেই বজায় থেকেছে এক আশ্চর্য নিরপেক্ষ অনুচ্চকিত ভঙ্গি, যার অভিঘাত পাঠকের মনে আরও তীব্র হয়ে বেজেছে। লেখকের আরও নানা উপন্যাসে মৃত্যুর প্রসঙ্গ থাকলেও এই চারটি উপন্যাসে মৃত্যু ভূমিকা নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের, যা এই উপন্যাস গুলিকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।

তথ্যপঞ্জি :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী,* প্রথম খন্ড, বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস ও অন্যান্য (সম্পা.), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮৮।

২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯।

৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৮।

৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০১।

৫। মৈত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'দৃষ্টিপ্রদীপ', *পরিচয়-* সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন, ৫০ বর্ষ, ৯ম-১২শ সংখ্যা, রায়, দেবেশ (সম্পা.), কলকাতা : ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭।

৬। দেবী, শান্তা, 'দৃষ্টিপ্রদীপ', *বিভূতিভূষণ : দেশে-বিদেশে,* চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার (সম্পা.), কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬।

৭। ঘোষ, তপোব্রত, 'বিভূতিভূষণ : ব্যক্তিগত পুরাণ', *বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা,* সেন, অরুণ (সম্পা.), নতুন দিল্লি : সাহিত্য আকাদেমি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৪৬।

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী,* প্রথম খন্ড, বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস ও অন্যান্য (সম্পা.), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৬৯।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *তৃণাঙ্কুর,* তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : মিত্রালয়, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯।

১০। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য,* কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৭৫।

১১। সেন, রুশতী, *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস,* কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৫৩।

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৫।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *সেরা বিভূতি,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮।

১৪। ঘোষ, শঙ্খ, 'প্রসঙ্গ : অনুবর্তন', *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানে*, সেন, রুশতী (সম্পা.), কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১১৫।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *সেরা বিভূতি*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৯৫।

১৬। সেন, রুশতী, *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৮৭।

১৭।বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *সেরা বিভূতি*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩১।

১৮। সেন, রুশতী, 'অনুবর্তনের বাদ-প্রতিবাদ', *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৯১।

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *সেরা বিভূতি*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩০।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *ইছামতী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৪০।

২১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৭।

২২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৭।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৬।

২৪। ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, "মন্বন্তরের উপন্যাস : 'অশনি-সংকেত'", *অনুষ্টুপ*, ত্রয়োবিংশ বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, আচার্য, অনিল (সম্পা.), কলকাতা : ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৬৯।

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতি রচনাবলী*, তৃতীয় খন্ড, বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস ও অন্যান্য (সম্পা.), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৯।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবন-মৃত্যু এবং অপুর জগৎ

কাজলদুঃখজানিয়াজানিয়ামানুষহউক।দুঃখতারশৈশবেরগল্পেপড়াসেইসোনা-করাজাদুকর।ছেঁড়া-খোঁড়াকাপড়, ঝুলিঘাড়েবেড়ায়, এইচাপদাড়ি, কোণেকাঁদাড়েফেরে, কারুরসঙ্গেকথাকয়না, কেউপোঁছেনা, সকলেপাগলবলে, দূরদূরকরে, রাতদিনহাপরজ্বালায়; রাতদিনহাপরজ্বালায়।

পেতলথেকে, রাংথেকে, সীসেথেকেও-লোককিন্তুসোনাকরিতেজানে, করিয়াওথাকে।[১]

শিশু কাজলকে নিয়ে অপু যখন চব্বিশ বছরের পরে নিশ্চিন্দিপুর যায়, সেসময় অপু তার জীবনের নিষ্ঠুরতম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো। রানী দিদির কাছে কাজলকে রেখে বহুদূর দেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত। ছেলেকে জীবনের যে অনন্ত দুঃখ ভান্ডার, তার মাধুর্য থেকে বঞ্চিত করতে রাজি হয়নি অপু। সেই দুঃখ, যে দুঃখ ছোটবেলা থেকে বারে বারে তার জীবনকে বিস্ময়, বেদনায় এবং অপরিচয়ের আনন্দে ভরে দিয়েছে। অপুর জীবনে মৃত্যুর পর মৃত্যু এসে যেভাবে আলোর মালার মত গাঁথা হয়ে গিয়েছে, সেই মৃত্যুগুলিকে পরপর দেখে নেওয়া যাক এই অধ্যায়ে, যার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত সেই পুলক বেদনার স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করা সম্ভব, যা অপুর জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরী বর্ণিত বিভূতিভূষণ-বর্ণনায় সাহিত্যে তাঁর মৃত্যুচেতনার বীজ বিচিত্রভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে।

> ... If at first he wanted to believe in life after death for the sake of his wife, in his later days he clung to the same faith from his own love of life. So, belief in after life became in him not only a dogma but even a superstition. Yet I could see that he was not religious. All that he wanted was to be assured of his personal continuity. I suspected that his interest in scientific cosmology and pre history was the product of his effort and yearning to find a cosmic location for his world of the dead. Even when approaching death he repeated his credo. He died at the relatively early age of fifty-six in 1950.
>
> However, it must not be imagined from all this that he was always mooning after the super natural. On the contrary, he could be very matter of fact and concrete. Indeed, in his novels he showed an astonishing capacity for detailed observation of both nature and human

character, combined with great humour and tenderness in describing what his observation discovered.

His hard life had not embittered him, nor made him a cynic. His sympathy for ordinary people was unlimited, and he was not repelled even by the squalor in which such people had to live in our society. Somehow, he could always make them rise above the surroundings ; I would even say- far above the limitations of their world.[২]

'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' দুটি উপন্যাসকে একটি ধারাবাহিক কাহিনিরই দুটি অংশ হিসাবে ধরে নিয়ে পরপর ঘটা মৃত্যুগুলির দিকে তাকানো যাক। দেখে নেওয়া যাক কী সেই মৃত্যুর প্রাসঙ্গিকতা, কতটা অপরিহার্য ছিল উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই মৃত্যু বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে অপুর জীবনে তার প্রভাব কতখানি। মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন,

> এই উপন্যাসের যে নায়ক, তার চির-অজর শিশু-হৃদয়কে – তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবন-লীলাকেই ---- কেন্দ্র করিয়া, সুখ-দুঃখ, ভাব-অভাবের ছন্দে, বিপুল কালের পরিধি আবর্তিত হইতে থাকে; সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের এমনকি সর্ব্বজীবের যে জীবন-রহস্য তাহারই বিরাট ছায়ায় চির-সদ্যোজাত মানব-প্রাণ অমৃত-পিপাসায় অধীর হইয়াছে। জীবনের সকল তুচ্ছতার অন্তরালে নৃত্যোন্মত্ত মহাকালের সেই ব্যোম-বিশ্রান্ত জটাজাল দেখিয়া, সেই তুচ্ছতাকেও প্রাণের প্রণাম নিবেদন করিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যুর এপার হইতে মৃত্যুর ওপারে, জন্ম হইতে জন্মান্তরে, এ প্রাণের কাহিনী যেন বাড়িয়াই চলে, শেষ হইতে চাহে না।[৩]

ক. ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু :

অপুর জ্ঞান হবার আগে ইন্দির মারা যান নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের অবসান ঘটিয়ে, তবু অপুর জীবনেও সে মৃত্যুর প্রভাব আছে কিনা সেটিই দেখে নেওয়া যাক।

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের তিনটি অংশের একেবারে প্রথম অংশ 'বল্লালী-বালাই' ছ'টি পরিচ্ছেদে নির্মিত। সেই নির্মাণের অন্যতম উপাদান ইন্দির ঠাকরুণ এই 'বল্লালী-বালাই' তে প্রবলভাবে উপস্থিত থেকে লেখকের কথামতন নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের অবসান ঘটিয়ে চিরবিদায় নেন। উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে অতি অল্প সময়ের জন্য সর্বজয়ার স্মৃতিতে একবার মাত্র ফিরে আসেন বহুদিন আগে মৃত ইন্দির।

বোঝা যায় বল্লাল সেন এর আমলের কৌলীন্য প্রথার অভিশাপের দিকটি ঈঙ্গিত করেই উপন্যাসের প্রথম অংশের এই নাম। ইন্দির সেই প্রথার এক অতি দুঃখী মলিন

উদাহরণ। তবে ইন্দির বেঁচে থাকা কালেই সে ঘটনা প্রাচীন হতে হতে প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে পৌছোয়। বিভূতিভূষণ তাঁর উপন্যাসে সম্ভবত সচেতনভাবে ব্যবহার করেন 'শোনা যায়' শব্দ দুটি। শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাক্‌রুনের বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বিবাহের পরে হাতে গোনা দুই-এক বার গ্রামে এসে ইন্দিরের সঙ্গে এক আধ রাত্রি কাটিয়ে পাথেয় খরচ ও কৌলীন্য-সম্মান আদায় করে, খাতায় দাগ দিয়ে পরবর্তী শ্বশুরবাড়িতে চলে যেতেন। এ ঘটনার পরে এতোদিন কেটে গিয়েছে যে তা ইন্দিরের কাছেই প্রায় বিগত জন্মের স্মৃতি।

> তাহার পর অনেকদিন হইয়া গিয়াছে, শাঁখারিপুকুরে নাল ফুলের বংশের পর বংশ কত আসিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। ... ইছামতীর চলোর্মি-চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়া কুটার মতো, ঢেউয়ের ফেনার মতো, গ্রামের নীলকুঠির কত জন্‌সন টম্‌সন সাহেব, কত মজুমদারকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।
>
> শুধু ইন্দির ঠাক্‌রুন এখনও বাঁচিয়া আছে। ১২৪০ সালের সে ছিপছিপে হাস্যমুখী তরুণী নহে, পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা...[৪]

অতএব ইন্দিরের কাল একেবারে ভরপুর উনিশ শতক, সেই উনিশ শতকের গ্রাম বাংলার চরিত্রায়ণ ঘটে ইন্দিরের চরিত্রের মাধ্যমে। কিন্তু এ কাহিনির সূত্রপাত সেসময়, যখন নিশ্চিন্দিপুর বিশ শতকে পা দেবে।

হরিহরের অতি দুঃসম্পর্কীয়া দিদি এই ইন্দির, যদিও বহুকাল ধরে এ পরিবারে আশ্রিত থাকতে থাকতে একমাত্র এরই চোখের সামনে এ পরিবারের বহু ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আজকের হরিহর, সর্বজয়া সেসবের কিছুই দেখেনি। সেসব পুরনো কালের সাক্ষী হিসাবে ইন্দিরের আজ দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, কিন্তু মনে মনে সেইসব দিনের ফ্ল্যাশব্যাক ঘটে প্রায়শই। সেই ফ্ল্যাশব্যাকের সূত্রধরেই হরিহরের পরিবারে পেরিয়ে আসা আরো দু-তিনটি করুণ মৃত্যুর কথা পাঠক জানতে পারেন। যদিও তার সঙ্গে সরাসরিভাবে এই কাহিনির কোনও সম্পর্ক নেই, কেবল অপুর পূর্বপুরুষদের খানিকটা চিনে নিতে তা সাহায্য করতে পারে।

হরিহরের পূর্বপুরুষ বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকতো। খুন করে মানুষের যথাসর্বস্ব লুঠে নেওয়াই ছিলো যাদের পেশা। এই বীরু রায়ের উপস্থিতিতে এক পূর্বদেশীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর বালক পুত্রকে খুন হতে হয় ১২৩৭ সালে। কথিত আছে সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে তার পরের বছর ১২৩৮ সালে

এক আনন্দময় দুর্গাপুজোর সময় বীরু রায়ের একমাত্র বালক পুত্রকে কুমীরে নিয়ে যায়। এ ঘটনার অল্পদিন পরে বীরু রায়ও মারা যান। হরিহর সর্বজয়া পেরিয়ে তার পরের প্রজন্ম, এ কাহিনি শোনে গল্পকথার মতন।

এককালে যে পরিবার অসৎ, বেপরোয়া পথে রোজগার করে ধনী হয়ে উঠেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়ে যেতে যেতে, এ আখ্যান যেখানে শুরু হচ্ছে এ পরিবারের তখন নিয়মিত ভাত জোটানোই প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি। যৌবন বয়সে ভবঘুরে হরিহর বয়স খানিক বাড়লে দশ বছর আগে বিবাহ করা স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে যখন নিশ্চিন্দিপুরে সংসার পেতেছিলো, তখন সেই নবদম্পতির চোখেও নতুন জীবনের স্বপ্ন ছিল, তবে কেবল গ্রামের বাড়িতে মাঝেমধ্যে ঠাকুর পুজো করে আর গুটিকয়েক শিষ্যবাড়ি থেকে আসা সিধের অল্প আয়ে স্বপ্ন তরতাজা থাকলেও দারিদ্র পেয়ে বসেছিলো। হরিহর, সর্বজয়া ও তাদের একটি কন্যা সন্তান, ও পরবর্তীকালে আরেকটি পুত্রের সঙ্গে যখন ইন্দির আশ্রিতা হয়ে স্থান দখল করে, তা তখন গোটা সংসারের পক্ষে বালাই বৈকি।

আশ্চর্য স্নেহ আর মায়ায় ভরপুর যে বই, তাতে লেখক বিভূতিভূষণ ইন্দিরের কথাও লিখেছেন যখন, হাত কাঁপার কোনও চিহ্ন তাঁর লেখায় পড়েনি। বর্ণনার ক্ষুরধার নিষ্ঠুরতা আগাগোড়া বজায় থেকেছে।

এই পরিবারের কর্ত্রী সর্বজয়ার পক্ষে স্বামী-সন্তানের খাদ্যের ব্যবস্থা করা যখন গুরুতর সমস্যা, সে অবস্থায় ইন্দিরের প্রতি তার আচরণ হয়ে পড়ে অতি হীন, অতি নিষ্ঠুর। বারে বারে সর্বজয়ার অপমানে বৃদ্ধা ইন্দিরকে এর দ্বারে ওর দ্বারে ঘুরতে হয়েছে। খুকি দুর্গার অধীর ভালোবাসাকে বাধ্যত উপেক্ষা করে আধাচেনা লোকেদের দয়ায় পড়ে থাকতে হয়েছে ভাত-কাপড়ের জন্য। সর্বজয়ার এই অপার নিষ্ঠুরতার উৎস যে তাদের সীমাহীন দারিদ্র, এ নিয়ে সংশয় থাকে না যখন উপন্যাসের শেষভাগে সর্বজয়ার স্মৃতিচারণে অশ্রুজলে ভেসে ওঠে ইন্দিরের মুখ।

কিন্তু ইন্দির ঠাক্‌রুনের জীবনের শেষ দিনটিতে অমঙ্গলের নগ্ন মূর্তি দেখে পাঠক বিপন্ন বোধ করেন! জীবনের শেষ দিনটিতে অসুখে পীড়িত ইন্দির এতোদিনের ভিটাতে ফিরে এলে, সর্বজয়াকে দেখে-

বুড়ি হাসিয়া বলিল- ও বৌ, ভালো আছিস? এই অ্যালাম অ্যাদ্দিন পরে, তোদের ছেড়ে আর কোথায় যাবো এ বয়সে- তাই বলি-

সর্বজয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল- তুমি এ বাড়ি কি মনে করে?

তার ভাবভঙ্গি ও গলার স্বরে বুড়ির হাসিবার উৎসাহ আর বড় রহিল না। সর্বজয়া কথার উত্তর দিতে না দিয়াই বলিল- এ বাড়ি আর তোমার জায়গা কিছুতেই হবে না- সে তোমাকে আমি সেদিন বলে দিয়েচি- ফের কোন্ মুখে এয়েচ?

বুড়ি কাঠের মতো হইয়া গেল, মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। পরে সে হঠাৎ একেবারে কাঁদিয়া বলিল- ও বৌ, অমন করে বলিসনে- একটুখানি ঠাঁই দে আমারে- কোথায় যাবো আর শেষকালডা বল্ দিকিনি- তবু এই ভিটেটাতে-[৫]

ইন্দির তখনও জানেনা তার সামনে ভবিষ্যতে কী দাঁড়িয়ে আছে, তবে সে আন্দাজ করতে হয়তো পেরেছিলো। সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের গৃহবধূ, দুটি সন্তানের স্নেহময়ী জননী, তার মধ্যে দিয়ে, ইন্দিরের আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন করে আত্মপ্রকাশ করে অমঙ্গলের এমন এক রূপ, যা এমনকী সে তার দুঃখের জীবনেও আগে কখনো দেখেনি। ইন্দির ঠাক্রুন তার দুঃখের জীবনের অন্তিমলগ্নে মনুষ্য নামক জীবের সামগ্রিক অসহায়তার সামনে এসে দাঁড়ায়। অমঙ্গলের সেই অন্ধকারসত্তা এক সামান্য গ্রাম্য দুই সন্তানের জননী গৃহবধূর মূর্তি ধারণ করে। এর সঙ্গে বাকি উপন্যাসের সর্বজয়াকে আমরা আর একটিবারও মেলাতে পারবো না।

এই ভিটার ঘাসটুকু, ঐ কত যত্নে পোঁতা লেবু গাছটা, এই অত্যন্ত প্রিয় ঝাঁটাগাছটা, খুকি, খোকা, ব্রজ পিসের ভিটা- তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছু জানেও নাই, বুঝেও নাই।

চিরকালের মতো তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে।[৬]

মৃত্যুর সময়ে ইন্দিরের কৌলীন্যের জন্য মুখে জল দেবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যায় না। এই হচ্ছে ইন্দিরের সেকাল, এই হচ্ছে তার গ্রাম, এই হচ্ছে সেসময়ের মেয়েদের অবস্থা। বৃদ্ধার মৃত্যু হয় চিরকালের প্রাণের ভিটাটির বাইরে, তার অতি তুচ্ছ সব সম্পদ, ঝাঁটা, পুঁটলি, সরা গুলি থেকে বহুদূরে অনাত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে পথের ধারে। মৃত ইন্দিরের চোখের পাতা বুঁজিয়ে দেওয়া হলে সেখান থেকে কোটরগত অনেকখানি জল, তার অব্যক্ত যন্ত্রণার সঙ্গী হয়ে শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

এর পরের বাক্যটিতে ‘পথের পাঁচালী’ বইয়ের ‘বল্লালী-বালাই’ অংশটি শেষ হয়, “ইন্দির ঠাক্‌রুনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে সেকালের অবসান হইয়া গেল।”

সত্যিই সেকালের অবসান হয় কি না এ জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে আমাদের এগিয়ে যেতে হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় মৃত্যুটিতে।

খ. দুর্গার মৃত্যু :

সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে শুরু হয় উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ ‘আম আঁটির ভেঁপু’। ‘বল্লালী-বালাই’ অংশে হরিহরের যে শিশুপুত্রের সামান্য উল্লেখ পাওয়া গিয়েছিল, এই অংশে সে সাত বৎসরের ফুটফুটে সুন্দর ছেলে অপু। বাবার সঙ্গে জীবনে প্রথমবারের জন্য সে বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে চলেছে কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে। পথের মধ্যে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের এক শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে। সেই বহুকাল পূর্বে মারা যাওয়া শিশুটিকে সবাই ভুলে গিয়েছেন। বিস্মৃত বিদেশী শিশুর ভগ্ন সমাধির উপরে রাশি রশি পুষ্প ঝরে পড়ে থাকে। মানুষের অতি অল্পক্ষণের জীবনে আর ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিতে যা টিকে থাকে দীর্ঘ সময়ের নিরিখে অল্প কটি দিন, বনের গাছপালাগুলি তা অত সহজে ভোলে না। প্রবাহিত সময়ের অনেক যাওয়া-আসার মূক দর্শক তারা।

সেই প্রথম দিনটি থেকে অপু পথে বেরিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকে। সে এই পৃথিবীতে নতুন, ওই মাঠ পেরিয়ে গেলেই কি তার মায়ের বলা রূপকথার রাজ্য পড়বে? তার এই ছোট্ট চেনা গন্ডিটুকু পেরোলেই সামনে যে বিস্তৃত পথ, সে পথই যে পৌঁছোয় অসম্ভবের দেশে। সেই শিশুকাল পেরিয়ে বড়ো হয়ে গেলেও, অপুর মনের শৈশবের সেই বিস্ময়ের দরজাটি বন্ধ হয়ে যায়নি। ছোটবেলায় পথে বেরিয়ে সত্যি জ্যান্ত খরগোশ দেখে উচ্ছ্বাসে বিস্ময়ে ছোট্ট মুখটি যে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, সেই হাঁ বন্ধ হয়নি। তার বাবা তাকে বলে সে হাঁ করা ছেলে। সেই কারণেই তো সে সকলের চেয়ে আলাদা, সে অপু। অপুর জীবনব্যাপী যাত্রা এই ছ-সাত বছরের শিশু অপু নির্ধারণ করে দেয়। বিস্ময়, কল্পনা, সুদূরতা, দূরের জন্য দুর্দমনীয় ইচ্ছে, বালক অপু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক বছর চল্লিশের অপু, এই শব্দগুলো দিয়েই তাকে চিনে ফেলা যায়।

‘বল্লালী-বালাই’ অংশে সংসারে ইন্দিরের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী ছোট্ট মেয়ে দুর্গা পরের অংশে বড়ো হয় একটু। সে অপুর মতন নয়, অপুর সঙ্গে বিস্তর ফারাকের মধ্যে দিয়ে

তাকে গড়ে তোলেন লেখক। হরিহর সর্বজয়ার দারিদ্রের সংসারে দুর্গার খেলনা বলতে শুকনো ফল, গাছের ফুল, রড়া ফলের বীচি। তাই নিয়েই সে সুখী, অত্যন্ত। অপু সঙ্গে তার প্রধান ফারাকগুলির একটি হল অপুর মতন সে দূর অপরিচিত জগতের স্বপ্ন দেখে না। যদিও দুর্গার মৃত্যুর বেশ কিছু পরে অপু যখন তার বন্ধু পটুর সঙ্গে নৌকায় উঠে তার দড়ি খুলে দেয়, নৌকা ভেসে যায় নিজের মতন, আকাশে দেখা দেয় ঘন মেঘ, পটু ভয় পেলেও, সেই বিপদের, সেই জীবনের প্রথম অ্যাডভেঞ্চারের মুহূর্তটিতে অপু কিন্তু ভয় পায় না। নিজেকে সে 'বঙ্গবাসী' কাগজে কথিত বিলাতযাত্রী কল্পনা করে, কলিকাতা থেকে যেন তার জাহাজ ছেড়েছে, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেছে সে, শুধুই এগিয়ে। এই পরিচ্ছেদের শেষে বিভূতিভূষণ লেখেন, "সে-ও তাহার মা ও দিদির মত স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছে।" কিন্তু পাঠক জানেন, অপুর স্বপ্ন দেখার দৌড় তার মা আর দিদির মতন নিশ্চিন্দিপুরের ছোট্ট গন্ডিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। তার স্বপ্ন পরিচয়ের, নিশ্চিন্ততার, নিরাপত্তার সীমা ছাড়িয়ে, জানার থেকে অজানার দিকে নির্দ্বিধায় পাড়ি দিতে প্রস্তুত, তার দিদি, তার মা'র কল্পনা কখনও, কোনদিন যে জায়গায় পৌঁছোতে পারবে না।

কিন্তু দুর্গার কিছু সাধ আছে। দার্শনিক স্বপ্ন নয়, নিতান্ত পার্থিব কিছু সাধ, কিন্তু তার চারপাশের বাস্তবতা প্রতিনিয়ত বুঝিয়ে দিয়ে যায় সে সাধ পূরণ হবেনা, দুর্গাও সে কথা মনে মনে হয়তো ভালোই জানে। অপু কিন্তু এমন কিছু জানেনা, স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার ধারণা তার মনে কক্ষনো জায়গা পায়নি শৈশব-কৈশোরে।দুর্গা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, তাদেরই বাড়ির সামনে দিয়ে চিনিবাস ময়রা যখন চলে যায়, তখন দুর্গা অপুকে নিয়ে ছুটে যায় সেই বাড়িগুলোতে, যেখানে নিয়মিত মিষ্টি কেনবার অভ্যেস আছে। দুর্গাদের বাড়িতে তেমন অবস্থা নয়, তা নিয়ে দুর্গার একটা দিনের জন্যও কোনও অভিযোগ থাকেনি। সে সেই স্বাদ আয়ত্ত করেছে অন্যভাবে।

> জন্মিয়া পর্যন্ত ইহারা কখনো কোনো ভাল জিনিস খাইতে পায় নাই। অথচ পৃথিবীতে ইহারা নূতন আসিয়াছে, জিহ্বা ইহাদের নূতন- তাহা পৃথিবীর নানা রস, বিশেষত মিষ্ট রস আস্বাদ করিবার জন্য লালায়িত। সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া সে পরিতৃপ্তি লাভ করিবার সুযোগ ইহাদের ঘটে না- বিশ্বের অনন্ত সম্পদের মধ্যে তুচ্ছ বনগাছ হইতে মিষ্টরস আহরণরত এই সব লুব্ধ দরিদ্র ঘরের বালকবালিকাদের জন্য তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুলফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।[৭]

কামরাঙা, নোনা, শ্যাওড়া ফল, কোনকিছু দুর্গার নজর এড়ায়নি কখনো, তার কাছে কটু, কষা, স্বাদহীন অথবা সামান্য মিষ্ট, সব ফলই মিষ্টি যেন গুড়। রসগোল্লা সন্দেশ ইত্যাদি

লোভনীয় মিষ্টির মতন মিষ্টি সেসব ফল নয়, কারণ দুর্গা এসব মিষ্টির স্বাদই জানেনা। তার কাছে চূড়ান্ত মহার্ঘ মিষ্টতার অনুভূতি এনে দিয়েছে গুড়। তাই তার কাছে বনের সব ফলই ভারি কাঙ্ক্ষিত এবং গুড়ের মতন মিষ্টি। অপুর কিন্তু সেসব মোটেও দিদির মতন অত ভালো লাগে না কক্ষনো। তার আশশ্যাওড়ার ফলকে মিষ্টি বলবার কোন দায় নেই।

দুপুরবেলা সর্বজয়া যখন ছেলেকে মহাভারত পড়ে শোনায়, দুর্গার তখন কাজ থাকে পান সেজে দেওয়া। দুর্গার সেসবে কোনও বঞ্চনা বোধ নেই, মহা উৎসাহে করে সব কাজ। কল্পনা দুর্গার সত্তার অন্তর্গত বিষয় নয়, তার অন্তর্গত বিষয় হল সাধ।

দুর্গা একটা অসাধারণ ছোটবেলা কাটায়, যে ছোটবেলা গ্রামের বাকি তারই বয়সী মেয়েদের থেকে অন্যরকম, তার বয়সী অন্যান্যরা যখন মেয়েলী ব্রত-পূজা পরিপূর্ণ কৈশোর কাটায়, সে তখন বুনোফলের সন্ধানে জঙ্গলে ঘোরে, সেঁজুতি ব্রত, শিবপূজা, অর্চনায় তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই, সে তার সর্বজনবিদিত সুফলগুলির বিষয় আদপেই সচেতন নয়। আর সত্যি কথা বলতে কী সর্বজয়া বার কয়েক অতি মৃদু বকাঝকা করলেও, সেই তার এই খামখেয়ালি মেয়েটিকেই বোধহয় ভালোবাসে। দুর্গা একেবারে দুর্গারই মতন। তার মেয়েবেলা ভারি মনোরম তার নিজের শর্তে।

এমনকী অপুর থেকেও দুর্গার ছোটবেলা ঢের আলাদা। দুর্গা জানে তার মা তাকে কখনো নারকোলের বড়া বানিয়ে দিতে পারবে না, তার কখনো পুঁতির মালা হবে না, তাই সে তার পুরো ছোটবেলাটা জুড়ে নানাভাবে তার সেই অপূর্ণ সাধ গুলো মিটিয়ে নিতে চায়। কখনো সে চুরিও করে। চুরি করে, পাশের বাড়ির দজ্জাল সেজ ঠাক্‌রুনের অপমানজনক কথা শুনে, মায়ের মার খেয়েও দুর্গা নির্বিকার থাকে। বাড়ি থেকে গ্রামের শ্মশান ছাতিমতলায় যাবার নির্দেশ শুনেও সে ঘুরে আসে পাকা ফলের সন্ধানে। ওইরকম মার খেয়েও দুর্গা দুটো বড় বড় কামরাঙা খায়। দেখে “মিষ্টি যেন গুড়”। নিশ্চিন্দিপুর দুর্গার রাজত্ব। সে কার্যত কক্ষনো কোনোদিনও সেই জায়গাটুকু ছেড়ে বেরোতে পারবে না। কিন্তু অপুকে তো বেরোতেই হবে।

ইন্দিরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের অবসান হচ্ছে কী না এ নিয়ে সংশয় রয়ে যায়, কিছু কি পরিবর্তন আসে নিশ্চিন্দিপুরের জীবনে? হয়তো গ্রামের বহু অতীত ঘটনার সাক্ষীটি আর রইলেন না কিন্তু এমন বৃদ্ধা গ্রামে আরও বাকি ছিলেন তখনো। আতুরী বুড়িও তো তাদেরই একজন। তবে ‘আম আঁটির ভেঁপু’ অংশের

সতেরো নম্বর অধ্যায়ে যখন গ্রামের উত্তর মাঠে জরিপের তাঁবু পড়ে তখন বোঝা যায় এসব একালের চিহ্ন। জরিপ কিংবা রেলের লাইন, উনিশ শতকের গ্রামবাংলাকে বিশ শতকের বৈশিষ্টর দিকে, সেকাল থেকে একালের দিকে এগিয়ে দেয়। সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম জীবনে জরিপের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক যন্ত্র গ্রামের দিকে এগিয়ে আসে। এই জরিপের সূত্র ধরেই গ্রামের বাইরে কলকাতায় থাকা নীরেন গ্রামে আসে। তাদের এখানে কিছু পৈত্রিক জমি ছিল। উপনিবেশের যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট তৈরি হল শহরের প্রতি আকর্ষণ। গ্রাম থেকে চাকরির জন্য, পড়াশুনার জন্য শহরে যেতে হত। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে চাকরির ধারণা-ই ছিল না। এইরকম সময়ে পুরনো জমি'র সূত্র ধরে এক ধরণের বিচ্ছিন্নতার বোধ নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে এসে দাঁড়ায় নীরেন। নীরেন নিজের মুখে একবারের জন্য না বললেও কানাঘুষোয় দুর্গার কাছে একথা এসে পৌঁছোয় যে নীরেন তাকে পছন্দ করে। নীরেনের বৌদি, গ্রামের গোকুলের স্ত্রী দুর্গাকে জানায় ঠাকুরপোর বোধহয় দুর্গাকে বিয়েতে মত আছে। গোকুলের বৌ এর এই নিতান্ত বায়বীয় 'যেন'র উপরে নির্ভর করে দুর্গা আর তার অভাগিনী মা সর্বজয়া স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দুর্গার সঙ্গে বুঝি তার বিয়ে হবে। তার ঠিক পরের পরিচ্ছেদে আসে সুদর্শন পোকার কথা।

> সুদর্শন পোকা- ঠিক পোকা নয়- ঠাকুর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের কাজ-তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। সে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার কপালে ঠেকাইয়া আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া বার বার দ্রুতবেগে আবৃত্তি করিতে লাগিল- সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো... সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো... সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো (অবিকল এই রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে)। পরে সে নিজের কিছু কথা মন্ত্রের মধ্যে জুড়িয়া দিল- অপুকে ভালো রেখো, মাকে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, ওপাড়ার খুড়িমাকে ভালো রেখো- পরে একটু ভবিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল- নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর দিদির মতো বাজি-বাজনা হয়।[৮]

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে দুর্গা জেনেছে অন্যের ভালো চাইতে হয়, প্রিয়জনদের নামের সঙ্গে লাজুকভাবে তাই সে জুড়ে দেয় নীরেনবাবুর নামটিও। নীরেনের সঙ্গে দুর্গার বিয়ের আসলে কোনো প্রশ্নই থাকে না। বস্তুত বিভূতিভূষণ এই 'ভগবান' কীটটিকে এনে যেন নিষ্ঠুর ঠাট্টাই করেন। তিনি জানেন দুর্গার এই প্রার্থনা কত অর্থহীন। লেখক চান যে পাঠকও জানুক তার এই প্রার্থনা কত অর্থহীন! ভাই-বোনের মধ্যে এই বিবাহ প্রসঙ্গে ঘুমোনোর সময় চুপি চুপি কথা হলে অপু দুর্গাকে বলে তুই রেলগড়ি চড়বি,

দেখিস। ঘুমিয়ে পড়বার আগে দুর্গার সেদিনকে বারবার মনে হয়, ঠাকুরের বড্ড দয়া, মা তো ঠিক কথা বলে। "ঠাকুরের বড্ড দয়া", এই শব্দ ক'টির মধ্যেই কী ব্যঙ্গ মিশিয়ে দেন বিভূতিভূষণ। অল্প একটি বাক্যে তার আধুনিকতাকে ছুঁতে পারেন পাঠক। এই অধ্যায়ের শেষ হয় একটি ভারি মনকাড়া অবাস্তব ছড়ায়, দুর্গার নিতান্ত শৈশবে যে ছড়া তাকে শিখিয়েছিল তার বুড়ি পিসি ইন্দির। পাড়ার ধনী পরিবারের লীলাদির বিয়েতে চমৎকার বালুচরের শাড়ি কেনা হয়। দুর্গারও যে নীরেন বাবুর সঙ্গে বিয়ে হতে পারে, তবে তখন কি এমন শাড়ি হবে? এই ভাবনার থেকেই বোধহয় কবিতাটি মনে আসে তার মনে, "বালুচরের বালুর চরে একটা কথা কই-/ মোষের পেটে ময়ূরছানা দেখে এলাম সই"। মোষের পেটে ময়ূর ছানা থাকবার মতনই অলীক দুর্গার এই সুখস্বপ্ন মাত্র।

নীরেনের সঙ্গে দুর্গার বিবাহ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই, তাদের তফাৎ শ্রেণিগত। তা হতে পারে না। বরঞ্চ মৃত্যু এসে দুর্গাকে নিয়ে না গেলে কী হতে পারতো, তার ঈঙ্গিত রেখে যান বিভূতিভূষণ।

দুর্গার ইদানীং মনকেমন করে।

> দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা, পথঘাট এই অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধিসন্ধিকে অত্যন্ত বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন, ছায়াভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে। তাহার অপু- তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হু-হু করে- তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!
>
> আর যদি সে না ফেরে- যদি নিতম পিসির মতো হয়? এই ভিটাতেই নিতম পিসি ছিল, বিবাহ হইয়া কতদিন আগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর বাপের ভিটাতে ফিরিয়া আসে নাই। অনেককাল আগের কথা- ছেলেবেলা হইতে গল্প শুনিয়া আসিতেছে। সকলে বলে বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়- সে কতদূরে? কথায়? কেহ আর তাহার খোঁজখবর করে না; আছে কি নাই, কেহ জানে না। বাপকে নিতম পিসি আর দেখে নাই, মাকে আর দেখে নাই, ভাই-বোনকেও না। সব একে একে মরিয়া গিয়াছে! মাগো, মানুষ কেমন করিয়া এমন নিষ্ঠুর হয়! কেন তাহার খোঁজ কেহ যে আর করে নাই! কতদিন সে নির্জনে এই নিতম পিসির কথা ভাবিয়া চোখের জল ফেলিয়াছে! আজ যদি হঠাৎ সে ফিরিয়া আসে- এই ঘোর জঙ্গল-ভরা জনশূন্য বাপের ভিটা দেখিয়া কি ভাবিবে?
>
> তাহারও যদি ঐ রকম হয়? ঐ তাহার বাবাকে, মাকে, অপুকে ছাড়িয়া- আর কখনো দেখা হইবে না- কখনো না- কখনো না- এই তাহাদের বাড়ি, গাবতলা, ঘাটের পথ?

> ভাবিলে গা শিহরিয়া ওঠে, দরকার নাই। কি জানি কেন আজকাল তাহার মনে হয় একটা কিছু তাহার জীবনে শীঘ্র ঘটিবে। একটা এমন কিছু জীবনে শীঘ্রই আসিতেছে যাহা আর কখনো আসে না। দিন-রাতে খেলা-ধুলার, কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে এ কথা তাহার প্রায়ই মনে হয়... ঠিক সে বুঝিতে পারে না তাহা কি, বা কেমন করিয়া সেটার আসিবার কথা মনে উঠে, তবুও মনে হয়, কেবলই মনে হয়, তাহা আসিতেছে... তাহা আসিতেছে... শীঘ্রই আসিতেছে...[৯]

মৃত্যু না হলে দুর্গা যা হতে পারে, তা ওই নিতম পিসির মত, সে এতোদূরে চলে যাবে যে আর নিশ্চিন্দিপুরে ফিরতে পারবে না। কিংবা সে হতে পারে গোকুলের বৌয়ের মতন যে মাথা ভিজিয়ে স্নান করতে পারে না, গোকুল তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ায় সেই রক্তাক্ত ক্ষততে জল লেগে জ্বালা করবে বলে। গোকুলের বৌয়েরও তার মাতৃমুখ মুখ মনে পড়ে এসব দুঃখের দিনে, মনে পড়ে তার একমাত্র ভাইটির কথা। দুর্গা যদি মারা না যেত, তবে গোকুলের বৌ এর মুখটা দুর্গাকে দিয়ে সহজেই প্রতিস্থাপন করা যেতে পারতো। শ্বশুরবাড়িতে মার খেতে খেতে একসময় সে তার বহু অপ্রাপ্তির, তবু পরম রমণীয় শৈশবটিকে হারিয়ে ফেলতো।গোকুলের বৌ আরও ভাবতো তার গৃহহারা পথিক ভাইটা হয়তো মেঠো পথে রাত্রিবেলা চলেছে, এই কথা তো অপুর জন্য আক্ষরিক অর্থে সত্যি হতে পারতো। কেবল মৃত্যু এসে দুর্গাকে নিতম পিসি বা গোকুলের বৌ হবার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়। নিজের সন্তান দুর্গার জীবনে মৃত্যু ডেকে এনে এই দৈন্য থেকে নিজের হাতে মুক্তি দেন বিভূতিভূষণ।

তার অল্পদিনের পরে নীরেন নিশ্চিন্দিপুর থেকে চলে যায়। বারংবার চিঠি লিখেও তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় না।

তাই যখন আসন্ন বিচ্ছেদের দুর্বোধ্য আশঙ্কা দুর্গার মনকে আচ্ছন্ন করে, আরও বেশি করে সে আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্দিপুরকে, তখন সেই বিচ্ছেদ বিবাহের মতন বিচ্ছেদের ঈঙ্গিত নয়। যেন আসলে মৃত্যুরই আগমনধ্বনি শোনে সে। দুর্গাকে এই ভিটে ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না। বরঞ্চ তার মৃত্যুর পরে তাকে ফেলে তার এতো ভালোবাসার বাবা, মা, সোনার খোকা ভাইটি চলে যাবে বহুদূর, চিরকালের মতন। কেবল ছেলেবেলার দুর্গা তার আর তার ভাইয়ের একান্ত, রঙিন স্মৃতি আগলে বসে থাকবে অনন্তকাল। এমনটাই দুর্গার জীবন, যে কতকগুলো প্রাত্যহিক ইচ্ছে নিয়ে অল্প কিছুদিন বেঁচে যায় গ্রামে। এর অনেক বছর পরে, 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর মনে পড়ে একটি দিনের কথা, যেদিন নিছক কৌতূহল বশত অপুর মারা ঢিলে একটা ছাতারে

পাখি মুখে রক্ত উঠে মরে যায়। তার ঢিলে যে সত্যি সত্যি একটা জীবন্ত পাখি মরে যেতে পারে তা অপু বুঝতে পারেনি। দিদির তিরস্কারে অপুর বিজয়গর্বে উৎফুল্ল মন দমে যায়। দুর্গা বামুনের ছেলে অপুকে সেই পাখিটার গতি করে দিতে বলে। এই দুর্গা বিশশতকের শুরুর দিকের গ্রাম সমাজের মূর্তি। এভাবেই অপুর চরিত্র'র থেকে একেবারে আলাদা করে দুর্গাকে গড়েন বিভূতিভূষণ। আমরা 'পথের পাঁচালী' যখন পড়ি, তখন অনায়াসে বুঝতে পারি অপু বহন করে তার বাবা, ঠাকুরদাদার উত্তরাধিকার, আর দুর্গা সর্বজয়া, ইন্দিরের। তাদের জীবন চলে সমান্তরালভাবে, যেভাবে দুটি রেললাইন পাশাপাশি থেকেও কখনো মিলে যায় না। সমাজই অপু আর দুর্গাকে আলাদা করে বড়ো করে তোলে। অপুর শিকড়টা কোথায়? পূর্বপুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, রামচাঁদ রায়ের সময় পেরিয়ে হরিহর সংস্কৃত পড়ে, গান শিখে, তারপরে বিবাহ করে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী'কে ফেলে কীসের অদম্য পিপাসায় ঘরছাড়া হয়ে যায়? সব ছেড়েছুড়ে কতদিন ঘুরে বেড়ায়। অপুর জীবনেও তো এই ঘটনারই প্রায় পুনরাবৃত্তি হয়। তবে এটা ঠিক যে অপু নিজে চাকরি ছাড়ে না, তার চাকরি যায়। পরেরদিন সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে ভূগোলের বই খুলে ছক করে এবং তারপরে বেরিয়ে পড়ে। অপু'র ভবঘুরে চরিত্র কোন ছন্নছাড়া শিকড়হীন বস্তু নয়। সে পুরুষানুক্রমে একটা ঐতিহ্য এগিয়ে নিয়ে যায়।

যেভাবে রামচাঁদ আর ইন্দিরের জীবন পাশাপাশি থেকেও সম্পূর্ণ আলাদা, যেমন সর্বজয়া আর হরিহরের জীবন একসঙ্গে থেকেও সমান্তরাল, ঠিক সেভাবেই অপু আর দুর্গার জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। 'পথের পাঁচালী' তে সে ছবি স্পষ্ট। অপু মাঝেমধ্যে কাঁদে, অপু অভিমান করে, রাগ করে অপু খায় না। প্রবল মার, লাঞ্ছনা সহ্য করেও রাগ বা অভিমান দুর্গার হতে দেখেনি কেউ কখনো। খাবার উপরে যে রাগ দেখানো যায়, দুর্গা তা জানেনা। তার অভিধান, তার কাঙাল মন 'রাগ' শব্দটিকে কোন প্রশ্রয় দিতে শেখেনি।

দুর্গার পুতুলের বাক্সে থাকে রাংতা, ছোবানো কাপড়, আলতার পাতা, পাখির বাসা, ফলের বিচি। অপুর বাক্সে এসবের সঙ্গে আরও একটি জিনিস থাকে যা দুর্গার খেলনার বাক্সে কক্ষনো খুঁজে পাওয়া যায় না। তা হল খেলা করবার জন্য তৈরি টেলিগ্রাফের তার। সেই তার, যার মাধ্যমে দূরের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা যায়। সেই তার, যা সুদূরের পিয়াসী অপুকে ছেলেবেলা থেকে মনে মনে গ্রাম ছাড়িয়ে বহুদূরে, পরিচিতকে ছাড়িয়ে অপরিচয়ের দিকে নিয়ে গিয়েছে। রেলগাড়ি দুর্গার চড়া হয়নি তো বটেই,

রেলগড়ির লাইন পর্যন্ত তার দেখা হয়না, যা অপু শৈশবে তার বাবার সঙ্গে শিষ্যবাড়ি যাবার পথেই দেখতে পায়। দুর্গার কখনো কোথাও যাওয়া হয়না। সবচাইতে বড় কথা অপু পাঠশালা যায়, দুর্গার কখনো সেখানে যাবার কোনও সুযোগ হয় না। তাকে ট্রেনলাইনের গল্প শুনতে, বইয়ের রঙিন ছবি দেখতে ছোট ভাইটির উপরেই নির্ভর করতে হয়। হোক না বয়সে ছোট, রাত হলে ভীতু, সরল দুর্গাকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করার ভার দুর্গা নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেয় ভাইয়ের উপরে। অনায়াসে প্রকাশ করে তার নির্ভরশীলতা। অন্ধকারে 'দাঁড়িয়ে দেওয়া', কিংবা দেশ বিদেশের খবর দেওয়া... সবকিছুই তাকে দিতে পারে তার ভাই অপু। অপু জানে হাউই কাকে বলে, অপু অনেক কিছু জানে। বাইরের পৃথিবী থেকে দুর্গার কাছে যৎসামান্য আলোটুকু এনে দেয় অপু।

বাবার বইপত্রগুলির উপরে তীব্র আকর্ষণ তৈরি হয় অপুরই। সে অর্ধেক সময় সেইসব বইয়ের মানে না বুঝলেও নিয়ে নাড়াঘাঁটা করে। 'মহাভারত', 'সর্বদর্শন সংগ্রহ', 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'চরিতমালা', পুরনো 'বঙ্গবাসী', অন্যের বাড়ি থেকে চেয়ে আনা 'পদ্মপুরাণ', যখন যা হাতের কাছে পেয়েছে, তাই নিয়েই অপু পড়তে বসে গিয়েছে। নাই বা থাকুক কোনও বইয়ের সঙ্গে অপর বইটির সাদৃশ্য। এ অভ্যাস অপুর বরাবর থেকে গিয়েছে। এ আর কিছু না, অচেনাকে চেনবার সুতীব্র আগ্রহ ছাড়া।

এমন করেই একদিন 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' থেকে সে জানতে পেরে যায় উড়বার কৌশল। এই প্রণালীর সত্যতা, বিশ্বস্ততা নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় না রেখেই সে মরিয়া হয়ে ওঠে শকুনের ডিম খুঁজে পাবার জন্য। শকুনের ডিমে পারদ পুরে তা মুখে নিলেই তো আকাশে ওড়া হাতের মুঠোয়, তখন অপুকে আর পায় কে! অপু সব উপকরণ বহু মূল্যবান স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে জোগাড় করে ফেললেও, মা-দিদির নির্বুদ্ধিতায় সব জলে যায়। এ তাদের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' না পড়বার ফল ছাড়া আর কী!

শিশুরা সাধারণত তাদের পুতুল হাতছাড়া করতে চায়না, অপুর পুতুল ছিলনা, কিন্তু কড়িগুলো ছিল তার প্রাণ। উড়বার সম্ভাবনার আহ্লাদে সে সেইসব কড়ি দিয়ে দিতে পারে। ওড়ার সঙ্গে বেগুনবিচি খেলবার কোনও তুলনা হয় না। অপুর কাছে আকাশ আর মাটির কোনো তুলনা হয়না। শূন্যমার্গে বিচরণের ইচ্ছে তাকে পাগল করে দেয়। দুর্গা বাঁচে মাটিতে, আর অপু আকাশে বাঁচতে চায়। অপু আক্ষরিক অর্থে একালের

আধুনিক মানুষ। দিদি তার এই আকাশভ্রমনবাসনাকে পাত্তা না দিয়েই, নিজের পাতের একমুঠো ভাত নিয়ে ভুলো কুকুরকে দেয়। দিদির কুকুরকে ভাত খাওয়ানোয় কী আমোদ অপু বুঝতে পারে না, সে শীর্ণ কুকুরের দিকে তাকিয়েও দেখে না, সে এসব মেয়েলী আমোদ ভালোবাসেনা। সে কেবল শকুনের ডিমের কথাই ভাবে। কী দুর্ভাগ্যজনক সেই সময়, যখন শিশুরাও জেনে যায় যে কোন আমোদ মেয়েলি এবং কী পুরুষালি, অপু আর দুর্গা তা চেতনে-অবচেতনে জানে।

দুর্গার আনন্দের আরেকটা ছবি পাওয়া যায় চড়ুইভাতির দিনে। একটি মেয়ে বিনি, ভারি গরীব, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-কন্যা। কেউ জল দিতেও তাকে রাজি হয় না, কেউ খেলতে নেয় না। দুর্গা-অপু এসব শেখেনি, ভালোবেসে তারা ডেকে নেয় বিনিকে। এইখানে গ্রামের অন্যান্য কিশোরী মেয়েদের মেয়েবেলা থেকে দুর্গার মেয়েবেলা অন্য, সাধারণত গ্রামের মেয়েরা এই বয়স থেকেই আয়ত্ত করে নেয় জাত-ধর্ম কেন্দ্রিক ঘৃণার মন্ত্রগুলিকে। দুর্গা সেসব নিয়ে ভাবিতই নেই। আনন্দ সে দ্বিধাহীনভাবে ভাগ করে নিতে চায়, ভাগ করলে তবেই তার আনন্দ বেড়ে যায়।

ওদের খাদ্য-তালিকায় সেদিন ছিল ভাত এবং সম্পূর্ণ নুন ছাড়া বেগুনভাজা। আগেও তারা তাদের খেলাঘরে মিছিমিছি চড়ুইভাতি করেছে, কিন্তু সত্যি সত্যি এই প্রথম। সামান্য তেলে বেগুন ভাজতে ভাজতে যখন তার রঙ বেশ বেগুনভাজার মতই হয়ে পড়ে, তখন ভাই-বোনের বিস্ময়ের সীমা থাকেনা। এই সত্যিকারের বেগুনভাজা, এইটাই দুর্গার সৃষ্টিশীলতার সর্বোচ্চ সীমা, এটা পেরিয়ে সে কক্ষনো যেতে পারবেনা।

গ্রামে নীলমণি হাজরার যাত্রার দল এলে অপু সেইখানে গিয়ে দিবারাত্র পড়ে থাকে, উত্তেজনায় তার চোখের ঘুম উড়ে যায়। তাকে কেউ যাত্রা দেখতে যেতে বাধা দেয়না। কিন্তু বাধা আসে দুর্গার পথে। সে বড় হচ্ছে, তার উপরে নেহাত নির্লজ্জ মেয়ে, গ্রামের লোকে এসব ভালো চোখে দেখে না। তবু যাত্রা দেখতে পারে দুর্গা চিকের আড়ালে বসে। রাজপুত্র অজয় আর রাজকুমারী ইন্দুলেখার কাহিনি দেখতে দেখতে অপু বিহ্বল হয়ে পড়ে। সেখানে রাজকুমারী তার ভাইটিকে বাঁচাতে গিয়ে, বিষফল খেয়ে মারা যায়। ইন্দুলেখা কে নিজের দিদি দুর্গা ছাড়া কিচ্ছু ভাবতে পারেনা অপু। সেই রাজপুত্র অজয়, যাত্রার দলের অপুরই বয়সী ছোট্ট ছেলেটি সর্বজয়ার কাছে ভাত খেতো। দুর্গা তাকে নিজের ভাইটির মতই দেখেছে। তাকে সে তার পিসিমার কথা বলেছে। পিসিমার কথা এ সংসারে আর কেউ বলেনা দুর্গা ছাড়া, অপু তো তাকে চেনেই না। দুর্গা তার শৈশব

পেরিয়ে কৈশোরের শেষ দিনটি পর্যন্ত সহায়সম্বলহীন বুড়ি পিসিকে বুকে বহন করে বেড়িয়েছে।

এই যে এতো ঘনঘন অপুর জন্য মনকেমন, গ্রামের পথ-ঘাটের জন্য মনকেমন, দুর্গার মনে মৃত্যুর আগে বারেবারে এই বিদায়গাথা আগমনী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আস্তে আস্তে উপন্যাসে দুর্গার মৃত্যুলক্ষণ তার শরীরে ধরা পড়তে থাকে। জ্বর আসে ঘুরে ফিরে। লেখক নানান ঈঙ্গিতের মাধ্যমে কিশোরী মেয়েটির চিরবিদায়ের জমি প্রস্তুত করতে থাকেন।

একবার এরই মধ্যে কোত্থেকে এক বুড়ো বাঙাল মুসলমান রঙচঙে টিনের বাক্স নিয়ে আসে খেলা দেখাতে। একে একে সব দুর্গার বয়সী ছেলেমেয়েরা দেখে যায় সেই খেলা। চোঙের মধ্যে চোখ লাগালে নাকি পৃথিবীর বিস্ময় এসে ধরা দেবে। দুর্গার কাছে যথারীতি পয়সা না থাকায় সে খেলা দেখতে পারে না। শেষে সেই বৃদ্ধ মুসলমানের আহ্বানে শেষপর্যন্ত দেখা হয় সেই মহার্ঘ বস্তু।

> দুর্গা মাথার উড়ন্ত চুলের গোছা কানের পাশে সরাইয়া দিয়া চাহিয়া দেখিল। পরের দশ মিনিটের কথার সে কোন বর্ণনা করিতে পারে না। সত্যিকারের মানুষ ছবিতে কি করিয়া দেখা যায়? কত সাহেব, মেম, ঘরবাড়ি, যুদ্ধ, সে সব কথা সে বলিতে পারে না! কি জিনিসই সে দেখিয়াছিল!
>
> অপুকে দেখাইতে বড় ইচ্ছা করে, দুর্গা কতবার খুঁজিয়াছে, ও খেলা আর কোনও দিন আসে নাই।[১০]

এইটুকুই দুর্গার পৃথিবী ভ্রমণ। সে এই গ্রামের বাইরে কোনওদিন আর বেরোবে না। এইটুকুতেই তাকে মিটিয়ে ফেলতে হবে তার এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের পৃথিবী দেখবার সাধ। অপুর সেদিনটায় দেখা হয়নি সেই আজব খেলা। দুর্গাও এ লোককে আর কখনো খুঁজে পায়নি। আসলে অপু তো সত্যি সত্যি পৃথিবী ঘুরবে। নিজের চোখে সামনে দেখবে এসব জিনিস। কী লাভ তার বাক্সবন্দি ছবি দেখে?

বাবা হরিহরের অনুপস্থিতিতে আজকাল অপুকে খুঁজে পাওয়া দায়। পুরোনো বই-দপ্তরে ঘুণ ধরে যায়। সকালে বেরিয়ে ফিরতে সে মহা দেরি করে। তার মা তাকে বকে, কিন্তু অপু কতদিন পড়বে এসব বহুবার পড়া বই! এসব পড়তে তার আর ইচ্ছে করে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'চরিতমালা' পরে সে যাঁদের কথা জেনেছে, অপু তাঁদের মতন হতে চায়।

> হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষপালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছা বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত- সে ঐ রকম হইতে চায়।... 'বীজগণিত' কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মতো। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভালো লাগে না। ঐরকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, বড় বড় বই পড়িবে, পন্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সেসব জিনিস? কোথায় বা 'ভূচিত্র', কোথায় বা 'বীজগণিত', কোথায়ই বা ল্যাটিন ব্যাকরণ?- এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা, আর তৃতীয় নামতা।
>
> মা বকিলে কি হইবে, যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?[১১]

অপু যা পড়তে চায়, জানতে চায়, দেখতে চায়; তা জুগিয়ে দেবার সাধ্য গ্রামের পাঠশালার আর বাবার গুটিকয়েক বইয়ের নেই। প্রবল, প্রবলতর তার জানবার খিদে। সে নেশাই তাকে পথে বের করতে চায়। সেই দিকটিকে পরিপূর্ণতা দিতে, অপু একঘেয়ে ঘেরাটোপের নিশ্চিন্ততা থেকে, অজানাকে জানবার বিপুল আনন্দযজ্ঞে এনে দিতেই তো দুর্গার মৃত্যু। দুর্গার মৃত্যুই হরিহরের পরিবারের কাশী যাওয়াকে ত্বরান্বিত করে। দুর্গার মৃত্যু অপুকে নির্মাণের সোপান বৈ আর তো কিছু নয়।

দুর্গার মৃত্যুর ঠিক আগের কয়েকটা দিন প্রবল বৃষ্টি নামে। হরিহর এসময় বাড়িতে নেই। দারিদ্র প্রবল। সামান্য ভাত জোগাড় করতে সর্বজয়াকে নাজেহাল হয়ে উঠতে হয়। বাড়ির চাল ফুটো হয়ে বৃষ্টির জলে বিছানা ভিজে যায়, ভিজে যায় সন্তানদের ঘুমন্ত দেহ। বারেবারে এই বৃষ্টি ভিজেই দুর্গার রোগের বিরাম হয় না কিছুতেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার মৃত্যুর ঠিক আগে আগে মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে পথের পাঁচালী তো কোনও বানিয়ে তোলা গল্প নয়, এতো গরিব মানুষের রোজকার জীবনের কথা। গল্পের বইতে, ছায়াছবিতে মৃত্যুমুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টির দাপট চরমে ওঠে, বাতি নিভে যায় ধড়ফড় করে। কিন্তু বাস্তবে রোদ ওঠে, প্রকৃতি হেসে ওঠে নিজের মত। সব, সবকিছুই চলে যথাযথভাবে, প্রকৃতিতে কিচ্ছু পালটায় না আর, কেবলমাত্র এতোদিন পর্যন্ত যে মানুষ প্রবলভাবে ছিল, সে চিরকালের মত 'নেই' হয়ে যায়। যাতে

থাকার মধ্যে, ঘননীল রৌদ্রপূর্ণ শরতের আকাশের মধ্যে, উৎসবের মধ্যে তার অনুপস্থিতি আরও প্রকট হয়ে ওঠে। কয়েকটা মাত্র দিন পরে হরিহর ফিরে আসে, তার হাতে অল্প কিছু টাকা এসে সংসারের বিশৃঙ্খলা কিছুটা দূর হয়, কেবল বাড়ি, গাছপালা, ভাই আঁকড়ে ধরে থাকা মেয়েটি সবার থেকে বহুদূরে চলে যায়। মৃত্যুর আগের দিন যে তার ভাইকে বলেছিল, "আমায় একদিন তুই রেলগাড়ি দেখাবি?"...

> দুর্গা আর চাহিল না।
>
> আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে- পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে- পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে- দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে![১২]

দুর্গার মৃত্যুর এমন অনুচ্চকিত, তীব্র বর্ণনা পাঠককে অভিভূত করে দেয়।

গ. হরিহরের মৃত্যু :

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অপুর পড়া বেড়ে যেতে থাকে। অপু বড় হয়ে ওঠে একটু একটু করে। তার সেই বড় হবার জগতটি একান্তই তার। মা, বাবা, দিদি'র বোধের বাইরে সেই জগৎ তার মধ্যে এক নামহীন উত্তেজনা এনে দেয়। মাঠের পুকুরে মাছ পাহারা দেবার বদলে সতু তাকে বই পড়তে দিতে রাজি হয়। তার জন্য পুকুরপাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকবার কষ্টকে গ্রহণ করা অপুর পক্ষে কোনো ব্যাপার নয়, পড়বার জন্য সে বহু কষ্ট সহ্য করতে রাজি।প্রতিদিন দুপুরবেলা সতুদের বাড়ির আলমারি থেকে বেছে এক-একখানি করে বই চেয়ে নিয়ে বাঁশবনের ছায়ায়, শ্যাওড়াগাছের কাঁচা ডাল পেতে তার উপরে উপুড় হয়ে অপু একমনে পড়ে। দেখতে দেখতে পড়া হয়ে যায় 'প্রণয়-প্রতিমা', 'সরোজ-সরোজিনী', 'কুসুম-কুমারী', 'সচিত্র যৌবনে যোগিনী নাটক', 'দস্যু-দুহিতা', 'প্রেম-পরিণাম বা অমৃতে গরল', 'গোপেশ্বরের গুপ্তকথা'... আরও নানান বই।

ছোটবেলাতে বাবার শিষ্যবাড়ি গিয়ে লুচি থেকে তার মনের মধ্যে লুচি-লুচি উত্তেজনা জেগে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে তার মনখারাপও হয় দিদি এ স্বাদে বঞ্চিত হল বলে। একটু বড় হয়ে খবরের কাগজের মোড়কে 'বঙ্গবাসী' দেখে তার মনে ঠিক একইভাবে ধ্বনিত হয়ে ওঠে খবরের কাগজ-খবরের কাগজ! লুচি থেকে খবরের কাগজ, তার দিদি সবকিছুর স্বাদ থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়। এরই মধ্যে অপুর জীবনের প্রথমবার একলা

বিদেশ যাওয়ার ঘটনা ঘটে। দূর বিদেশ না, নেহাত তাদের গ্রামের কাছেই গঙ্গানন্দপুর। কিন্তু এই প্রথম গ্রামের বাইরে একা বেরোয় অপু, তার সেই বড় হয়ে যাবার রোমাঞ্চের কাছে দুরত্বের ক্ষুদ্রতা পাত্তা পায় না। দিদির মৃত্যুতে অপুর মনখারাপ হয়েছে; কিন্তু সেই মনখারাপ, অপুর বিস্ময়বোধ ও অফুরন্ত আনন্দের আস্বাদগ্রহণে বাধা হয়নি। অপু বড় হবার পথে আরেকটি ধাপ এগিয়ে যায় সেই দিনটিতে, যেদিন অপু খবর পায় তার ছেলেবেলার আতুরী ডাইনি চড়কের দিনে মরে গিয়েছে- তবে তো তাকে ডাইনি বলা যায়না, সেও যে তার দিদির মতই মরে যায়।

> মনে আছে একবার অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সে খানিকক্ষণ জাগিয়া ছিল। দূরে নদীতে অন্ধকার রাত্রে জেলেদের আলোয় মাছধরা দোনা-জালের একঘেয়ে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। এমন সময় তাহার কানে গেল অনেক দূরে যেন কুঠির মাঠের পথের দিকে অত রাত্রে কে খোলা গলায় গান গাহিয়া পথ চলিয়াছে। কুঠির মাঠের পথে বেশি রাত্রে বড় একটা কেহ হাঁটে না, তবুও আধঘুমে কতদিন যে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় অচেনা পথিক-কণ্ঠে মধুকানের পদ-ভাঙা গানের তানকে দূর হইতে দূরে মিলাইয়া যাইতে শুনিয়াছে- কিন্তু সেবার যাহা শুনিয়াছিল তাহা একেবারে নতুন। সুরটা সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই- আধ-জাগরণের ঘোরে সুষমাময়ী সুরলক্ষ্মী দুই ঘুমের মাঝখানের পথ বাহিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কোনোদিন আর তাহার সন্ধান মিলে নাই- কিন্তু অপু কি তাহা কোনোদিন ভুলিবে?[১৩]

সে গানের সুর অপুর পক্ষে ভোলা সম্ভব ছিল না। কোন পথিক গভীর রাত্রে, অপুর আধো-ঘুম আধো-জাগরণে, পথ দিয়ে যেতে যেতে, অচেনা সুরে ডাক দিয়ে গিয়েছিল। অপু সেই পথের ডাক উপেক্ষা করে, এমন সাধ্য তার ছিল না।

কাশী যাবার আগে অপুর গ্রাম ছেড়ে যাওয়া বিষয়ে মনের মধ্যে ভারি দোলাচল সৃষ্টি হয়। কতবার মনে হয়েছে তাদের দেশ এই নিশ্চিন্দিপুর কত সুন্দর। সেখানে কি আর দাওয়ার পাশে এমন নারিকেল গাছ আছে? মাছ ধরা, আম কুড়োনো, নৌকা বাওয়া, রেল রেল খেলা, রানু দি, পটু কিচ্ছু নেই সেখানে। “এই তো বেশ ছিল তাহারা, কেন এসব মিছিমিছি ছাড়িয়া যাওয়া?” কিন্তু তা মোটেও মিছিমিছি ছিল না, ভবিষ্যতে অপু যতবার পিছনের দিকে ফিরে তাকিয়েছে, প্রতিবার, সেই তার জীবনে প্রথমবারের মতন নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে বেরিয়ে আসবার অসীম মূল্য তার জীবনে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সেই ছিল তার জীবনের প্রথম বাঁকবদল। নিশ্চিন্দিপুরে থেকে গেলে যে গতানুগতিকতা থেকে বেরনো প্রায় অসম্ভব ছিল।

দুর্গার যে রেলগাড়ির লাইন পর্যন্ত দেখা হয়নি, সেই রেলগাড়ি চড়ে কাশী পৌঁছে যায় অপু। সারারাত উত্তেজনায় ঘুম হয়না। শুধু নিশ্চিন্দিপুর থেকে চিরকালের মতন চলে যাবার সময় অপুর মনে হয় দিদিকে সে ভোলেনি, সে যেতে চায়নি সত্যি। 'ওরা' তাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে, "আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি- ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে-"

এরপরে লেখক লেখেন সেই আশ্চর্য বাক্যগুলি, যেখানে তিনি জানান সত্যিই অপু তার দিদিকে ভোলেনি। বর্হিজগতের প্রকৃতির সঙ্গে তার উত্তরজীবনে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। প্রকৃতির মধ্যে সেই মুগ্ধতার মুহূর্তে গ্রামের পাড়াগাঁয়ের রোগশয্যায় শায়িত একটি করুণ মুখের কথা সে কখনো ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি সেই সরল, দুর্বল, নির্ভরশীল শব্দ কয়টি, "-অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?" তবে এর ঠিক পরের বাক্যেই লেখক ভবিষ্যতের দিনগুলি থেকে পিছিয়ে ফের ফিরে আসেন বর্তমানে যেখানে অপু সবেমাত্র নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলেছে।

> মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।[১৪]

উপন্যাসের জাদু এইখানেই লুকিয়ে রয়েছে। যে আবেশ পাঠককে মোহিত করে রাখে, তাকে ভেঙে দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে সহজে চলে যান লেখক। এখানেই তাঁর লেখার সৌন্দর্য। এ লেখা চূড়ান্ত গতিময়।

এরপরে হরিহর, সর্বজয়া, অপু'র কাশী জীবনের শুরু। 'আম আঁটির ভেঁপু'র নিরাপত্তা, ছায়া ঘেরা পথ পেরিয়ে 'অক্রুর সংবাদ' এসে পড়ে। তার বাইরের পৃথিবীর ডাক।

অপুরা, হিসেব করলে দেখা যায়, কাশী যায় খুব সম্ভবত বৈশাখ মাসে। কারণ ঠিক কাশী যাবার আগে আগে নিশ্চিন্দিপুরে চড়কের মেলা হয়ে যায়। চড়ক হয় চৈত্রের শেষ দিনে। সেই বৈশাখ পেরিয়ে সে বছরের মাঘী পূর্ণিমার পরে হরিহরের মৃত্যু হয়। মোটামুটিভাবে ন-দশ মাস ছিল অপুদের কাশী থাকবার সময়কাল। এই কয়েকটি মাসে হরিহর, সর্বজয়া জীবনে প্রথমবার, বস্তুত শেষবারও কিছুটা হলেও সাচ্ছন্দ্য'র মুখ দেখে। উপন্যাস হিসাবে এ অংশের আরেকটি গুরুত্ব হল এখানে প্রথম আমরা হরিহরকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে দেখবো। কাশীতে এসে হরিহরের আয় বাড়ে। এই প্রথম অপু ইস্কুলে ভর্তি হল। সর্বজয়া এই প্রথমবারের জন্য মিষ্টি কিনে, পায়েস করে ছেলেকে খাওয়াতে পারে। স্বামীকে অল্প তিরস্কারও করে। এবং হরিহরও তার

স্ত্রী'কে ভয় পায় খানিক। হরিহর এসময়টা আবার তার যৌবনে বাধ্যত পরিত্যক্ত দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ধ্রুবচরিত্র ছেড়ে অন্য পালা লেখবার কথা ভাবে। সে ভাবে, কী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তার সামনে, সকলে তার সমাদর করছে কেমন। কী অসামান্য জীবন্ত হয়ে ওঠে হরিহর এসময়টায়, কারণ এইবার তার সময় ফুরোতে চলেছে। সারা উপন্যাস জুড়ে প্রান্তিক একটা চরিত্র হঠাৎ-ই জীবনের কেন্দ্রে চলে আসে। আর মৃত্যু যত কাছে এগিয়ে আসে, তত যে জিনিসটি বেড়ে উঠতে থাকে, তা হল হরিহরের বাৎসল্য। কাশীতে এসে বাবা ছেলের সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে তোলেন লেখক। ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হলে তার ছাপানো লেখা দেখবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে বাবা হরিহর।

এই কাশীতে এসে অপু'র সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বাঙাল কথক ঠাকুরের। অপু বুঝতে পারে বাঙাল কথক ঠাকুর কী ভীষণ অভাজন। কথক ঠাকুর নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে যে লাড্ডু অতি লোভের সঙ্গে ভালোবেসে খায় ছেলেমানুষ, গরিব অপু, জীবনে কখনো ভালোমন্দ খেতে না পাওয়া অপুর চোখেও এমনকী সে লাড্ডু ছিল শক্ত, বিস্বাদ। মোটের উপর ভালো খেতে নয়। সেই কথকঠাকুর বৃদ্ধ বয়সে নতুন করে সংসার পাতবার স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরে যায়। কে জানে তার সেই অবাস্তব স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে কী না, কিন্তু তার সূত্র ধরে আরেকজনও স্বপ্ন দেখতে শুরু করে,

> হরিহরের মনে হইল বাইশ বৎসর পূর্বে সে যাহা করিতে দেশে গিয়াছিল- এ ব্যক্তি তাহার বর্তমান বয়সের চেয়েও আট বৎসর বেশি বয়সে তাহাই করিতে অর্থাৎ নূতন করিয়া সংসার পাতিতে দেশে চলিয়াছে। সুতরাং তাহারই বা বয়সটা এমন কি হইয়াছে? কোন্ কাজ করিবার সময়ের অভাব হইতে পারে তাহার?[১৫]

কিন্তু সময়ের অভাব যে তার বড্ড, সময় ফুরোনোর স্টপ্ওয়াচ যে চালু হয়ে গিয়েছে তা সে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেন হয়তো পাঠক, যে চরিত্রের উপরে আলো এসে পড়েছে যখন সবচাইতে বেশি, যে চরিত্র অপুর মনের কাছটিতে এসে পৌঁছেছে যখনই, যার উপরেই অপু কিছুটা হলেও অবলম্বন করতে শুরু করেছে, তাকে ঠিক জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে সরিয়ে ফেলেছেন লেখক। অপুকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবার পথে মৃত্যু ছড়িয়ে রেখেছেন দু'হাত ভরে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তবু হরিহর স্বপ্ন দেখে। জীবনে নানান প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও যখন একটু ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে আলো, তাঁর চরিত্ররা স্বপ্ন দেখতে পিছপা হয়নি।

মৃত্যুর আগে আগে হরিহরের কাছে অপু ইস্কুলের কাগজে তার লেখা ছেপে বেরনোর জন্য দুটি টাকা চায়, তারপরে আরও দুটি। স্ত্রী'কে লুকিয়ে হরিহর ছেলের সে সাধ পূরণ করে। বলে দেয় "মা কে যেন বলিস না"। অভাবের সংসারে, অসুস্থ হরিহরের অল্প কদিনের সচ্ছলতা দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। ছেলের প্রথম মুদ্রিত দেখবার সুযোগ হরিহরের আর হয়না।

তারপরে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে যা এই গরিব বাঙালি পরিবারের জীবনে সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব ছিল। কাশীতে তাদের বাসার উপরের তলার বাসিন্দা নন্দবাবু হরিহরের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সর্বজয়া'র সঙ্গে এমন আচরণ করে যা নিশ্চিন্দিপুরে সর্বজয়ার জীবনে অভাবনীয় ছিল। নিশ্চিন্দিপুরে দারিদ্র ছিল, অপমানও ছিল কিন্তু এমন গভীর একাকীত্ব আর নিরাপত্তাহীনতার ভয় সেখানে ছিল না। সর্বজয়ার পুত্র অপু একটু বড় হলেও তার শিশুমন এসব জটিলতা থেকে বহু দূরে। মা'কে এইসব অযাচিত বিপদ থেকে রক্ষা করার মতন বড় সে তখনো হয়নি। যদিও শেষপর্যন্ত কোনওদিনই অপু সেভাবে মা'কে আগলে তার পাশে বসে থাকেনি।

কিছুদিন অসুস্থতার পরে, প্রায় বিনা চিকিৎসায় হরিহরের মৃত্যু হয়। মৃত্যু'র রাত্রিটিতে হরিহরের গলা দিয়ে কেমন আশ্চর্য শব্দ বের হতে থাকে। চৈতন্য থাকেনা। হঠাৎ চোখ খুলে অপুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কী যেন বলে, অপু বুঝতে পারেনা। তারপর দুইহাতে অপুর মুখটি ধরে তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। অপু বাবার এই অচেনা চোখের দৃষ্টি দেখে অবাক হয়ে যায়। শেষরাত্রে চারটে'র সময় হরিহরের মৃত্যু হয়। এর বেশ কয়েকবছর পরে, অপু যখন দেওয়ানপুরের ইস্কুলে পড়ে, একদিন একটা লোককে দেখে হঠাৎ-ই তার অনেক দিন আগে মারা যাওয়া বাবার কথা মনে পড়ে যায়। বাবার গলায় একটি শ্লোক অপু শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিল, "কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী.../ লোকাঃ সন্তু নিরাময়ঃ..."।

বিভূতিভূষণ মাত্র একটি বাক্যে হরিহরের মৃত্যু বর্ণনা করেন। শান্ত সে বর্ণনা। অপু কার্যত একা কিছু অচেনা মানুষের সঙ্গে শ্মশান যায়। এই যে অপু'র ছবি তৈরি হয় এইখানে, সে অপু'কে আমরা আগে দেখিনি। এগারো-বারো বছরের অপু। তার নিজস্ব একটা 'আমি' তৈরি হচ্ছে। যদিও এখও তার আত্মপরিচয় তৈরি হয়নি তবুও একটা বোধ তৈরি হচ্ছে। সেই বোধ থেকে তৈরি হয় একধরণের প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটিকে ভাঙবার চেষ্টা করে, তা হল তাদের বাবা,

মা। অপুর কাশীতে তৈরি হওয়া বন্ধুমহলে নিজের, নিজের পরিবারের আপাতক্লিষ্ট পরিচয় নিয়ে অপু মধ্যে একধরণের গ্লানিবোধ তৈরি হয়। অন্যদের সঙ্গে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার এই যে তফাৎ, তারা যে গরিব, এ বোধ অপুর নিশ্চিন্দিপুরে থাকাকালীন তৈরি হয়নি। দশাশ্বমেধ ঘাটে তার কথক বাবা তাকে ডাকলে, সে সন্তর্পণে তার পিতৃপরিচয়টি এড়িয়ে যায় বন্ধুদের কাছে। তার এই আত্মপরিচয়ের সংকট এই প্রথম, ঘটনাক্রমে বন্ধুরাও অল্পবয়সী, তাই তারা অপুর কথার অন্তর্লীন মিথ্যা ধরতে পারে না। রোগশয্যায় শুয়ে থাকা হরিহরের ইচ্ছে করতো ছেলেকে কাছে পেতে। অপুর কিন্তু এই অসুস্থ বাবার পশে বসে থাকতে ভালো লাগতো না, নিছক চক্ষুলজ্জাবশত সে বসতো অল্প সময়। এই জগৎ অপুর বানিয়ে তোলা জগৎ, নিশ্চিন্দিপুরের জগৎ ছিল পেয়ে যাওয়া।

অপু সারাজীবনের সব মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে অত্যন্ত শান্ত ভাবে, যন্ত্রণা হলেও সে মেনে নিয়েছে সহজভাবে। বাবার মৃত্যুর পরে সে যা মানতে পারেনি তা হল বাবার এই জীবনযুদ্ধে পরাজিত চেহারা। এ বাবা তার সারাজীবনের পরিচিত বাবা নন।

> যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল,- রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র- অপু তাহাকে চেনে না, জানে না- তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মতো কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আশীর্বাচন গান করিতেছে-
>
> কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...
>
> লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।[১৬]

ঘ. সর্বজয়ার মৃত্যু :

এরই অল্প কয়েকমাস পরে দারিদ্রে, অসহায়তায় জর্জরিত সর্বজয়া ছেলেকে নিয়ে বর্ধমানে এক অতি ধনী পরিবারে, রাঁধুনি'র কাজ নিয়ে চলে যায়। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি দিন বাড়ির গৃহিনীর কাছে, সদ্য স্বামীহারা ব্রাহ্মণগৃহিনী হবার কারণে কিঞ্চিৎ সমাদর থাকলেও অল্প দিনে সেই ব্যবধান ক্রমশ হ্রাস পেয়ে সর্বজয়াও বাড়ির অন্য সব পরিচারিকাদের স্থানই গ্রহণ করে।

বর্ধমানের সেই বদ্ধ ঘরে অপুর জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, শহরের লোকাধিক্য তার ভালো লাগেনা। পাড়ার ইস্কুলে ভর্তি হয় যদিও আবার অপু এসময়ে। যে অপুকে তার বাবা-মা

কেউ কক্ষনো মারেনি, যে অপু চিরদিন সবার আদরের, যে অপু হাজার দারিদ্রেও অমলিন জীবনে অভ্যস্থ ছিল, সে অপু এক উঠোন লোকের সামনে প্রায় বিনা কারণে মার খায়, যারা তাকে মারে, তারা কী জানবে যে অপু আজও বেশি বড় হয়নি, সে মুখচোরা কিন্তু সে খেলতে ভালোবাসে, সে সিগারেট খায় ঠিকই, কিন্তু তা নেশা করবার জন্য নয়। রাঙা জামা গায় বার্ডসাই টানা কেমন অদ্ভুত, তাই সে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। সে তো জানতেই চায় সবকিছু। সে কোকেন কাকে বলে জানেই না। সে ছেলেমানুষ, অসহায়, মা-এর একান্ত আদরের। তবুও, এসবের পরেও, হয়তো এই বাড়িতেই সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম উপহারটির সন্ধান পায়। সে হল লীলা। যে লীলা আমৃত্যু বিন্দুমাত্র প্রতিদানের আকাঙ্খা না রেখে অপুকে ভালোবেসেছে।

ইন্দিরের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, আর মাত্র একটিবারের জন্য গোটা উপন্যাসে ইন্দিরের কথা আসে। সর্বজয়ার স্মৃতিতে। ইন্দিরের মৃত্যুর প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর পর এই জমিদার বাড়িতে এক বৃদ্ধাকে দেখে সর্বজয়ার মন বেদনায় ভরে ওঠে। হতভাগ্য ইন্দিরের মৃত্যু-মুহূর্তে আপনজন কেউ কাছে ছিলনা। শিশু দুর্গা ছাড়া কেউ তাকে মনে রাখেনি। এক চূড়ান্ত অসহায় করুণ মৃত্যু হয় ইন্দিরের। সর্বজয়ার অপমানেই একদিন তাকে ঘর ছেড়ে যেতে হয়।

> সর্বজয়ার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। এইমাত্র তাহার মনে পড়িয়াছে। অনেকটা এইরকম চেহারার ও এইরকম বয়সের- সেই তাহার বুড়ি ঠাকুরঝি ইন্দির ঠাক্‌রুন, সেই ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়া পরা। ভাঙা পাথরে আমড়া ভাতে ভাত, তুচ্ছ একটা নোনাফলের জন্য কত অপমান, কেউ পৌঁছে না, কেউ মানে না, দুপুর বেলায়, সেই বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া, পথে পড়িয়া সেই দীন মৃত্যু...
>
> সর্বজয়ার অশ্রু বাধা মানিল না।
>
> মানুষের অন্তর-বেদনা মৃত্যুর পরপারে পৌঁছায় কিনা সর্বজয়া জানে না, তবু সে আজ বার বার মনে মনে ক্ষমা চাহিয়া অপরিণত বয়সের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল।[১৭]

এর কয়েক বছর পরে সর্বজয়া অপুকে নিয়ে মনসাপোতা চলে যায়।

কিন্তু সেই মার খাওয়ার দিনটিতে সন্ধেবেলা অপু মনে মনে তার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাদের যেন নিশ্চিন্দিপুরে ফেরা হয়। সে তার আজন্মকালের নিশ্চিন্দিপুর ছাড়া বাঁচবে না। তারপরেই আছে পথের দেবতার সেই অমোঘ বাণী। যে বাণী এই বইয়ের একমাত্র সত্য। যে বাক্যগুলি ছাড়া অপুকে বোঝা সম্ভবই নয়,

পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন- মূর্খ বালক, পথ তো তোমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়। তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ার পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে... দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গন্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...

দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়... তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনও ফুরোয় না... চলে... চলে... চলে... এগিয়েই চলে...

অনির্বাণ সেই বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...

সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি!...

চল এগিয়ে যাই।[১৮]

দিনরাত্রি, মাস, বছর ছাড়িয়ে, মানুষের অল্প কদিনের জীবনের সীমা ছাড়িয়ে পথ এগিয়ে চলে সামনে। সে পথ চলে গিয়েছে অনন্তের দিকে। সেই অনন্ত পথের কিছুদিনের পথিক অপু। পথের দেবতা তারই অপেক্ষায় অনেক দিন বসে ছিলেন। দিলীপকুমার রায়ের এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

... মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে নাড়ীর টান, হৃদয়ের রসের সঙ্গে নীরবতার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, মনের কুঞ্জে ফুল ফোটানোর সঙ্গে শিশিরবর্শী অবসরস্নিগ্ধ সমাহিত জীবনের যে অপরিহার্য যোগসূত্র--- সে-সব কে কি নির্দয় হয়ে ছিন্ন না করলেই চলবে না? এই-ই কি এখনকার নিষ্করুণ যুগধর্ম্ম? শান্তির সঙ্গে গতির কি কোনও সন্ধি, কোন সামঞ্জস্যই সম্ভব হবে না? হতে পারে না? সৌন্দর্যের সঙ্গে বৈচিত্রের? মানুষের সঞ্চলমান জীবনের লক্ষশত নিত্য-নতুন দাবি-দাওয়ার সঙ্গে তার অন্তরতম অচঞ্চল রসদীপ্তির? 'পথের পাঁচালী'র কবি এ-সব প্রশ্নের সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাননি, 'বিচিত্র যাত্রাপথের অদৃশ্য তিলক' পথিকের 'ললাটে পরিয়েই' যাত্রা শেষ করতে চেয়েছেন। 'পথের দেবতা' যে আমাদের চিরদিন 'ঘরছাড়া করে'ই আনেন এই বারতা বহন করে এনেই তাঁর ছবিটির সমাপ্তি টেনেছেন। ঘরছাড়া মানুষ যদি পথের মরীচিকায় লুব্ধ হয়ে বেরিয়ে এসে পুনরায় তার ছায়ানিবিড় নীড়ে ফিরে যেতে চায় তাহলে তার গতি কী হবে সে-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি। তবে ঈঙ্গিতে জানিয়েছেন যে তাহলে তার গতিকটা বড় সুবিধের হবে না। কিন্তু বলা বাহুল্য এটা দুঃখবাদীর বিয়োগগাথা মাত্র। শিবনেত্রী দার্শনিকের প্রাতিভ জ্ঞান নয়। এখন দেখা যাক 'অপরাজিত'-এ কবি কী সুরে এর পরিণতি দেন?

> বস্তুত ‘পথের পাঁচালী’র সবচেয়ে দুর্বল স্থান বোধহয় তার শেষ কয়টি ছত্র--- যেখানে কবি তাঁর দৃষ্টির সম্বল ছেড়ে দার্শনিকের চিন্তায় সান্ত্বনা পেতে গিয়েছেন। তাই বলছিলাম ‘পথের পাঁচালী’র লেখক কবি--- দার্শনিক নন, স্রষ্টা--- গবেষক নন, চিত্রী--- ভাষ্যকার নন।[১৯]

দিলীপকুমার রায় যাকে ‘নিষ্করুণ যুগধর্ম’ বলেছেন, তা যে যুগধর্ম নয়, কেবল মৃত্যুর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ‘দুঃখবাদীর বিয়োগগাথা’ রচনা করাই তার উদ্দেশ্য ছিল না, বস্তুত অপুর জীবন পথের চলাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই সমস্ত মৃত্যুর আবশ্যকতা ছিল। তা যে কোনও উৎসাহী পাঠকই অনুধাবন করতে পারেন। সেই অপরিহার্য যোগসূত্র, তা ছিন্ন করবার মাধ্যমেই অপু চরিত্রের নির্মাণ দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। শান্তির সঙ্গে গতির কোনও বিরোধ নেই, এখানে মৃত্যুকে যদি শান্তির পরিপন্থী হিসাবে দেখা হয় তবে তা সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। অপুর জীবনে পরস্পর আসতে থাকা মৃত্যুগুলি তার গতির ক্ষেত্রে ভীষণ প্রাসঙ্গিক হয়েছে। এই উপন্যাসের শেষ কয়েকটি ছত্র, যাকে দিলীপকুমার এই উপন্যাসের ‘সবচেয়ে দুর্বল স্থান’ বলেছেন, তার মধ্যেই ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের মূল নির্যাস এবং ‘অপরাজিত’র গতিপথের ঈঙ্গিত নিহিত আছে।

২৫শে আশ্বিন, ১৩২১ সালে, একই দিনে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন দুটি গান।[২০] গান দুটি হল “ওগো পথের সাথি, নমি বারম্বার...” , এবং অপরটি “পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে...”।

সম্পূর্ণ গান দুটি তুলে দেয়া হল,

১. ওগো, পথের সাথি, নমি বারম্বার।

পথিকজনের লহো লহো নমস্কার।।

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি,

ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।।

ওগো নব প্রভাতজ্যোতি, ওগো চিরদিনের গতি,

নব আশার লহো নমস্কার।

জীবনরথের হে সারথি, আমি নিত্য পথের পথী,

পথে চলার লহো লহো লহো নমস্কার।।[২১]

২. পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,

পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে

তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।।

চায় না সে জন পিছন-পানে ফিরে,

বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,

তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে

যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া।।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,

পথিকচিত্তে তোমার তরী বাওয়া।

দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে

তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,

রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,

যাবার লাগি মন তারি উদাসে-

যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।।[২২]

আশ্চর্যজনকভাবে একই দিনে রচিত রবীন্দ্রনাথের এই দুটি গানে ‘পথের পাঁচালী’ (এবং পরবর্তীতে ‘অপরাজিত’র) মূল সুর ধ্বনিত হতে দেখতে পাই। ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’ যে ‘পান্থজনের সখা’র কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, বিভূতিভূষণ-কথিত ‘পথের দেবতা’ হয়তো তাঁরই রূপান্তর। যে ‘পথের সাথী’ ‘পথিকজনের নমস্কার’ পান---যিনি একই সঙ্গে ‘বিদায়’ এবং ‘ক্ষতি’ তথাপি ‘দিনশেষের পতি’, ‘নিত্য পথের পথী’র কাছে যিনি জীবনরথের সারথী, তিনিই যেন ‘বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক’ অপুর ললাটে পরিয়ে তাকে ঘরছাড়া করেছেন।

এইখানেই ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। ‘অপরাজিত’ উপন্যাসের শুরুর দিকে অল্প কয়েকটি দিন এই বাড়িতে কাটিয়ে অপু আর সর্বজয়া চলে যান মনসাপোতা।

এই মনসাপোতায় আসবার পরে সর্বজয়া আবার নিজের সংসারের কর্ত্রী হয়। শুধু দুই জনের সংসার। তবে আগের কয়েকবছরের চূড়ান্ত পরাধীনতার জীবন কাটিয়ে সর্বজয়া আবার কিছু ফেলে আসা স্বাধীনতার স্বাদ পায়। সর্বজয়ার চরিত্রের একটি দিক এইখানে আলোচনা প্রয়োজন। যে দিকটির জন্যই এই চূড়ান্ত দারিদ্রের সংসারে, এক সন্তানের মৃত্যুর পরে, স্বামীহারা হয়েও একলা লড়াই করতে পেরেছে।

তা হল সর্বজয়ার চূড়ান্ত আশাবাদ। সেই আশা, সেই স্বপ্নে ভর করে সর্বজয়া পেরিয়ে গিয়েছে জীবনের নানান দুঃসহ যন্ত্রণার দিন। বিবাহের পর-পরই তার স্বামী হরিহর তার নববিবাহিতা বধূকে ছেড়ে কোথায় চলে যায়। সর্বজয়া জানতো না তার স্বামী কোথায়, কবে ফিরবে, আদৌ কখনো ফিরবে কি না। সবাই করুণা করত। তবু সে ভরসা হারায়নি। একদিন না একদিন সে ফিরে আসবে, এই প্রত্যয় মনে আঁকড়ে রেখেছিল। তারপরে যে দিন হরিহর ফিরে আসে, সেই রাত্রে, তার স্বামীর সঙ্গে একান্তে কাটানো প্রথম রাত্রিতে সে ভাবে, এতদিনে তাহার দুঃখ ঘুচলো, ভগবান বোধহয় মুখ তুলে চাইলেন। সেই ছিল স্বপ্ন দেখার শুরু। দুঃখ সর্বজয়ার ঘুচেছিল অল্প কিছুদিনের জন্য, স্বামীর সঙ্গে নতুন সংসার, কন্যা, পুত্র। তবে দারিদ্র তাদের ছেড়ে থাকেনি একটি দিনের জন্যও।

দুর্গা-অপু খানিক বড় হলে একটা ঝাড় লণ্ঠনে ঝুলানোর কাচের টুকরো কুড়িয়ে পেয়ে দুর্গা তার মা কে দেখায়। বলা বাহুল্য, গ্রামের গরিব ঘরের ভাই-বোনের হীরক সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকায় প্রায় নিঃসন্দেহে এই জিনিসটিকে তারা হীরে ভাবতে শুরু করে। সর্বজয়ার, এমনকী হরিহরের ধারণাও তার ছেলেমেয়েদের তুলনায় খুব উন্নত কিছু ছিলনা। ফলত সেই দিনটিতেও সর্বজয়া প্রায় বিশ্বাস করে ফেলে এই টুকরোটি হীরেরই। ভগবান নিশ্চয়ই এতোদিনে মুখ তুলে...!

স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সর্বজয়া কখনোই তেমন সচেতন ছিল না, তবে সে এইটে বিশ্বাস করতো, খুব শিগগির কেউ বা কারা তার স্বামীকে ঠিক চাকরি দেবে। চাকরি কী ভাবে দেওয়া হয়, সে পদ্ধতি বিষয়েও সে অজ্ঞই ছিল। হরিহর, সর্বজয়া

দরিদ্রের দরিদ্র, ভালোমানুষের ভালোমানুষ। কত লোক তাদের ঠকিয়ে গিয়েছে বিভিন্ন উপায়ে। তবুও মানুষকে বিশ্বাস না করে তাদের উপায় ছিল না।

নীরেনের পরিবার, তাদের শিক্ষা, অর্থনৈতিক অবস্থা, এসবের সঙ্গে হরিহরের পরিবারের এবং দুর্গার কোনও তুলনা হতে পারে না। গোটা উপন্যাস জুড়ে নীরেন একটিবারও মুখে বলেনি যে সে দুর্গাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। কেবলমাত্র গোকুলের স্ত্রী'র মনে হওয়াকে মেনে নিয়ে সর্বজয়া দুর্গার একটা সুখী ভবিষ্যতের কল্পনা করতে থাকে। নীরনকে তার জামাই হিসাবে ভারি মনে ধরেছিল।

দুর্গার মৃত্যু, স্থানান্তরণ, স্বামীর মৃত্যু, বড়লোকের ঘরে সামান্য পরিচারিকার কাজ, কিছুই সর্বজয়ার আশাবাদকে দমিয়ে দিতে পারেনি। সে তার জীবনের একমাত্র সম্বল অপুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। তাদের অবস্থা ফিরে আসবে। আবার তারা নিশ্চিন্দিপুরের ভিটাতে বাস করবে। অপুর সুন্দর বধূ আসবে। আর কোনও অভাব থাকবে না। কেউ অপমান করবে না গরিব লোক বলে। সবাই সমাদর করবে। মনসাপোতায় এসে যখন ঠাকুরপুজো করতে গিয়ে অতি সুদর্শন, ছেলেমানুষ, উৎসাহী অপুর দিব্যি ডাক পড়তে থাকে নানান বাড়ি থেকে, তখন থেকেই এই ভাবনার শুরু। অপু, সর্বজয়ার এই ছেলেকে-ঘিরে ঠাকুর পুজো, অর্থ, সংসারের স্বপ্ন দেখাকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে পড়তে চলে যায় প্রথমে মামজোয়ান আর পরে দেওয়ানপুরের স্কুলে। পয়সার অভাবে বাড়ি আসাও হয়ে পড়ে খুব অনিয়মিত।

তবু ছেলের দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তার পরম বান্ধবহীন একলা জীবনে অপুর পথ চেয়ে বসে থেকেছে সে। সর্বজয়া কি সত্যিই জানতো না যে তার এসব অলীক আশা কখনই পূরণ হবার নয়? নাকি সব কিছু উপলব্ধি করেও সে স্বপ্ন দেখতো বেঁচে থাকবার জন্য? সম্পূর্ণ নিঃস্ব জীবনে এই স্বপ্নটুকুই ছিল তার শেষ কটি দিনের আশ্রয়স্থল। 'অপরাজিত' উপন্যাসে সর্বজয়ার সবচাইতে বড় বেদনা এই যে তার ছেলে বড় হয়ে যাচ্ছে। তার এখন আর মা এর জন্য মনকেমন করেনা। সে মা কে ভয় দেখিয়ে আর মজা পায়না। মা এর সঙ্গে খেলা করে আনন্দিত হয়ে ওঠেনা। যে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একটি জোরালো খুঁটি ছিল মা ও ছেলের অপূর্ব এক সম্পর্ক, এই উপন্যাসে তাই পর্যবসিত হয় ছেলে এবং মা'র গভীর দূরত্বে। যা একা সর্বজয়ার জীবনকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

হাইস্কুল থেকে কলকাতার কলেজে, নতুন বন্ধু, নতুন জীবন, দারিদ্র, প্রায়-অনাহার সত্ত্বেও লাইব্রেরি ভর্তি বই, নবলব্ধ বিস্ময়ের ভান্ডারের মধ্যে অপু যখন প্রবলভাবে জড়িয়ে রয়েছে; যখন সে নাম দিচ্ছে বক্তৃতায়, কলকাতাকে প্রাণ ভরে গ্রহণ করছে, মা'র কথা যখন তার মনে পড়ে ভারি কম, সেইসময় সর্বজয়া তার প্রত্যেকটা দিন কাটিয়েছে অপুর পথ চেয়ে। বহু ছুটির দিন কেটে গিয়েছে বৃথা অপেক্ষায়।

> কেবলই অপুর ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। অপু কথা বলিতে জানিত না, কোন্ কথার কি মানে হয় বুঝিত না। মনে আছে... নিশ্চিন্দিপুরের বাড়িতে থাকিতে একবার রান্নাবাড়ির দাওয়ায় কাঁঠাল ভাঙিয়া ছেলেমেয়েকে দিতেছিল। দুর্গা বাটি পাতিয়া আগ্রহের সহিত কাঁঠাল-ভাঙা দেখিতেছে, অপু দুর্গার বাটিটা দেখাইয়া হাসিমুখে বলিয়া উঠিল- দিদি কাঁঠালের বড় প্রভু না মা? সর্বজয়া প্রথমটা বুঝিতে পারে না, শেষে বুঝিয়াছিল, দিদি কাঁঠালের বড় 'ভক্ত' এ কথাটা বুঝাইতে 'ভক্ত' কথাটার স্থানে 'প্রভু' ব্যবহার করিয়াছে। তখন অপুর বয়স নয় বৎসরের কম নয় অথচ তখনও সে কাজে-কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষ।
>
> একবার নতুন পরনের কাপড় কোথা হইতে ছিঁড়িয়া আসিবার জন্য অপু মার খাইয়াছিল। কতদিনের কথা, তবুও ঠিক মনে আছে। হাঁড়িতে আমসত্ত্ব, কুলচুর রাখিবার জো ছিল না, অপু কোন ফাঁকে ঢাকনি খুলিয়া চুরি করিয়া খাইবেই। এই অবস্থায় একদিন ধরা পড়িয়া যায়, তখনকার সেই ভয়ে ছোট-হইয়া-যাওয়া রাঙা মুখখানি মনে পড়ে। বিদেশে একা কত কষ্টই হইতেছে, কে তাহাকে সেখানে বুঝিতেছে![২৩]

সর্বজয়া বুঝতে পারেনি তার সেই নিতান্ত মাতৃ ভক্ত ছেলেটি আর সেরকম ছোট্ট নেই। এখন সে আলাদা একটা সম্পূর্ণ মানুষ, চিরপথিক অপূর্ব কুমার রায়। অনেকদিন আগে তিনবছরের অপু একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বহুদূর চলে গিয়েছিল, রাস্তা থেকে দুর্গা তাকে খুঁজে আনে। সেইদিনকে সর্বজয়া তার স্বামীকে বলে যে এই ছেলে কোনোদিনও সংসারী হবে না। হরিহর সে কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সর্বজয়ার এই একটি বাক্য অপুর জীবনে অমোঘতম সত্যি হিসাবে ধরা দেয়।

ইতিমধ্যে কলকাতায় রিপন কলেজে ভর্তি হয় অপু।

কলকাতায় এই পড়াশুনার দিনগুলিতে অপুর চরম অর্থকষ্ট যায়। না খেয়ে, কখনও কেবল জল খেয়ে, কখনো একবেলা খেয়ে, দিনের পর দিন ভাতের পরিবর্তে ছাতু খেয়ে কাটাতে হয় দিন। টিউশনের মেয়েটির উদ্ধত ব্যবহারে সে টিউশন ছেড়ে দেয় অপু। মা'কে টাকা পাঠানো তো দূরের কথা, প্রায় সহায়-সম্বলহীন মা এর থেকে কয়েকবার একটি-দুটি করে টাকা নিয়ে এসেছে। অনিলের মৃত্যুর পরে মা এর জন্য মনকেমন

করায় অপু একদিন না জানিয়ে মনসাপোতা ফেরে সে। তার সেই সুন্দরী মা, যিনি তাকে সেই কোন জন্মের মুহূর্ত থেকে নিজের আঁচলে আগলে রেখেছেন, এখন তাঁরই বয়স হচ্ছে। অপুর ইচ্ছে করে নিজের সবল দৃঢ় বাহুবন্ধনে চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সব দুঃখ, বিপদের থেকে রক্ষা করে। অপু আসায় সর্বজয়ার জীবন কটা দিনের জন্য আবার আনন্দে ভরে ওঠে।

> অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায় সবই বদলাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব হাসি, সে ছেলেমানুষি, সে কথায় কথায় মান অভিমান, আবদার, গলার সে রিন্‌রিনে মিষ্টি সুর- এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্টি- তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য- পাগলামি- সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না কিন্তু অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব![২৪]

সেবারও সর্বজয়া তার সাধ প্রকাশ করে, নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা যদি অপু আবার কিনে নিতে পারে, অপুর ছেলেমানুষ বউ কে নিয়ে যদি সেখানে কটা দিন কাটানো যায়, আর একদিন কলকাতা গিয়ে মা-কালীর চরণ দর্শন। সামান্য সাধ, তবু সেই সাধটুকু কখনো সর্বজয়ার পূর্ণ হয়নি, এবারও হবেনা। সর্বজয়া হয়তো অপুকে, তার সংসারকে নিয়ে আর কিছুদিন এই দারিদ্রভরা তবু ভারি মায়াময় পৃথিবীতে কিছুদিন থেকে যাবার স্বপ্ন দেখত। সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করে অপু যে অমৃত তার শৈশবে পরিবেশন করেছে, তারই স্মৃতিসুধা সর্বজয়ার জীবন-পথের পাথেয়। সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু অপু বারেবারে মনে হচ্ছিল, মা আর বেশিদিন বাঁচবে না। ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করবার মতন আর্থিক অবস্থা তাদের নয়।

সেইবারের বাড়ি আসার পরে ফেরবার দিন অপু ফিরে যাবে বলে বেরিয়েও ট্রেন না পেয়ে সেদিনটা ফিরে আসে। সর্বজয়ার মৃত্যুর পরেও বহুদিন অপুর মনে সেই একটি দিন রয়ে গিয়েছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে অপুকে পেয়ে তার মা'র আহ্লাদভরা মুখ সে ভুলতে পারেনি। সে রাতটা অপু সেই ছেলেবেলার মতন মা এর কাছে শ্যামলঙ্কার গল্প শুনতে চায়।

শেষবার মা থাকাকালে অপু যখন বাড়ি ফেরে তখন সর্বজয়া অসুস্থ, প্রায়ই জ্বর আসে। সেবার বাসি কাপড়ে মা এর বড়ি দেবার তাক ছুঁলে মা তাকে বকেছিল ছোটবেলার মত। সেইবার মা এর কথাগুলো অপুর বুকে বিঁধেছিল। তার মা সত্যি আবার সুস্থ হয়ে বড়ি দেবে? মা আর কখনো সেরে উঠবে না।

অপু যেদিন চলে যায়, সেই রাত্রেই সর্বজয়া একা ঘরে, অসহায়, নির্বান্ধব অবস্থায়, তার একমাত্র অপুকে ছেড়ে চলে যায় চিরকালের মতন। দুর্গা, হরিহর এমনকী ইন্দির, কাউকে এতো একাকীত্বে মারা যেতে হয়নি। কেউ না কেউ ছিল সেই মৃত্যু-মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে।

> সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে... একজনের কথাই মনে হয়... অপু... অপু...অপুকে ফেলিয়া সে আর থাকিতে পারিতেছে না... অসম্ভব...। বিস্ময়ের সহিত দেখিল- সে নিজে অনেকক্ষণ কাঁদিতেছে। ... এতক্ষণ তো টের পায় নাই! ... আশ্চর্য!... চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে যে!...
>
> জ্যোৎস্না অপূর্ব, ভয় হয় না... কেমন একটা আনন্দ... আকাশটা, পুরাতন আকাশটা যেন স্নেহে প্রেমে জ্যোৎস্না হইয়া গলিয়া ঝরিয়া বিন্দুতে বিন্দুতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে... টুপ... টুপ... টুপ... টাপ। আবার কান্না পায়... জ্যোৎস্নার আলোয় জানলার গরাদে ধরিয়া হাসিমুখে ও কে দাঁড়াইয়া আছে? ... সর্বজয়ার দৃষ্টি পাশের জানলার দিকে নিবদ্ধ হইল... বিস্ময়ে আনন্দে রোগশীর্ণ মুখখানা মুহূর্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল... অপু... দাঁড়াইয়া আছে। ... এ অপু নয়... সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট অপু... এতটুকু অপু... নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনের ভিটেতে এমন কত চৈত্র-জ্যোৎস্নারাতে ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া পড়িত যাহার দন্তহীন ফুলের কুঁড়ির মত কচি মুখে... সেই অপু... ওর ছেলেমানুষ খঞ্জন পাখির মত ডাগর ডাগর চোখের নীল চাহনি... চুল কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া... মুখচোরা, ভালমানুষ লাজুক বোকা... জগতের ঘোরপ্যাঁচ কিছুই একেবারে বোঝে না... কোথায় যেন সে যায়... নীল আকাশ বাহিয়া বহু দূরে... বহু দূরের দিকে, সুনীল মেঘপদবীর অনেক উপরে... যায়...যায়...যায়...যায়... মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে মিলাইয়া যায়...
>
> বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে। ... কিন্তু তার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে... এত সুন্দর...
>
> কি হাসি!... কি মিষ্টি ওর মুখের!...[২৫]

সর্বজয়ার কাছে মৃত্যু আসে অপুর বেশে। বড় কালো মাকড়সার মতন একটা আতঙ্ক বেশিক্ষণ ভয় দেখাতে পারেনি অসহায় সর্বজয়াকে। বরঞ্চ অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল তার চির আকাঙ্খার রূপ ধরে। মা এর চিরবিদায়ের মুহূর্তটিতে সে মা এর পাশে নেই, সর্বজয়ার সেই তীব্র অভিমানের মুহূর্তে শৈশবের অপু ফিরে এসে হাত ধরে। বড় অপু মা কে ফেলে কলকাতা চলে গেলেও যে অপুকে এক মুহূর্তের জন্য সারাজীবনে কখনো কাছ ছাড়া করেনি সর্বজয়া। ভয় নয়, মৃত্যু যদি অপুর মতন দেখতে হয়, তাকে বরণ করাতেই একমাত্র সুখ।

সর্বজয়ার মৃত্যুর পরে অপুর মনের অবস্থা যেরকম হয়, তার জন্য হয়তো সে নিজেই প্রস্তুত ছিল না। অনিলের মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখে কিছুটা বুঝলেও, মায়ের মৃত্যুর আগে অপু নিজেকে এভাবে কখনো চিনতে পারেনি। ইন্দিরের মৃত্যু অপু'র স্মৃতির বাইরের ঘটনা। দিদির মৃত্যুতে কষ্ট হলেও তার তীব্রতা খুব প্রকট হয়ে ওঠেনি, কারণ সে ছিল শৈশব। বাবা হরিহরের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করাও ছিল অপরিণত বয়সেরই ঘটনা। কিন্তু পরপর অনিলের মৃত্যু এবং সর্বজয়ার মৃত্যু অপুর জীবনে আসে পরিণত বয়সে। সে বয়সে শোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে বেশ বেগ পেতে হয়।

জীবনস্মৃতির 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এভাবেই যখন তার চব্বিশ বছর বয়সের শোকের কথা বলেন, বলেন সেই হল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গ স্থায়ী পরিচয়। দুঃসহ দুঃখের মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মধ্যে প্রবহমান এক আকস্মিক আনন্দের হাওয়ার কথা বলেন।

> ... তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল এইটাতে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম, তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বন্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া দিবে না--- একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম কাহাকেও বরণ করিতে হইবে না--- এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মত আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।[২৬]

মায়ের মৃত্যুসংবাদে বাঁধন ছেঁড়া উল্লাস আর আনন্দের বোধ হওয়াতে অপু মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকে। সে কী চায় সে নিজেই বুঝতে পারেনা, মা কি তার জীবনপথের বাধা!

আমাদের সমসময়ের কথাসাহিত্যিক এই মৃত্যুজনিত সাময়িক উল্লাস বিষয়ে বলেছেন,

> মা প্রসঙ্গ : অপু কলকাতায় কলেজে পড়ে। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কলকাতার ট্রেন ধরতে ফিরে গেছে। ট্রেন ফেল করে ফিরে এসে দেখে--- জ্বর গায়ে মা পড়ন্ত বিকেলে

পুকুরে কাঁথা কাচতে বসেছে। পেছন থেকে মা বলে ডাকল অপু। অপুর গলা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে না মায়ের। তিনি নীচু পাড় থেকে ওপরে তাকিয়ে দেখেন--- অপু।

কিংবা মায়ের মৃত্যুতে অপু যেন সারা বিশ্বের মাঝে সব পিছুটান থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

এই দুটি ছবি পাশাপাশি রাখছি এই কারণে--- দুদিক থেকে মাকে দেখার এই দুই ছবি বাংলা কথাসাহিত্যে আর আঁকা হয়নি। প্রথম ছবিটি বিরল নয়। কিন্তু দ্বিতীয় ছবি পটভূমিতে প্রথম ছবিটি যদি ভাবি তবে বুঝব মায়ের মৃত্যুতে পিছুটান থেকে মুক্তি ভাবার ও দেখবার দৃষ্টি কী অনন্য, কী নিষ্ঠুর, অথচ সত্য ও সর্বাধুনিক। এ যেন সাহিত্য নয়--- জীবন। শুধুই জীবন। জীবনের সত্য।[২৭]

মায়ের অবর্তমানে মনসাপোতার ফাঁকা ভিটাতে ফিরে এসে অপু তার চিরদিনের খেলার সাথী মা'র অনুপস্থিতিটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করে। বারবার তার মন বলে সে মুক্তি চায় না, মা এসে তাকে শাসন করুক, অবাধ অধিকার সে চায় না। কিন্তু সে চাওয়া না চাওয়ায় তার জীবনের যাত্রাপথ আদৌ নির্ভর করেনা।

দশপিন্ড দানের দিন তীব্র বেদনা অপুর মনকে আবার বিকল করে দেয়। পুরোহিত তার মা'কে বলছেন "প্রেতা শ্রীসর্বজয়া দেবী"... অপু ভাবে যাঁকে প্রেত বলা হচ্ছে, তিনি কি তারই মা? তার সারজীবনের আনন্দ, দুঃখ, কান্না, অভিমানের সঙ্গিনী তার মা, চিরকাল যিনি আশা করে এসেছেন, নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে, তার ভয়ংকর রক্তে মাংসে গড়া অতি সাধারণ মা আজ কোথায় চলে গিয়েছেন!

তারপরই মধুর আশার বাণী- আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধুলি মধুময় হউক, ওষধি সকল মধুময় হউক, বনস্পতি মধুময় হউক, সূর্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময়হ হউন।[২৮]

এই বাক্যগুলির উৎস 'ঋগ্বেদ-সংহিতা'র প্রথম মন্ডলের ৯০ নম্বর সূক্ত, ৬ নম্বর শ্লোক।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।মাধ্বীর্নঃসন্ত্বোষধীঃ ।।

মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবগ্ং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ

পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাগ্ং অস্তু সূর্যঃ। মাধ্বীর্গাবো

ভবন্তু নঃ ।। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ।।[২৯]

এই মধুময় আশার বাণীতে অপুর বাবা বিশ্বাস করতেন, অপু মা বিশ্বাস করতেন, অপুও তাকেই বিশ্বাস করে। এই আশাটুকু, কখনো ইচ্ছেপূরণ হবে এই বিশ্বাস, চিরকালের

দরিদ্র, বঞ্চিত মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের ক্লান্তিকর চলার পথকে আনন্দে ভরে তুলেছে। অপু তার জীবনে যে মাকে পেয়েছে, তার আশাবাদী, গরিব, নির্বোধ, ভালোমানুষ মা... সেই মা কেই অপু চেয়ে এসেছে সবসময়। অপু কখনো কোনো অহংকারী, ধনীগৃহের বধূকে তার মা হিসাবে কল্পনা করতে পারেনা। সর্বজয়া অপুর যোগ্য মা, সেই মাতৃত্ব সে অর্জন করেছে তার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্য, দুঃখ, শত অপমান দিয়ে। এই কারণে তার মা এর আসনটি তার হৃদয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে যায়।

ঙ. অনিলের মৃত্যু :

রিপন কলেজে ভর্তি হবার পরে অপুর অনেক নতুন বন্ধু হয়। ইতিহাসের ক্লাস ছিল তার কলেজের সবচাইতে প্রিয় ক্লাস। সব কিছুর অর্থ স্পষ্ট না হলেও নানান বিদেশি ঐতিহাসিকের বই পড়তে শুরু করে আগ্রহ নিয়ে। এভাবে পড়ার সূত্র ধরে তার আলাপ হয় প্রণব মুখার্জি'র সঙ্গে। এই প্রণবের ভূমিকা অপুর জীবনে কতদূর সুদূরপ্রসারী হয় তা পাঠক জানেন। তবে যে ছেলেটির অপুর মনের সবচাইতে কাছাকাছি এসে পৌঁছোয়, তার নাম অনিল। অনিলের সঙ্গে শহর ছাড়িয়ে এদিকে-ওদিকে গিয়ে, কখনও বা গঙ্গার ধারে বসে আগামী জীবনের বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে দুজনে। অনিলের মতন করে অপুর মনের গঠনকে কেউ কখনও বুঝতে পারেনি। অনিলের প্রতি তার আশ্চর্য নির্ভরতা তৈরি হয়। অপু তার সব মনের কথা ভাগ করে নেয় অনিলের সঙ্গে। অনিলই একদিন এগিয়ে এসে তার দিকে বন্ধুত্বের, মুগ্ধতার হাত বড়িয়ে দিয়েছিল, নয়তো মুখচোরা অপুর পক্ষে অনিলকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কথা বলে দুজনে স্বস্তি পায়, দুজনেই কলকাতাতে হাঁপিয়ে ওঠে, দুজনেই প্রকৃতির কাছে ফিরতে চায়। দুজনেরই বুক ভরে রয়েছে অজানাকে জানবার আগ্রহে।

> অপু এ ধরনের কথা কাহারও মুখে এ পর্যন্ত শোনে নাই- এ যে তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি। গাছপালা, নদী, মাঠ ভালবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে সবাই বলিত পাগল...।[৩০]

অপুর এই প্রায়-প্রতিস্ব অনিলকে সুতরাং উপন্যাসের নিজস্ব যুক্তিতেই বিদায় দেবার প্রয়োজন পড়েছিল। অপুর চরিত্রের নিজস্বতাকে নির্ভুলভাবে উজ্জ্বলতর করবার জন্যই তাই অনিলের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু। প্রায় অপুর মতই স্বপ্নদর্শী অনিলের তাই স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া'তে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগের দিনটি পর্যন্ত দু'জনে আগামী অজানা রহস্যঘেরা জীবনের আনন্দ নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা জীবনটাকে তন্নতন্ন করে দেখতে চায়।

রাস্তার মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে অনিল মাত্র দুটো শব্দ বলেছিল, 'অপূর্ব রায়' আর 'রিপন কলেজ'।

জীবনের পথে অপু'কে আবার একা করে অনিল বিদায় নেয়। তার মৃত্যুর রাতটিতে শ্মশানে বসে অপুর মনে এক অদ্ভুত অবস্থা তৈরি হয়, তা ঠিক শোক নয়। সে ভাবছিল জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে। জীবনের রহস্য নিয়ে। কেউ জানেনা আগামী মুহূর্তটা কেমন। বেদনাকে ছাপিয়ে বিস্ময়বোধ তার মনকে বিহ্বল করে দেয় সেইদিন। এ এক এমন পুলক, যার সন্ধান অপু আগেও পেয়েছে নানান সময়। যা তাকে ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পড়বার ডাক দেয় প্রতিনিয়ত, বহির্বিশ্বের বিপুল অজ্ঞাত ভান্ডারের দিকে ঈশারা করে অবিরত। মাথা তুলে আকশের দিকে তাকাতে বলে। তাকাতে বলে অনন্ত নক্ষত্রবীথির দিকে।

> সুনীল সিগারেট কেস্‌টা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিলে সে ঘাটের ধাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জ্বলজ্বলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমন্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিব্যলোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনও শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না- কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার মত এক অপূর্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল- কেবল মনে হইতে লাগিল, কি একটা অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্বাক নক্ষত্রজগৎটা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হইতেছে।[৩১]

অনিলের মৃত্যুর পরে কলকাতায় অপুর মনে একরকম অবসাদ আসে সাময়িকভাবে। এতক্ষণে পাঠক মোটামুটিভাবে অভ্যস্থ হয়ে যান এই বিষয়টির সঙ্গে, যে যখন যাকে অপু আঁকড়ে ধরছে, তারাই অপুকে ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে দূরে। ছোটবেলার চিরনির্ভরতার দিদির মৃত্যু দিয়ে এর শুরু হয়। তারপরে বাবা, এবং কলকাতায় অনিল। তবে অনিলের প্রসঙ্গে যে কথা মনে হয় তা হল, বিভূতিভূষণের অপুর প্রতি ছিল এমন তীব্র পক্ষপাতিত্ব, যা অনিলকে সরে যেতে বাধ্য করে। অপুর মত যাতে আর কেউ তৈরি হয়ে উঠতে না পারে, এদিকেই ছিল তাঁর সচেতন দৃষ্টি। স্বভাবতই পাঠক অপেক্ষা করেন পরবর্তী মৃত্যুর। কার পালা এবার?

চ. অপর্ণার মৃত্যু :

কলেজ জীবনের বন্ধু প্রণব মুখার্জি, ডাকনাম পুলু, প্রধানত বইয়ের প্রতি আগ্রহের সুবাদে যার অপুর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়, পড়বার মাঝখানে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিযুক্ত হয়ে সে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। মা এর মৃত্যুর পরে অপুর সঙ্গে প্রণবের আবার দেখা হয়। আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এই প্রণবের গুরুত্ব অপুর জীবনে বর্ণনাতীত। প্রণবের সুবাদেই তার এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়, সে পরিচয় চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে। অপুর আগামী জীবনের অনেককিছু নির্ধারণ হয়ে যায় শুধু এই একটি মানুষের মাধ্যমে। সে অপর্ণা। প্রণবের মামাতো বোন।

বোনের বিবাহে বন্ধু'কে নিয়ে গিয়ে যখন দেখা যায় বোনের হবু স্বামী পাগল, তখন বোনকে লগ্নভ্রষ্টা হবার হাত থেকে উদ্ধার করতে অপুর ডাক পড়ে। প্রণব তাকে অনুরোধ করে। অতি অল্প সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সে রাজি হয়।

তারপর আসে তাদের ফুলশয্যার রাতটি।

> হঠাৎ সে কিসের টানে পাশ ফিরিয়া মেয়েটির গায়ে ভয়ে ভয়ে হাত তুলিয়া দিল। বলিল- সেদিন যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হল, তুমি কি ভেবেছিলে?[৩২]

অপু, অপর্ণার প্রথম দেখা হওয়ার রাতটিতে তারা দুজনের কেউই ভাবতে পারেনি কী ঘটতে চলেছে তাদের জীবনে। আবার, জীবনের এই আশ্চর্য রোম্যান্স, পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা অজানা রহস্য অপুকে মুগ্ধ করে। শুধু সেই রাতটিতে অপুর নিজের মা এর জন্য কান্না পায়। এইটুকুই তো চেয়েছিল তার দুঃখিনী মা। মাকে বাদ দিয়ে জীবনের সব উৎসব কিছুটা যেন মলিন হয়ে যায়।

এসবেরই মাঝেমাঝে লেখকের কলম থেকে নেমে আসা জাদুকরি ভালোবাসা পাঠকের চোখ থেকে কান্না হয়ে ঝরে পড়ে।

> বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী রাত্রির জ্যোৎস্না যেন তাহার পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মত তাহার বিভ্রান্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া সরল শুভ্র মহিমায় স্বর্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।[৩৩]

অপর্ণা ধনী পরিবারের কন্যা, অপু চিরদরিদ্র, তিন কূলে তার কেউ নেই। সেই ছোট্ট চাকরি, অল্প রোজগারের প্রায় ভবঘুরে বইপাগল অপু, তার সঙ্গে অপর্ণা সব জায়গায় যেতে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু অপুর চলবার পথ একলা চলবার। সে পথে বিভিন্ন মানুষ আসবে যাবে, কিন্তু চিরকালের স্থায়ী সঙ্গী হয়ে কেউ আসতে পাবে না। তবে যে পিছুটান তৈরি হবে, সেই তো পথচলার সবচেয়ে বড় বাধা।

অপর্ণাকে কয়েক মাস অনন্যোপায় হয়ে বাপের বাড়িতে রেখে, শেষপর্যন্ত এই বিরহ উভয় পক্ষই সহ্য করতে না পেরে অপু অপর্ণাকে মনসাপোতার পরিত্যক্ত ভিটাতে নিয়ে যায়। সে ভিটা দেখে প্রথমে কিছুটা স্তম্ভিত হয় অপর্ণা, সে অপুর দারিদ্র কল্পনা করলেও, সে দারিদ্রের তীব্রতা ঠিক কতটা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে ধাক্কা অতি সহজে সামলে নেয় অপর্ণা, জীবনপথে অপুর মত সঙ্গী থাকলে যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করা যায় অনায়াসে, সম্ভবত এই আশ্বাস পায় অপর্ণা। অপু চাকরি করতে কলকাতা চলে গেলে অপর্ণা একা একাই সাজিয়ে তোলে দু'জনের সংসার। হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র বছর। প্রথম যৌবনের সেই মাধুর্যময় কয়েকটি দিন অপুর অনাবিল আনন্দে কেটেছিল। দারিদ্র দূর হয়নি তেমন, পরিশ্রম করতে হত অনেক, তবু পরস্পরের সান্নিধ্য সব কিছুকে আনন্দঘন করে তুলতো।

সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অপর্ণা মারা যায়। কী অসীম নিষ্ঠুরতায় বিভূতিভূষণ অপুর জীবনের প্রতিটি অবলম্বনকে সরিয়ে দেন।

সন্তানসম্ভবা অপর্ণাকে শেষবারের মতন তার বাপের বাড়ি পৌঁছে দেবার অভিজ্ঞতাটুকু অপুর সারাজীবনের সঞ্চয় হিসেবে রয়ে গিয়েছিল। দুর্গার মৃত্যুর সময়ে বৃষ্টি থেমে প্রকৃতি যেন আলোতে মেতে উঠেছিল, জগতের বৃহৎ আনন্দযজ্ঞের মধ্যে থেকে একটি করুণ, ছোট্ট মেয়ে শুধু বিদায় নিয়েছিল চিরকালের মতন, তেমনই রেলে, স্টীমারে চেপে এবং শেষে খেয়ায় চড়ে বাড়ি যাবার পথে দুজনেই যেন খুশি হয়ে ওঠে। পল্লীগ্রামের দুই বালক-বালিকা শহরের হাঁপ-ধরানো বদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে ছোটবেলার মতন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর তাদের জীবনে আনন্দের দিন আসছে, সন্তান, নতুন দায়িত্ব...

সেই শেষবার ফেরবার সময় অপর্ণা আর অপুর সঙ্গে দেখা করেনি। ভোর রাত্রে সে যখন বিছানা ছেড়ে উঠে যায় অপুর মনে হয়েছিল তাকে এতো তাড়াতাড়ি যেতে না দিলেই হত। কিন্তু অবোধ অপু জানত না যে তাকে যেতে দিতে না চাইলেও যেতে দিতে হয়। অপর্ণা আর কখনও ফিরে আসেনি।

বড় শ্যালক মুরারি অপর্ণার মৃত্যু সংবাদ দিতে এলে অপু খুব শান্তভাবে সেই খবরকে গ্রহণ করে। জানতে পারে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে অপর্ণা মারা যায়। ছেলে হবার পরে অপর্ণা অল্পক্ষণ ভালো ছিল, সেসময় সে এই খবর অপুকে দিতে বলে। অপু এতো স্বাভাবিকভাবে সেদিন মুরারির সঙ্গে কথা বলেছিল, তাতে পরে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে

যায়। সব জিজ্ঞাসা করে, কেবলমাত্র তার সন্তান জীবিত আছে কী না এই কথা জানতে ভুলে যায়। সেই ভুল কি ইচ্ছাকৃত ছিল? সদ্যোজাত সন্তানের প্রতি প্রবল অভিমানবশতই কি এই ঔদাসীন্য!

ছ. লীলার মৃত্যু :

কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় অপুর সেই ছেলেবেলার বন্ধু লীলার সঙ্গে দেখা হয়। সেই লীলা যে কখনো দরিদ্র অপুকে তাদের পরিবারের পরিচারিকার পুত্র হিসাবে দেখেনি, সেই লীলা যে নির্দ্বিধায় অপুর সঙ্গে এক গেলাস থেকে দুধ ভাগ করে খেয়েছে। সেই লীলা যে প্রায় জোর করে তার সখের ফাউন্টেন পেন অপুকে দিয়ে দিয়েছে, সেই লীলা যে অপুকে উপনয়নে তার জীবনের প্রথম শৌখিন পোশাকখানি দেয়, সেই লীলা যে অপুকে অকাতরে তার গল্পের বইয়ের ভান্ডার উজাড় করে দিয়েছে, সেই লীলা সর্বোপরি যে অপুকে বাঁধানো 'মুকুল'এর মধ্যে থেকে সন্ধান পেতে সাহায্য করে পোর্তো ও প্লাতার জাহাজডুবির কাহিনির, যে জাহাজ কবে কোনকালে মণিমুক্তো বোঝাই অবস্থায় ডুবে যায়! কেউ তা উদ্ধার করতে পারেনি, সেই কৈশোরের প্রথম বড় হয়ে ওঠার দিনগুলিতে অপু আর লীলার কথা হয়ে যায়, কোনো না কোনোদিন অপু সেই হারানো ধনের সন্ধান ঠিক খুঁজে বার করবে। মনে রাখতে হবে পোর্তো প্লাতার উল্লেখ পথের পাঁচালীর পত্রিকাপাঠে ছিল না। (বিচিত্রা, আশ্বিন, ১৩৩৬)। গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। যে পোর্তো প্লাতার সন্ধানে অপুকে শেষপর্যন্ত জীবনের একমাত্র বন্ধনকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়।

> হঠাৎ অপু একখন্ড 'মুকুল' দেখাইয়া বলিল— পড়েচো এ গল্পটা?
>
> লীলা বলিল--- কি দেখি?
>
> অপু পড়িয়া শোনাইল। সমুদ্রের তলার কোন্ স্থানে স্পেন দেশের এক ধনরত্নপূর্ণ জাহাজ দুই তিনশত বৎসর পূর্বে ডুবিয়া যায়--- আজ পর্যন্ত অনেকে খোঁজ করিয়াছে, কেহ স্থানটা নির্ণয় করিতে পারে নাই। গল্পটা এইমাত্র পড়িয়া সে ভারি খুশি হইয়াছে।
>
> বলিল--- কেউ বার কর্তে পারেনি--- কত টাকা আছে জানো? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ--- পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ডের সোনা-রূপো... এক পাউন্ডে তেরো টাকা--- গুণ করো দিকি? তাহার পরে সে তাড়াতাড়ি একটু কাগজে আঁকটা কষিয়া দেখাইয়া বলিল--- এই দ্যাখো এত টাকা!... আগেও সে আঁকটা একবার করিয়াছে। উজ্জ্বলমুখে বলিল--- আমি বড় যাবো--- দেখ্‌বো গিয়ে--- ঠিক বার করবো দেখো--- কেউ সন্ধান পায়নি এখনও সেখেনে---

লীলা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল--- তুমি যাবে? কোন্ জায়গায় আছে তুমি বার করবে কি করে?

--- এই দ্যাখো লিখেচে "পোর্তো প্লাতার সন্নিহিত সমুগ্র গর্ভে"--- খুঁজে বার করবো। ...

সে গল্পটি পড়িয়াই ভাবিয়াছে, ভালোই হইয়াছে কেহ বাহির করিতে পার নাই। সবাই সব বাহির করিয়া লইলে তাহার জন্য কি থাকিবে? সে বড় হইয়া তবে কি তুলিবে? এখন সে যাওয়া পর্যন্ত থাকিলে হয়! ...

লীলার বয়স কম হইলেও খুব বুদ্ধিমতী। ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল--- ওদের মত জাহাজ পাবে কোথায়? তোমার একখানা আলাদা জাহাজ চাই--- ওদের মতন---

--- সে হয়ে যাবে, কিন্‌বো, বড় হলে আমার টাকা হবে না বুঝি?

এবার বোধ হয় লীলার অনেকটা বিশ্বাস হইল। সে এ লইয়া আর কোনও তর্ক উঠাইল না।[৩৪]

লীলা এবং অপুর যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন অপুর বয়স তেরো-চোদ্দ, লীলার এগারো-বারো। বয়ঃসন্ধিকালীন দুটি ছেলেমেয়েকে আঁকছিলেন বিভূতিভূষণ। অপুর মাথা ধরে গেলে লীলা তার হাত দিয়ে অপুর মাথা টিপে দেয়। সবে বয়ঃসন্ধিতে পা দেওয়া অপুর কাছে এই ঘটনা অচেনা রোমাঞ্চের জন্ম দিয়েছিল। তাদের বন্ধুত্ব গাঢ়তর হতে না হতেই লীলা কে কলকাতা চলে যেতে হয়। বিভূতিভূষণের লেখার ধরণ বড় নির্মম, একটা সম্ভাবনা শুরু হয়ে তখনই মনের মধ্যে দ্বিধা তৈরি করে শেষ হয়ে যায়।

অনেক দিনের পরে প্রথমবার কলকাতায় যখন লীলা আর অপুর দেখা হয়, তখন সদ্য অপু মাতৃহীন হয়েছে। তারপরে বারেবারে ঘুরে ফিরে দেখা হয়েছে অপু আর লীলার। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত সংকোচ বশত অপু তার বিবাহের কথাটি বলে উঠতে পারেনি লীলাকে। লীলাও অনেক পাল্টেছে ইতিমধ্যে, সে অপূর্বকে এখন অপূর্ব বাবু বলতে শুরু করে।

অপর্ণার মৃত্যুর পরে একদিন যখন অপু লীলার বাড়ি যায় তার খোঁজ নিতে তখন তার ভাইয়ের থেকে সে খবর পায় লীলার বিবাহ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। জামাই শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন, সব দিক থেকে লীলার উপযুক্ত। তবু,

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জন, সঙ্গীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এরকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহাতে মনখারাপ করিবার কি আছে? ভালই তো জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন- লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।[৩৫]

এই যে অসামান্য প্রেম, 'অপরাজিত'র গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে বিভূতিভূষণকে তা পুনর্নির্মাণ করতে হয়েছে।

এর কিছুদিন পরে লীলার সঙ্গে তার স্বামীর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ভাল ছিল না। এসময় লীলা খুবই সঙ্কটে পড়ে। এসময় অপু আর লীলার আবার দেখা হয়ে যায়। এটা সেই সময় যখন অপু আর লীলা দুজনেই একা। লীলা ই প্রথম অপু'কে সেই অস্ত্রটা দেয় যা দিয়ে অপু 'অপু' হয়ে ওঠে। তবে কি লীলা আর অপুর আবার একটা যাত্রা শুরু হয়? কোথায় যাবে তারা এই যাত্রায়? পোর্তো প্লাতা?

তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপূর্ব?

--- কোথায়?

--- যেখানেই হোক। তোমার সেই পোর্তো প্লাতায়--- মনে নেই, সেই যে সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবোজাহাজ উদ্ধার করে বলেছিলে সোনা আনবে? সেই যে 'মুকুলে' পড়ে বলেছিলে?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ সেই--- ঠিক। উঃ, সে কথা মনে আছে তোমার!

--- আমি বলেছিলাম, কেমন ক'রে যাবে? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে। ...[৩৬]

এই প্রসঙ্গটি পত্রিকাপাঠে কিছুটা ভিন্ন। দেখা যাচ্ছে, 'পথের পাঁচালী'র পত্রিকাপাঠে পোর্তো প্লাতার উল্লেখ না থাকলেও, 'অপরাজিত'র পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় তিনি অপু ও লীলার কথোপকথনের মধ্যে এই প্রসঙ্গ এনেছিলেন। বলাই বাহুল্য, ইতিমধ্যে 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে, বিপুল জনসমাদর লাভ করেছে এবং এই প্রসঙ্গ সেখানে অন্তর্ভুক্ত।

...লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল--- তুমি সেই সমুদ্রের মধ্যে কোন ডুবোজাহাজ উদ্ধার করে সোনা আনবে বলেছিলে মনে আছে তোমার?[৩৭]

লীলার উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে এই পোর্তো প্লাতা আশাহীনতার সমুদ্রে আলোকবর্তিকার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল--- যাবে না? যাও যাও--- পরে হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত সুরে বলিল--- সমুদ্র থেকে সোনা আনবে তো তোমরাই--- পোর্তো প্লাতা থেকে না?... দ্যাখো, এখনও ঠিক মনে ক'রে রেখেছি--- রাখি নি? হি-হি--- একটু চা খাবে?

লীলার মুখের শীর্ণ হাসি ও তাহার বাঁধুনিহারা উদ্‌ভ্রান্ত আল্‌গা ধরণের কথাবার্তা অপুর বুকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল এত ভালোবাসে নাই সে লীলাকে আর কোনোদিন। আজ যত বাসিয়াছে।[৩৮]

এই অংশের পত্রিকাপাঠে 'পোর্তো প্লাতা'কে 'পোর্টো গ্রাডা' লেখা হয়েছে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮)।

এই যে যাত্রা আমরা পাঠক হিসাবে কল্পনা করে বসে থাকি, তা কার্যত অসম্ভব। সমাজ সংস্কার ইত্যাদির কথা বাদ দিলেও, এই সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছে যে অপুকে একলা চলতে হবে। লীলা অপুকে আবদার করে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য। কোথায় জানতে চাইলে সে নির্দ্বিধায় তাদের কৈশোরের গন্তব্যস্থলের নাম বলে দেয়, পোর্তো প্লাতা, সে যখন বলে সে নিজেও খুব ভাল করে জানে যে সে একটা অসম্ভব দাবি করছে। তাই তার গন্তব্যের নামটি হয় এমন, যেখানে কেউ কক্ষনো পৌঁছোতে পারেনি।

এই মুহূর্তটিতেই অপু-লীলার জীবনের তুঙ্গতম মুহূর্তটি নির্মাণ করেন বিভূতিভূষণ। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণোচ্ছল লীলা এমন এক অবস্থার মুখোমুখি হয় যেসময় এই জীবন এবং বেঁচে থাকাই তার কাছে বিশাল এক প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। অপুকে সে প্রশ্ন করে এ জীবনের গুরুত্ব কী? অপু লীলার মুখে এ ধরণের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। লীলার এই পরিবর্তনে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলাই অপুর কাছে সঙ্কটের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবু সে তার বাল্যসঙ্গিনীকে আস্বস্ত করে। এই জীবনে প্রথমবারের জন্য লীলার সামনে দাঁড়িয়ে অপু একপ্রকার স্বীকার করে যে লীলাকে সে চেনে, অন্য লোকে তাকে ভুল বুঝলেও অপুর জীবনে তার আসনটি বিপর্যস্ত হবে না কিছুতেই।

লীলা যেন, অবাক হইয়া গেল, কখনও সে এরকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল--- সত্যি বলছ?--- কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া হয়ত বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই খেয়ালী অপু আর একটা কাজ করিয়া বসিল- এটাও সে ইহার আগে কখনও করে নাই- লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের পশের

চূর্ণ কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল- তুমি আমার ছেলেবেলার সাথী, লীলা- আমরা কেউ কাউকে ভুলব না- কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলি নি-ও কখনো লীলা।

লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল... যাহা আজ অপুর মুখে, কথার সুরে ডাগর চোখের অকপট দৃষ্টিতে পাইল- জীবনে কোন দিন কাহারও কাছ হইতে তাহা সে কখনও পায় নাই- আজ সে দেখিল অপুকে সে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে- বিশেষ করিয়া অপুর মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের ফুটপাতে তাকে যেদিন শুষ্কমুখে নিরাশ্রয় ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল- সেদিনটি হইতে।

... অপুর চমক ভাঙিল- লীলা কখন তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল- তাহার অশ্রুপ্লাবিত পান্ডুর মুখখানি। ...

অপু বাহিরে চলিয়া আসিল- সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মত সে কাহাকেও ভালবাসে না- সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্মবিসর্জনে প্রণোদিত করে।[৩৯]

উপন্যাসের পত্রিকাপাঠে এই কথোপকথন কিছুটা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

... পরে হঠাৎ লীলা বলিল- আচ্ছা, একটা কথার উত্তর দেবে?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল- কি কথা?...

--- আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না- বলিল- এ কথার কি- এ কথা কেন?

--- বল না?...

--- না, লীলা। এ ধরণের কথাবার্ত্তা কেন? এর দরকার নেই।

--- আচ্ছা, একটা সত্য কথা বল্‌বে?...

--- কি বল?...

--- আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে?...

সেই লীলা! তার মুখে এ রকম দুর্ব্বল ধরণের কথাবার্ত্তা সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবইয়াছিল? অপু এক মুহূর্ত্তে সব বুঝিল--- অভিমানিনী, তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই--- সম্প্রতি বুঝিয়াছে--- বুঝিয়া জীবনের উপর টান্ হারাইতে বসিয়াছে।

অপু গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ সুরে বলিল।--- এ ধরণের কথা সে এ পর্য্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোনো দিন না।--- "দেখো লীলা, অন্যলোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুন্‌বে?... আমি তোমাকে আমার মায়ের পেটের বোন ভাবি--- তোমাকে কেউ চেনেনি, চিনলে না...।"[৪০]

বলা বাহুল্য, অপু-লীলার আলিঙ্গনের প্রসঙ্গটিও এখানে অনুপস্থিত।

বোঝা যায় বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত' উপন্যাসের জন্য আলাদা করে নির্মাণ করেন লীলা অপুর সম্পর্ককে। এই নির্মাণ অপুর জীবনকে নির্মাণের একটা প্রকল্প হিসাবেই দেখতে হবে অবশ্যম্ভাবীভাবে। অপরাজিত'র পত্রিকাপাঠে 'মায়ের পেটের বোন্' থেকে লীলা অপুর সম্পর্ক যে আলাদা মাত্রা পায়, তা পাঠক বুঝতে পারেন সহজেই। সেইদিন লীলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অপু এমন কথা ভাবে যে কথা তার আগে অপু আর সারাজীবনে কারুর ক্ষেত্রে কখনো ভাবেনি। সে ভাবে লীলাকে সে যে করেই হোক সুখী করবে। লীলাকে কোনও কষ্ট পেতে, নিজেকে ছোট ভাবতে দেবেনা। যার ইচ্ছে সে লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে কখনো ছাড়বে না। সে লীলাকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যাবেই। এখানে রাখলে লীলাকে বাঁচানো অসম্ভব। "বিশ্ব একদিকে- লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে"--- এই বাক্য অপুর মুখ থেকে উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লীলাকে মরতেই হবে। অপু এ কথা বলতে পারে, কিন্তু এ কথা তার জীবনে সত্য হতে পারে না। পৃথিবীর থেকে, পথের থেকে যে ই অপুকে টান দেয় বন্ধনের দিকে, বিভূতিভূষণ অবধারিতভাবে তাকে কেড়ে নেন অপুর জীবন থেকে।

এই যে অপুকে দেখতে পাওয়া যায়, সে অপুকে পাঠক চেনেন না। অপু-লীলার নিবিড় মুহূর্তটি নিঃসন্দেহে অপুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত কিন্তু এ মুহূর্তটিই তার মৃত্যুর জন্যও সবচাইতে প্রাসঙ্গিক। কারণ পাঠকের চেনা অপুর কাছে পথের থেকে, এগিয়ে যাবার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হতে পারেনা।

এরই মাত্র দিন তিনেক পরে জানা যায় লীলা বিষ খেয়েছে। বিভূতিভূষণ সেই নিষ্ঠুরতম লেখক, অপু লীলাকে সেই চূড়ান্ত কথাগুলি বলবার পরেই লীলাকে তিনি মেরে ফেলেন। লীলার চোখের জলে সেদিন অপুর পোশাক ভিজে গিয়েছিল। যখন লীলা অপুকে তাকে নিয়ে যেতে বলে, তখন হয়তো পাঠক আশা করেন ওদের দুজনের পথ কি তবে এবার মিশে যেতে পারে? এবার কি হাত ধরে ওদের একসঙ্গে পথ চলা শুরু হবে? কিন্তু অপুকে দুটি উপন্যাস জুড়ে যেভাবে নির্মাণ করেন লেখক, এই পথচলার পথ তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে। পরমুহূর্তেই পাঠকের ভুল ভাঙে। লীলা এমন এক জায়গায় যেতে চায়, যেখানে তাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। কেবলমাত্র অনেক

ছোটবেলাকার দুই বন্ধু তাদের সেই রঙিন দিনগুলিতে এইখানে যাবার কল্পনা করেছিল। আসলে এই পথটা চিরকালের অসমাপ্ত পথ হিসাবে থেকে যাবে। এইভাবে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'অপরাজিত' তে অপু-লীলার সম্পর্কের একটা পথ আছে। সেই পথের টানে, সেই ছেলেবেলায় আর লীলার মৃত্যুর আগের মুহূর্তে লীলাকে দেওয়া কথা রাখতে অপু আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। সে পথে অপুকে একা ই যেতে হবে। লীলাকে কথা দেওয়া পথেই অপু চলে যাবে হয়তো শেষমেশ। কিন্তু তাদের দুজনের পথ কখনই মিলবে না। এই পোর্তো-প্লাতা, খুঁজে না পাওয়া, নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রতীক হয়ে থাকে লীলা। অপুর জীবনে সেই তো পথ, সেই চিরকালীন। অপর্ণা হল অপুর ঘর, গ্রাম, তার ফেলে আসা ছেলেবেলা, তার সেই নিশ্চিন্ততার আবাস। যেখানে ফিরব বললেও কিছুতেই আর ফেরা সম্ভব নয়। শারীরিকভাবে যদি বা পৌঁছোনো সম্ভব হয়, ঘর যে একবার ছেড়েছে, পথ যাকে ঘরছাড়া করে এনেছে, তার পক্ষে সেই ঘরে গিয়ে আর থেকে যাওয়া সম্ভব নয় কোনওদিন।

নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার আগে অপু দেবী বিশালাক্ষীর কাছে প্রার্থনা করেছিল, সেই ছোটবেলার দিনগুলিকে আরেকবার ফিরিয়ে দিতে। তারপরেই বিভূতিভূষণ লেখেন, "ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে"। যখন যখন যেখানে যেখানে অপু ভেবেছে থেকে যাবে, তার একেবারে পরে পরেই তাকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়েছে অথবা সে নিজেই চলে গেছে। এ বিভূতিভূষণের অসামান্য নিষ্ঠুরতা, যেখানে সারা বিশ্ব একদিকে আর লীলা একদিকে, এই বাক্য বলবার পরেই জানা যায় লীলা বিষ খেয়েছে।

আসলে ভেবে দেখলে বোঝা যায় লীলার মৃত্যু ছাড়া আর কী উপায় ছিল? লীলা ভাল জানত যে অপু আর লীলার পথ এক হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেইদিন অপুর কথায় যে ভালবাসা লীলা পেয়েছিল, তা তার জীবনের সর্বোচ্চ পাওয়া, এর চেয়ে বেশি তাকে কেউ কখনও দিতে পারবে না। সেই অসধারণ প্রাপ্তি, আনন্দ আর বর্ণনাতীত যন্ত্রণার মুহূর্তটুকুকে ধরে রাখতে চাইলে মৃত্যুই একমাত্র উপায়। লীলার দুর্ভাগ্যজনক জীবনের শেষটুকু যেন মাধুর্যে ভরে থাকে, সেই টুকুকে ধরে রাখতেই লীলার মৃত্যুর পথ বেছে নেওয়া। একদিক থেকে সে ভারি অভাগিনী, কিন্তু অন্য দিকে সে যা পায় তা অমূল্য। জীবনের শেষ দিনটিতে হয়তো আর তার কোনও আফশোস থেকে যায়নি।

তীব্র মরফিয়া বিষের প্রভাবে লীলা বিষ খাবার পরদিন সকাল দশটায় মারা যায়।

লীলা মারা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুঁজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল--- তারাগুলো বড় বড়, তাহার দিকেও চাহিল, অপুর দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল--- লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোধ হয়। ...কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল--- দৃষ্টি অর্থহীন, আভাহীন, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তারপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠ, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথার শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ ঘুরাইল--- স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম চোখ ঘুরাইতে পারে না।

তারপরেই সবাই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলেমানুষের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল...[৪১]

মৃত্যুর সময়ে তারও চোখের দৃষ্টি, মৃত্যুমুহূর্তে হরিহরের চোখের দৃষ্টির মতন ভাষাহীন হয়ে যায়। লীলা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তার বড়িতে কত লোকের আনাগোনা হয়, কিন্তু এই লীলা যখন বেঁচে ছিল, তার যন্ত্রণার শরিক হতে একটি লোকও এসে দাঁড়ায়নি। আজ তার শেষ দিনটিতে তারা এসেছে লীলার বিচার করতে। তাদের প্রতি অনুকম্পায় অপুর মন ভরে ওঠে। 'অপরাজিত'র গ্রন্থপাঠে লীলার মৃত্যু হয় অপুর চোখের সামনেই। জীবনের এক একটি করে বন্ধন খুলে যাবার এই অন্তিম অধ্যায়ে। উল্লেখ্য যে, উপন্যাসের পত্রিকাপাঠে লীলার মৃত্যুসংবাদ বর্ণিত হয়েছিল অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিকভাবে। উপন্যাসের প্রায়-অন্তিম পর্বে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে গিয়ে লীলার ছোট ভাইয়ের লেখা একটি চিঠিতে সে খুব অনাড়ম্বরভাবে অবহিত হয় লীলার মৃত্যু সম্বন্ধে।

সপ্তাহের শেষে সে বিমলেন্দুর হাতে ঠিকানা লেখা একখানা পত্র পাইল। খুলিয়া দেখিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। চিঠিখানা ছোট। একটা ছত্র বার বার পড়িয়াও যে সে অর্থ করিতে পারিতেছিল না! লেখা আছে, "কাল রাত্রি দশটার সময় দিদি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। জিনিষটা যদিও অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এত হঠাৎ যে আসবে তা ভাবিনি।"

কথাটার মানে কি? লীলা বাঁচিয়া নাই?

অত জীবন্ত লীলা, অত হাসিমুখ, স্নেহময়ী মমতাময়ী লীলা, সে নাই আর দুনিয়ার কোথাও?

অপু যেন এ-কথাটার সত্যটা মনের মধ্যে হঠাৎ গ্রহণ করিতে পারিল না।

কাহাকেও কোনো কথা বলিল না, সারা সকাল ও দুপুরের মধ্যে পত্রখানা মাঝে মাঝে পড়িল ও কি ভাবিল। চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৈকালে পত্রখানা হাতে করিয়াই অভ্যাসমত বেড়াইতে গেল। সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশের তলায় নদীর ধারে দাঁড়াইয়া পত্রখানা আবার পড়িল। লীলাকে সে বলে নাই, কিন্তু কতদিন

> ভাবিয়াছে, হীরক সে ত লীলাকে আশা দিয়াছিল বিদেশে লইয়া যাইবে, শেষে ঠকাইয়াছিল--- লীলা সারিয়া উঠিলে সে একদিন-না-একদিন তাহাকে বিদেশ দেখাইবে, যেখানে লীলা যাইতে চায় সেখানে লইয়া যাইবে সঙ্গে করিয়া, এই সেদিনও কথাটা ভাবিতেছিল। ...[৪২]

তারও কিছুদিন পরে অপু যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে, তার আগে সে একটা চিঠি লিখে যায় প্রণবকে। সেই চিঠিতে সে লেখে অপর্ণা আর লীলার কথা।

> লীলাকে জানতে? আমার মুখে দু'একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, আমার মনে হয় এদের দু'জনের সঙ্গ পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে- বাইবেল পড়েছ তো- And I saw a new Heaven and a new Earth- এরা জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।[৪৩]

অপু আর লীলার সেই আশৈশবলালিত সম্পর্ককে সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়তো সম্ভব ছিল না। সে'কথা লীলা অপু দুজনেই জানত। কিন্তু অপুর অসামান্য জীবনকে আরও আলোকিত করে তুলেছিল যে লীলা, তা অপু কখনও ভুলতে পারেনি। সমাজ স্বীকৃতি না দিলেও অপু নিজে মনে মনে তা মানত। এবং শেষে প্রণবকে লেখা চিঠিতে অপর্ণা আর লীলাকে ঠিক পাশাপাশি আসনে বসিয়ে তার জীবনে দুজনের আমৃত্যু প্রভাবের ঋণ স্বীকার করে যায়। সে ঋণ ভালবাসার। অপু জানে তা শোধ করা অসম্ভব, শুধু যে স্বীকৃতি লীলা জীবনে কখনও পায়নি, যে সম্মান তাকে কেউ দেয়নি, সেইটুকু সে লীলাকে দিয়ে গিয়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা চিঠিটিতে।

'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনায় নীরেন্দ্রনাথ রায় অপু-লীলার এই সম্ভাব্য সম্পর্কের অকস্মাৎ পরিসমাপ্তিতে কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন-

> তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরণেই প্রাণহীন জড়-পদার্থ--- এতই মামুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে আরও জানিতে কোন কৌতূহল হয় না। তিনি নিজে লিখিয়াছেন বটে সকল বড় সাহিত্যের মূলে আছে মানব-বেদনা, কিন্তু বোধ হয় উপলব্ধি করেন নাই যে বেদনার অনন্ত রূপ, শুধু দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষই তো তাহার একমাত্র প্রকাশ নয়, দারিদ্র্যের সহিত অপুর বিরোধ ও অত্যন্ত মামুলি ধরণের--- কখনও খাইয়া কখনও না খাইয়া, কখনও চাকরি করিয়া, কখনও না করিয়া অপু দারিদ্র্যকে বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটা সহজ জীবনানন্দ ও রোমান্স প্রিয়তার দোহাই দিয়া গ্রন্থকার অপুকে সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রলোভন, প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব, আদর্শবিভ্রাট ইত্যাদি হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। অথচ এইসব অন্তর্দ্বন্দ্বর দ্বারাই বালক মানুষ হইয়া উঠে, মানুষ অতিমানুষ হইবার আশা রাখে। জীবনে জটিলতা জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক--- যে তাহা জানিল

না সে কিসে অপরাজিত। তাহা সারাজীবনই তো অপরিণত। এই অতিকায় উপন্যাসখানির কোথায়ও জীবনের কোনও জটিলতার সম্মুখীন হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহারই মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র লীলা, সেও অত্যন্ত মামুলিভাবে জটিল। বড় ঘরের রূপসী, বিদুষী তরুণী এক বিলাত ফেরত বদ-মেজাজ চরিত্রহীন বড়লোক স্বামীর অত্যাচারে কূলত্যাগ করিয়া অন্য এক তরুণ ব্যারিস্টারের হাতে গিয়া পড়িল। সে তাহার সঞ্চিত অর্থ নির্বিকারে ফাঁকি দিয়া ফুকিয়া দিল। পরে সে থাইসিস-এ আক্রান্ত হইয়া একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া বসিল--- এ কাহিনী কি সর্বজনপরিচিত নহে? অপুর সহিত লীলার স্বল্পব্যক্ত প্রণয়-সম্বন্ধের প্রকৃতি এমনই অবাস্তব, ভিত্তি এতই শিথিল যে তাহার গভীরত্বে বিশ্বাস করা রমণী-মন-অনভিজ্ঞ অপরিণত বয়সের বাহিরে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।[৪৪]

একথা আগেও একবার আলোচনা করা হয়েছে, নীরেন্দ্রনাথ রায়ের কঠোর সমালোচনার প্রেক্ষিতে আরেকবার বলা যায় যে, নীরেন্দ্রনাথ যে বিষয়কে 'অপরাজিত' উপন্যাসের দুর্বলতা বলছেন, ঠিক সেই 'মামুলি' সরলতাকেই উপন্যাসের ভিত্তি বলা যেতে পারে। লীলার জীবনের জটিলতাকে বাড়িয়ে, অপুর সঙ্গে তার প্রণয়ের সম্ভাবনাকে একটি দিনের বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে কার্যে পরিণত করলে, তা অপুকে যেভাবে নির্মাণ করতে চান বিভূতিভূষণ, সেই প্রণালী ব্যহত হত। লীলার ঠিক ওই সময়টিতেই মৃত্যু অপুর জীবনের ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

অবশ্য নীরেন্দ্রনাথ রায় একা নন, অপুর আপাত-অস্বাভাবিকত্ব নিয়ে 'অপরাজিত' প্রকাশের পর বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে যে কিছু তোলপাড় শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের লেখা কবিতা 'অপরাজিত'র এই অংশটি,

... কেহ কহে ভাষা ভাল নয়, কেহ খুঁজে মরে ফিলসফি---
ব্যাকুল ঘোষাল অবিনাশ ক্ষোভে কহে---
যা খুশী হউক, নয় এ উপন্যাস,
কোটের বডিতে পাঞ্জাবী ঝুল হাতা
নিঙাড়ি গুম্ফ নরেন দা কহিলেন---
'অপরাজিতের অপু abnormal'---
সাহিত্য-সেবা-সমিতির সভা বেচু চাটুয্যে স্ট্রীটে,
ধূর্জটিবাবু চঞ্চল সভাপতি---
ডবল নীরদ, নীহার, মনোজ, সুশীল ও পশুপতি

বাবু উপাধিটা আছে সকলের শেষে,

এদিক ওদিক বহুদিক দিয়ে করিলেন আলোচনা

প্রশংসা তার পনেরো আনাই বটে।

শৈলজা কহে, যতখানি ভাল 'পথের পাঁচালী' খানি

'অপরাজিত' যে মন্দ ততই লাগে!

মানিক ব্যথিত

দরদে কোথাও বৈচিত্র্য নাকি নাই...[৪৫]

'অপরাজিত' বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুও নিষ্করুণ মন্তব্য করেছেন। 'পথের পাঁচালী'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পর তিনি বলেছেন,

> ... This extremely fortunate mental composition (we may call it composure) has enabled Bibhutibhushan to steer clear of the triple temptation of Bengali literature : patriotism (in those debased forms where it becomes either jingoism or provincialism), reformist zeal (leading to journalistic tantrums) and pathology (popularly known as psychology). But temptation waylaid him from another direction : the success of *PatherPanchali* induced him even to act as the executioner of his own creation and incarcerate that flawless novel in a long trail of sequels. The boy-hero Apu grows up and comes to Calcutta where he is as much lost as his author. Love and death, poverty and suffering are all there, but the magic is gone and the glory departed; instead of being an inhabitant of the universe, Apu now is merely a country cousin. The magic is somehow recaptured in the jungle scenes in the last volume, for Bibhutibhusan's love of Nature extend right up to the dark heart of the jungle, and there again we share with him a sense of release, a deliverance from the labours of realism to the reality itself. It is true that this feeling is no longer continuous; but anyhow, *PatherPanchali* has survived its sequels and been equalled in effect by certain short stories where the author takes us to the same sweet world of innocence...[৪৬]

অবশ্য এর বিপরীত মতামতও ছিল। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধটি প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৩৯) নীহাররঞ্জন রায় প্রতিবাদ করেছেন। সমালোচকদের 'ঈর্ষাপ্রসূত নিন্দা'র প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন---

> 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' নিয়ে আপত্তি যে সব উঠেছে, তার মধ্যে একটা হল এই যে অপুর জীবনে বৈচিত্র্য নেই, সে অপরাজিত নয়, অপরিণত, তার চরিত্র পরিণতি লাভ করেনি, তার চরিত্র চিত্রণের ভিতর অর্ন্তদ্বন্দ্ব তা শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গেই।
>
> এ আপত্তি আমার মনেও একসময়ে জেগেছিল, কিন্তু এখন মনে হয় এর মূলে প্রমাণ খুব বেশি নেই। অপুর জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব কি? সেই নিশ্চিন্দিপুরের জীবন থেকে আরম্ভ করে তার জীবন কত বিচিত্র অবস্থা বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে তো ক্রমে উন্নীত হলো। একটি অবস্থার সঙ্গে আর একটি অবস্থার আর একটি অভিজ্ঞতার মিল কোথায়? আমরা যে যুগে বাস করি, জানি এ যুগে প্রশ্নটি উঠবে---- পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর অপুর বয়স হলো, অপুর sex life এর কোন পরিচয় আমরা পেলাম না। এ প্রশ্ন করা অন্যায়--- অপু লাজুক মুখচোরা, বড় হয়েও এ দোষ তার যায়নি--- তার প্রকৃতিই romantic, আদর্শপ্রবণ ও কল্পনাবিলাসী।
>
> তার nature কে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে, তা নিয়ে ঝগড়া করতে পারিনে। এটাকে আগে স্বীকার করে নিতে হবে। কারণ এটা আমাদের data premise--- তার প্রকৃতি অন্যভাবে গড়ে উঠলো না কেন, এ তর্ক মিথ্যা--- সাহিত্য বিচারের তর্ক এ নয়। তা ছাড়া অপু যে আবেষ্টনের মধ্যে শৈশব কাটিয়েছে, যে আবেষ্টনে বড় হয়েছে, সে আবেষ্টন একটা সদাজাগ্রত conscious sex life বর্ধিত করার পক্ষে অনুকূল নয়। গ্রন্থকার অন্যরকম আবেষ্টনের সৃষ্টি করে অপুকে অন্যরকম গড়ে তুললেন না কেন--- এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। এইমাত্র আমি বললুম, গ্রন্থকারের data কে premise কে আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। তিনি যে data আমাদের দিয়েছেন, যে আবেদন ও অবস্থা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে অপুর জীবন যেভাবে পরিণতি লাভ করেছে সেটা logical কিনা, সঙ্গত কিনা--- এটাই বিচার্য। তারপর অপুর sex life এর পরিচয় আমরা যে কিছু পাইনি, তার কারণও আছে। ছেলেবেলায় এবং পরে বড় হয়ে অপুর সঙ্গে যেসব মেয়েদের পরিচয় হয়েছে তারা সকলেই একটি বিশেষ ধরণের মেয়ে। বিভূতিবাবুর কথাতেই বলি--- 'সে এই মঙ্গলরূপিনী নারীকেই সারাজীবন দেখিয়া আসিয়াছে--- এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নারীকে--- হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরণের বলিয়া--- অপর্ণা দু'দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল--- লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ ও দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে--- পটেশ্বরী, রাণু দি, নির্মলা, তেওয়ারী বধূ--- সবই তাই...'।[৪৭]

অপর্ণার মৃত্যুর পরে তাদের সদ্যোজাত পুত্রসন্তানটির কী হয়েছিল সে খবর নিতে অপু ভুলে যায়। অনেক দিন পরে অপুর সঙ্গে তার একমাত্র পুত্রের দেখা হয়, নাম তার কাজল। সারা পৃথিবীর মধ্যে এই একটি মানুষ, যে আক্ষরিক অর্থে অপুর উপরে নির্ভরশীল। জন্মের দিনটি থেকে সে মাতৃহারা, বাবা তার থেকেও ছিল না। বাবার পথ চেয়ে কতদিন ধরে বসে থেকে, একদিন সে বাবাকে কাছে পায়। সে বুঝতে পারে তার দিদিমা ছাড়া তাকে কেউ কখনো আর এতো ভালোবাসেনি। অপু কাজলকে কলকাতা নিয়ে আসে। পিতা-পুত্রের সেই মিলনের মুহূর্তে বাবার কাছে আর কিচ্ছু না চেয়ে একতা পাথরের গেলাস চায়, তার হাত থেকে পড়ে গিয়ে সেটি ভেঙে গেছে। মামারবাড়িতে তাকে কেউ ভালোবাসেনা, সবাই বকে। অপুর ছোটবেলা অপু কখনো কারুর কাছে বকুনিই খায়নি, মার তো দূরের কথা, ভারি আদরে, যত্নে বড় হয়ে ওঠা ছেলে ছিল সে। কাজলের ছোটবেলাটা তার মতন নয়, কাজলের ভয়, অনেক দিন পরে বাবাকে পেয়ে পরম নির্ভরতা দেখে শিশু কাজলের প্রতি করুণায় মন ভরে যায়।

কলকাতায় কাজলকে নিয়ে আসবার পরে আবার নতুন সংসার, তার দুইজন মাত্র সদস্য- অপু আর কাজল। একদিন অপু কাজলকে, হালুয়া করবার জন্য চিনি আনতে বলে। তারপর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে।

> কাজল মিনিট দশেক মাত্র বাহিরে গিয়াছে- এমন সময় গলির বাইরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল অপুর কানে গেল। বাহির হইয়া ঘরের দোরে দাঁড়াইল- গলির ভিতর হইতে লোক দৌড়াইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতেছে-
>
> একজন বলিল- একটা কে লরি চাপা পড়েছে-
>
> অপু দৌড়িয়া গলির মুখে গেল। বেজায় ভিড়, সবাই আগাইতে চায়। সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপুর গা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিয়াছে। একজন কে বলিল- কে চাপা পড়েছে মশাই-
>
> -ওই যে ওখানে একটা ছেলে- আহা মশায়, তখনই হয়ে গিয়েছে- মাথাটা আর নেই-
>
> অপু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল- বয়স কত?
>
> -বছর নয় হবে- ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ ফর্সা দেখতে- আহা!-
>
> অপু এ প্রশ্নটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না- তাহার গায়ে কি ছিল! কাজল তার নতুন তৈরী খদ্দরের শার্ট পরিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে-

> কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরনের বল পাইল- বোধ হয় যে খুব ভালবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হইবে- যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে- সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়তো ভয় পাইয়াছে।[৪৮]

এই দুর্ঘটনায় কাজলের কিচ্ছু হয়নি। ভিড়ের মধ্যে তার কৌতূহলী, ভীত শিশুমুখ দেখে সাময়িকভাবে অপুর সারা দেহে শক্ লাগবার অনুভূতি হয়। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়টি হল অপুর মানসিকতা। ছোটবেলা থেকে বারেবারে অতি নিকটজনের মৃত্যু দেখতে দেখতে অপু মৃত্যুকে মেনে নিতে শেখে সম্ভবত। সে জেনেছে মৃত্যু জীবনের বাকি সব ঘটনার মতই বা তার চেয়েও ঢের বেশি সহজ স্বাভাবিক ঘটনা। এই বিভ্রান্তির মুহূর্তে, যেসময় সাধারণ মানুষের নিজেদের প্রতি কোনও সংযম বজায় রাখা সম্ভব হয় না, সেসময় অপু ভেবেছে কাজলের যদি এই শেষ সময়টুকুতে জল তেষ্টা পায়, তাকে জল দেওয়া দরকার, তার খুব ভয় করছে, তার পাশে থাকা এসময় একান্ত দরকার। একথা ঠিক যে নিজের জীবনে পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনা সেইদিন সেখানে দাঁড়িয়ে, এ দুর্ঘটনা কাজল ছাড়া অন্য কারুর, তা অপুকে ভাবতেও দেয়নি। সে নিশ্চিত হয়েছিল এ কাজলই। কাজল তার একমাত্র সম্বল, তাকে বিদায়ের সময়ে একটু স্বস্তি দিতে অপু দৌড়ে যায়। খুব ভালো না বাসলে এই পরিস্থিতি সহ্য করবার মতন ঝুঁকি নিতে যে কেউ পারেনা। অপুর মনের জোরের কাছে স্তব্ধ হতে হয়।

শেষপর্যন্ত কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় অপু। একসময় অপু ভেবেছিল আর কখনও যেখানে ফেরা হবে না, বড় হয়ে আবার সেখানে ফেরা হয়। কিন্তু অপু সেখানে থাকতে আসেনি, নিজের সন্তানকে তার শৈশবের সেই মনোরম দিনগুলি ফিরিয়ে দিতেই এই প্রত্যাবর্তন। অপু বিশ্বাস করে এই নিশ্চিন্দিপুর তাকে নির্মাণ করেছে। কলকাতায়, ইঁট-কাঠের ভিড়ে সেইরকম অনাবিল শৈশব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু নির্মম অপু এইটা কখনও ভেবে দেখে নি যে তার শৈশবে সে একলা ছিল না, মা, বাবা, সর্বোপরি দিদি... কুসুম বিছানো ছিল তার সেই পথ। যেখানে দুঃখ, দারিদ্র ভরপুর থাকলেও তার আঁচ থেকে তাকে রক্ষা করবার মতন হাত ছিল। কিন্তু কাজল তার মা কে দেখেনি, অতি শৈশব থেকে মা'র মৃত্যুর কারণ হিসাবে তাকে কেউ ভাল চোখে দেখেনি, বাবার উপেক্ষা পেয়েছে বহুদিন, এরপরে তার বাবা যখন তাকে রেখে ফিজি বা অন্য কোথাও, বহু দূরের দেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা তাকে নিতান্ত অনাথ করে যাওয়া ছাড়া আর কীই বা হতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অপু এগিয়ে

চলবার পথটিই বেছে নেয়। ছেলেবেলার পরিচিত, প্রিয় রাণুদির হাতে তুলে দিয়ে যায় আত্মজ কাজলকে।

যাবার আগে সে কাজলের বিষয় রাণুদিদিকে কয়েকটি কথা বলে যায়। তার একটি উল্লেখযোগ্য কথা হল, অপু চায় কাজল কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক, দারিদ্রকে সে চিনতে শিখুক, কষ্ট না বুঝলে, তাকে মোকাবিলা না করতে শিখলে, তাকে বন্ধু করে এগিয়ে না যেতে শিখলে চলার পথে সে কিছুতেই পোক্ত জায়গা করে নিতে পারবেনা। সে ভয় পাক, তার ভয় ভাঙানোর দরকার নেই। কী আছে আর কীই বা নেই, সেকথা কে ই বা বলতে পারে।

কিন্তু এসবের সঙ্গে অপু এমন আরেকটি কথা বলে যার মাধ্যমে মৃত্যু সম্পর্কে অপু'র মনের গঠন আরেকবার স্পষ্ট হয়ে যায়। রাণুকে সে বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া, এক লোভী মেয়ের চুরি করে আনা সিঁদুর কৌটোর সন্ধান দিয়ে যায়। কাজল যদি বাঁচে আর যদি তার বিয়ে হয়, তখন তার বউকে সেই কৌটোটি দিতে বলে যায়। নিজের পুত্র সম্বন্ধে, সে যদি বাঁচে, একথা নিজের মুখে বলবার জন্য মনের জোর প্রয়োজন। অপু জানে জীবনের সবচেয়ে সম্ভাব্য ঘটনা এই যে তার বাঁকে বাঁকে নানান অপ্রত্যাশিতরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে চমকে দেবার জন্য। অপু সেই পথের উপযুক্ত পথিক। সে সেই চমক গ্রহণ করে বিস্মিত হতে প্রস্তুত। সেই তার জীবনপথের চলবার আনন্দ। কাজলের ক্ষেত্রেও তাই সে রানিকে বিধিনিষেধ আরোপ করতে বাধা দিয়ে যায়। মৃত্যুকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মানুষের হাতে থাকেনা, অতএব তাকে ঠেকানোর জন্য বেঁচে মরে থাকার অর্থ হয়না।

তারপর হঠাৎই একদিন দেখা যায়, ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলে গেছে। তার যাত্রাপথটি নির্দিষ্ট নয়। হয়তো বিদেশী বন্ধু'র সঙ্গে ফিজি কিংবা লীলার মুখের কথা রাখতে পোর্তো প্লাতায়। গন্তব্যস্থল নয়, তার কাছে গতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর বালক অপু তার সন্তানের মধ্যে দিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে আসে। ভৌগোলিকভাবে সে নিশ্চিন্দিপুরের পরিচয় খোঁজা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বস্তুত এই নিশ্চিন্দিপুর ছোটবেলা পেরিয়ে বড় হয়ে যাওয়া প্রতিটা মানুষের স্মৃতির নাম। অপু নিশ্চিন্ততার এই জায়গা ছেড়ে সময়ের মাপকাঠিতে যত দূরেই যাক, তা তার কাছে অধিকতর সত্য হয়ে ধরা পড়ে। এ জায়গা তার ফেলে আসা স্মৃতির নাম।

আর সেই স্মৃতিকে আরও মোহময় উজ্জ্বল করে তোলে কিছু মানুষের উপস্থিতি, যারা একসময় বেঁচে ছিল, যারা একসময় কোন না কোনভাবে অপুর জীবনকে আলোকিত করেছে। কিন্তু তারা স্থায়ী হয়নি কেউ। ইন্দির পিসিমা, দিদি, বাবা, অনিল, মা, অপর্ণা, লীলা... এর মধ্যে একমাত্র ইন্দিরকে বাদ দিলে প্রতিটা মৃত্যুই অপুর জীবনে চূড়ান্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। ইন্দিরকে অপু চিনত না, সে শুধু দিদির মুখে তার গল্প শুনেছে। ইন্দির ছিল নিশ্চিন্দিপুরের সেকালের প্রতিনিধি, তার দিদি সেই ইন্দিরের হাত থেকে খানিকটা সেকাল এনে দেয় ভাইয়ের হাতে। দুর্গার সাবালক জীবন যদি অপুর অভিজ্ঞতার অংশ হত, তবে অপূর্ব কুমার রায় আড়াই দশকের ব্যবধানে নিশ্চিন্দিপুরে এমন প্রত্যাবর্তনের সুযোগ কি পেত? সারাজীবন নিশ্চিন্দিপুরে কাটিয়ে দেওয়া অপুর সাবালক জীবনটা এমন রোমাঞ্চের স্বাদ এনে দিত না। সেই নিশ্চিন্দিপুর যেখানে চব্বিশ বছরের পরে ফিরে এসে তার ছেলেবেলা হারানো দিদিকে সে আবার করে পায়, অল্প কয়েকদিনের জন্য, নিজের মতন করে ফিরে পায় তার ফেলে আসা শৈশব। পথ তখনই আরও সুন্দর হয়ে ওঠে যখন পিছুটানটুকু থেকে যায়। তারপরে সারাজীবনটা ধরে বাবা, মা, অনিল, অপর্ণা, লীলা... যাকে যখনই আঁকড়ে ধরতে গিয়েছে সে, জীবন তাদের প্রত্যেককে সরিয়ে নিয়েছে তার পাশ থেকে, যাতে স্বাবলম্বী হয়ে সে হেঁটে যেতে পারে। অপুকে তার গন্তব্যহীন গন্তব্যের দিকে এগিয়ে দেওয়াই তো লেখকের উদ্দেশ্য। মৃত্যু তাকে বলিষ্ঠ করে তোলে। অপু হয়ে ওঠে এই সারিবদ্ধ মৃত্যুর নিজস্ব নির্মাণ। তবে অপুর স্মৃতিতে সততই থেকে যায় সেই সব মৃতদের উজ্জ্বল উপস্থিতি, এখন তারা অতীত হলেও যারা একসময়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল অপুর জীবনে। সেই রয়ে যাওয়াটুকুকে নিয়ে এগিয়ে চলে অপু। যদি বা কখনও সে ভুলে যায় তাদের, সে হারায় তাদের, তবু তারা কোনওদিন হারায় না অপুর জীবন থেকে।

নীহাররঞ্জন রায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ‘পথের পাঁচালী’ এবং ‘অপরাজিত’ তে অপুর জীবনে এতগুলি মৃত্যুর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে---

> ... আমার তৃতীয় আপত্তি, ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিত’ তে এতগুলো মৃত্যু সম্বন্ধে। একটি জীবনের পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এতগুলো আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যু হয় না একথা আমি বলি না। আমার মাঝে মাঝে এই সন্দেহটা মনে জাগে, এই যে এতগুলো মৃত্যু হলো অপুর জীবনে, এটা বিভূতিবাবুর bid-out-plot--- একটা কৌশল। একথা মনে হয়, এদের মৃত্যু না হলে অপুর আদর্শের, idealism এর জয় হতো না; এক একটা জীবনে যেন তার আদর্শের পথে বাধা, এক একটা মৃত্যুতে যেন সহজ হলো, সুষম হলো। গ্রন্থকার যেন ইচ্ছে করেই এক

একটা করে সমস্ত বন্ধন মুক্ত করে দিলেন, নইলে অপু অপরাজিত হতে পারে না। সর্বজয়া তাকে পিছনে টানে, সর্বজয়ার মৃত্যু হলো; অপর্ণা জীবিত থাকলে তার সেই চঞ্চল বিশ্ববিহারী মনের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়না- অপর্ণাও মারা গেল। লীলার সঙ্গে তার জীবন একটা নূতন ও সুনিবিড় আকর্ষণে ক্রমে জড়িত হচ্ছিল- সেই লীলাও বেঁচে রইলো না। এ প্রশ্ন মনে জাগে, অপর্ণাকে, লীলাকে বাঁচিয়ে রেখে লীলার সঙ্গে তার সম্পর্ককে এতটা নিরাসক্ত না করে, সে সম্বন্ধের সম্ভাবনাটাকে আরো এগুতে দিয়ে অপুকে কি অপরাজিত রাখা যেত না?[৪৯]

কেন এত মৃত্যু :

নীহাররঞ্জন রায়ের কথার সূত্র ধরেই বলা যেতে পারে যে অপুর জীবনে ঘটা মৃত্যুগুলো অপুকে নির্মাণ করতে অনিবার্য ছিল। প্রিয় মানুষেরা জীবনের দিকে, সংসারের দিকে অপুকে টান দিয়ে রেখেছ। যেমন রেখেছ সর্বজয়া, যেমন রেখেছে অপর্ণা, যেমন রাখতে পারতো লীলা। একে একে সেই সব বন্ধন ছিন্ন করেন বিভূতিভূষণ। অপর্ণা বেঁচে থাকলে, লীলা বেঁচে থাকলে কীভাবে অপু পোর্তো প্লাতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে পারতো? কার্যত, সব সম্পর্কের বিপরীতে, পোর্তো প্লাতা ওই সব সারিবদ্ধ মৃত্যুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে যাওয়াই অপুর ভবিতব্য। বলা বাহুল্য পোর্তো প্লাতা এখানে একটি রূপক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, সেই স্থান পথিক অপুকে সব বন্ধন তুচ্ছ করে পথে বের করে আনে। পথ যাকে ডাক দিয়েছে, সে ই অপু। সেই ডাকটাই তার কাছে একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে। প্রণবকে অপুর লেখা চিঠির কথা ইতিমধ্যে আরেকবার উল্লেখ করা হয়েছে লীলা প্রসঙ্গে। সেই চিঠিতে অপু তার ছোটবেলার কথা, নিশ্চিন্দিপুরের কথা উচ্চারণ করেনা, কেবল একটি প্রসঙ্গ ছাড়া। অপু বলে,

জীবনে সর্বপ্রথম যেবার একা বিদেশে গেলুম, পিসিমার বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা দিতে, বছর নয়েক বয়স তখন- হাজার বছর যদি বাঁচি, কে ভুলে যাবে সেদিনের সে আনন্দ ও অনুভূতির কথা? বহু পয়সা খরচ করে মেরু পর্যটকেরা তুষারবর্ষী শীতের রাতে উত্তর-হিম-কটিবন্ধের বরফ-জমা নদী ও অন্ধকার আরণ্যভূমির নির্জনতার মধ্যে Northern light জ্বলা আকাশের তলায়, অবাস্তব, হলুদ রঙের চাঁদের আলোয়, শুভ্রতুষারাবৃত পাইন ও সিলভার স্প্রুসের অরণ্যে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না--- আমি সেদিন খালি পায়ে বালুমাটির পথে শিমূল সোঁদালি বনের ছায়ায় ছায়ায় ভিন্ গাঁয়ে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলুম। আমি তো বড় হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের ঊষায় মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে পাগলকরা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাইনি--- তাই রেবাতটের সেই বেতস তরুতলেই অবুঝ মন বারবার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কৈ?...[৫০]

ছোটবেলার আর কিছু অপুর মনে পড়ে না, এমনকি দিদির মুখখানি পর্যন্ত স্পষ্ট মনে আসে না। কিন্তু মনে থেকে যায় একটি দিনের জন্য একা একা অতি নিকট বিদেশে যাবার বর্ণনাটি। একা, প্রথমবার এবং চেনা পরিমন্ডলের বাইরে যে বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করেছে সারাজীবন, সেই জগতে পা দেবার উত্তেজনা অপু বয়ে বেড়িয়েছে সারাজীবন। সময় তার শৈশবের আরও অজস্র মধুর স্মৃতিকে আবছা করে দিলেও এই দিনটিতে হাত দিতে পারেনি। এইখানে এসে পথ আর অপু সমার্থক হয়ে গিয়েছে। অপুকে, আর অপুর পথকে জিতিয়ে দেবার জন্য বিভূতিভূষণ তাই মৃত্যুকে আনেন। মৃত্যুকে আনেন পার্থিব সব সম্পর্কের বন্ধনের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে।

অপুর জীবন ও মৃত্যুর দর্শন :

'অপরাজিত'র একেবারে শেষ অংশে অপু যে মৃত্যুচেতনায় পৌঁছোয়, তার দুটি দিক আছে।

প্রথমত, একদিকে আছে সেই মুক্তির দিকটি। সর্বজয়ার মৃত্যুর পরে যে মুক্তির স্বাদ অপু পেয়েছিল। পরিণত বয়সে, আশৈশব প্রিয়জনদের মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হতে অপু মৃত্যু নিয়ে আর হা-হুতাশ করে না। সে জীবনের অমোঘতম সত্য হিসাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে শেখে।

দ্বিতীয়ত, ভবঘুরে অপু আবার কোথায় যেন চলিয়া যায়, তারই আগে একদিন ছেলেবেলাকার নিশ্চিন্দিপুরে ইছামতীর তীরের মাঠে অপুর মনে যে ভবনার উদয় হয়, সেই হল অপুর মৃত্যুর দর্শন।

> নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল, যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হইতেছে--- তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি, কখনও বা বৈষম্য--- সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি--- বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট---
>
> ...
>
> ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি--- ওদের জগতে অজানা জীবন-ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম--- কতবার যেন সে আসিয়াছে... জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া... বহু দূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল... কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি--- জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান... শুধু আনন্দে,

যৌবনে, জীবনে, পূণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে... এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন- পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র--- তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনাবিলাশ, এ যে হয় তা কে জানে--- বৃহত্তর জীবনচক্র কোন্ দেবতার হাতে আবর্তিত হয় কে জানে?[৫১]

অপু নিজেকে অনন্ত মহাবিশ্বের অংশ হিসাবেই ভাবে, একটা নির্দিষ্ট জীবন, কতগুলো নির্দিষ্ট সম্পর্ক এবং সেসবের পরে মৃত্যু... এই সীমাবদ্ধ সময়ের ধারণায় অপু বিশ্বাস করে না। সেই জন্যই কোনও নির্দিষ্ট অপর্ণা, কোনও নির্দিষ্ট দুর্গা অথবা কোনও নির্দিষ্ট নিশ্চিন্দিপুর তার কাছে একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে না, অপুর জীবন, মৃত্যুর দর্শন তাকে এমন কোনও নেতিবাচকতায় পৌঁছে দেয় না যেখানের থেকে সে ভাবতে পারে যে একটি মৃত্যুতেই এই সুদীর্ঘ জীবন পথের পরিসমাপ্তি হবে। একটি নির্দিষ্ট জীবনের সমাপ্তি অজস্র জীবনের ঈঙ্গিত বহন করে আনে। সেইজন্য ই নিশ্চিন্দিপুর যেখানে অপুর শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত, সে নিশ্চিন্দিপুর তার কাছে আমৃত্যু প্রাসঙ্গিক থাকে, কিন্তু যেখানে তা একটা ভৌগোলিক অংশ মাত্র, তাকে সে খুব সহজেই ছেড়ে যেতে পারে।

অপু ভেবেছিল যদি দেবী বিশালাক্ষী তাঁকে বর দেন, তবে সে চেয়ে নেবে আবার তার দশ বছর বয়সের শৈশবটি।

-তুমি কে?

-আমি অপু।

-তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও?

-অন্য কিছুই চাই নে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবনের ছায়ায় অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি--- তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?[৫২]

অপু সেইদিন সেইখানে বসে সত্যিই চেয়েছিল তার শৈশবটিকে ফিরে পেতে। কিন্তু অপু পাঠককে নিরাশ করেনা। সেই বাক্যের কয়েকটি মাত্র বাক্য পরেই বিভূতিভূষণ লেখেন "ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে।" অপু তার ছোট্ট ছেলের সঙ্গে থেকে যেতে পারত ছেলেবেলার স্মৃতিবাহী নিশ্চিন্দিপুরে, বরঞ্চ শৈশবে গ্রামে থাকবার যে প্রতিবন্ধকতা গুলি ছিল, এখন তাও নেই। কিন্তু অপু চলে যায়।

অপুর পুত্র শিশু কাজলকে বিভূতিভূষণ মেরে ফেলতে পারেন না। কিন্তু অপু কাজলকে ফেলে চলে যায় এমন অনির্দিষ্ট পথে, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যে কাজলের মৃত্যু হলে

এর থেকে বেশি হেরফের কিছু হত না অপুর জীবনে। নিরাপদ, স্বস্তিপূর্ণ জীবনকে বেছে নেওয়া অপুর জীবন নয়। স্মৃতি তাড়িত হয়ে শৈশবের দিকে ফিরে যাওয়া, স্থিতাবস্থা তার জীবন নয়, কেবলমাত্র সামনে এগিয়ে যাওয়াই যেমন পথের লক্ষ্য, অপরাজিত অপু উপন্যাসের শেষে এসে সেই পথের সঙ্গে মিলে যায় চিরকালের মত।

তথ্যপঞ্জি :

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬।

২। Chaudhuri, Nirad C., *Thy Hand, Great Anarch! India : 1921-1952*, London : Chatto&Windus, 1987, page 90.

৩। মজুমদার, মোহিতলাল, *সাহিত্য-বিতান*, কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২২৩।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪।

৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২।

৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২-২৩।

৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।

৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০০।

৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৯।

১০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮।

১২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৫।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৬।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৭৮।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৪।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৩।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৮।

১৯। রায়, দিলীপকুমার, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পথের পাঁচালী', *পরিচয়*-সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, ৫০ বর্ষ, ৯ম-১২শ সংখ্যা, রায়, দেবেশ (সম্পা.), কলকাতা : ১৯৮১, পৃষ্ঠা ২০।

২০। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (সং. ও সম্পা.), *গীতবিতানের কালানুক্রমিক সূচী*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৬২।

২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২২২-২২৩।

২২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২২।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯১।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০২।

২৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবন-স্মৃতি*, কলকাতা : আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৮৬।

২৭। গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'বিভূতিভূষণ : বাংলা কথাসাহিত্যের আধুনিকতা', *বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা*, সেন, অরুণ (সম্পা.), নতুন দিল্লি : সাহিত্য আকাদেমি, ২০০৯, পৃষ্ঠা ৫৫।

২৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১০৫।

২৯। দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.) ও চট্টোপাধ্যায়, অশোক (সম্পা.), *ঋগ্বেদসংহিতা*- ১ম খন্ড, কলকাতা : ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ৬১।

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৬৮।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৮।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২১।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২২।

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০।

৩৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ১৫৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১।

৩৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অপরাজিত', *প্রবাসী*, ৩১শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.), কলকাতা : ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৬৮৯।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২১।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১-২২২।

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অপরাজিত', *প্রবাসী*, ৩১শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৫ম সংখ্যা, চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.), কলকাতা : ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৬৯০।

৪১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২২৩।

৪২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অপরাজিত', *প্রবাসী*, ৩১শ ভাগ, ১ম খন্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.), কলকাতা : ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৮৫১-৮৫২।

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫৯।

৪৪। রায়, নীরেন্দ্রনাথ, 'অপরাজিত (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)', *পরিচয়*-সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, ৫০ বর্ষ, ৯ম-১২শ সংখ্যা, রায়, দেবেশ (সম্পা.), কলকাতা : ১৯৮১, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭।

৪৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী* - হীরক-জয়ন্তী সংস্করণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৯, পৃষ্ঠা ৩৪৪।

৪৬। Bose, Buddhadeva, *An Acre of Green Grass*, Calcutta : Orient Longmans Ltd, 1st Edition, 1948, page 89.

৪৭। রায়, নীহাররঞ্জন, 'অপরাজিত', *বিভূতিভূষণ : দেশে-বিদেশে*, চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার (সম্পা.), কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৮০-৮১।

৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৪।

৪৯। রায়, নীহাররঞ্জন, 'অপরাজিত', *বিভূতিভূষণ : দেশে-বিদেশে*, চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার (সম্পা.), কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৮৭।

৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৫৮।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৪।

৫২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক পাঠে মৃত্যু বিষয়ে তাঁর ধারনা এবং প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে এই গবেষণাপত্রে যথাসম্ভব আলোচনা করা হল।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলিতে তাঁর মৃত্যুভাবনা সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে অঙ্কিত মৃত্যু বিবরণীর মধ্যে আমরা সেই ভাবনার প্রতিফলন দেখে বিস্মিত হই। কিন্তু একথাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মৃত্যু বিষয়ে তাঁর বহু-অধীত এবং নিবিড়ভাবে চিন্তিত ব্যক্তিগত দর্শনের সারাৎসার সঞ্চিত হয়ে আছে ওই কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে। গল্প-উপন্যাস রচনার প্রাত্যহিকতাকে অতিক্রম করে সেগুলি মহত্বের তুঙ্গতম বিন্দু স্পর্শ করেছে।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতেই মৃত্যুর সময়ে জীবনব্যাপী বঞ্চিত মানুষেরা তাদের একদা ঘটে যাওয়া স্বল্পস্থায়ী আনন্দের দিনগুলি ফিরে পাচ্ছে। মৃত্যুর কঠোর শ্বাসরোধকারী যাতনা থেকে এই পরিত্রাণ লেখকের সহানুভূতিকেই চিহ্নিত করে। কারণ আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের বিপুল পরিসরে কষ্টকর-হিংস্র-নির্দয় মৃত্যুর অভাব নেই! আরেকটি নির্দিষ্ট ধরণের গল্পে মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই কাহিনি গ্রথিত হয়েছে, মৃত্যুতেই তাদের পরিসমাপ্তি। উদাহরণ হিসাবে আমরা ‘পুঁইমাচা’, ‘উমারাণী’, ‘ঠেলাগাড়ি’, ‘কিন্নর দল’ অথবা ‘বিপদ’ গল্পের কথা বলতে পারি। আবার ‘যাত্রাবদল’ গল্পে মৃত্যু এসেছে অনাড়ম্বরভাবে, গল্পটি নির্মিত হয়েছে মৃত্যু-পরবর্তী ঘনিষ্ঠ জনের প্রতিক্রিয়ার উপর। আবার ‘মৌরীফুল’ গল্পে বর্ণিত মৃত্যুটির আগে অত্যন্ত বিশদভাবে ঘটনাক্রমকে বয়ন করা হয়েছে, আপাত নির্মোহতার মধ্যে রয়ে গেছে সময়ের শীতল নিঃশ্বাস।

আলোচিত নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে মৃত্যু যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে বিপুল বৈচিত্র বিদ্যমান। ‘দৃষ্টি-প্রদীপ’ উপন্যাসে জিতুর জীবন অজস্র মৃত্যু পার করে এসেছে। কিন্তু এই মৃত্যুগুলি তাকে ঋদ্ধ করেনি। তার বিশেষ দর্শন ক্ষমতা সমালোচকদের শ্লেষ বা ক্ষোভ আকর্ষণ করেছে সময়বিশেষে কিন্তু এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রে লেখকের নির্দিষ্ট দিকনির্দেশ তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি বলেই মনে হয়। ‘অনুবর্তন’ বিভূতিভূষণের পরিচিত রচনাশৈলী থেকে অনেকটাই পৃথক এক ধরণকে চিত্রিত করেছে। প্রায়

সমসাময়িকতাকে প্রতিফলিত করা এই উপন্যাস নিঃসংশয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সারাজীবন অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং হীনতার মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যদুবাবুর মৃত্যুর মধ্যে কোনও মহনীয়তা নেই। সাধারণ মানুষের সাধারণ মৃত্যু। আহত ছাত্রটির মৃত্যুর মধ্যে কৈশোরের দীপ্ত গরিমা সংহত। 'ইছামতী' উপন্যাসে নদীর চিরন্তন গতির সঙ্গে মানবজীবনের কখনও-শান্ত-কখনও-অশান্ত প্রবাহের উপমা এড়িয়েও বলা যায় এই উপন্যাসে মৃত্যুগুলি এসেছে অতি স্বাভাবিকভাবে। লেখক তাঁর যাদুকরী কলমে মৃত্যুর মোহময় উপস্থাপনা করলেও অথবা দেওয়ান রাজারাম রায়ের মৃত্যুর মধ্যে হিংস্রতা থাকলেও তা কখনোই উপন্যাসের গতিপথকে পরিবর্তন করেনি--- হয়তো লেখকের উদ্দেশ্য ও তা ছিল না। শিপ্টন সাহেবের প্রতাপশালী অস্তিত্বের বিপ্রতীপে তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা প্রশমিত হচ্ছে কৈশোরের নির্ভার দিনগুলিতে ফিরে গিয়ে। 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে মতির মৃত্যুর মধ্যে আসন্ন সর্বনাশের বীজ উপ্ত হয়ে আছে, একটি বিশেষ পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে যা বাংলাদেশের সামাজিক শান্তিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর জীবনের প্রতিটি বাঁকে একটি করে মৃত্যু উপস্থিত অথবা, বলা যায়, প্রতিটি মৃত্যুর পরে তার জীবন একটি করে গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের সম্মুখীন হয়েছে- তার বিশ্ব আরও বিস্তৃত হয়েছে, তার দৃষ্টি হয়েছে প্রসারিত। সাধারণ গ্রামীণ একটি কৌতূহলী বালক থেকে সে ক্রমশ পরিণত হয়েছে বিশ্বনাগরিক, ব্যক্তিগত দর্শনে ঋদ্ধ এবং উন্মুক্ত দৃষ্টি অপরাজিত চিরন্তন মানবে। প্রকৃতি যদি হয় প্রেক্ষাপট, মৃত্যু এই দুটি উপন্যাসের অন্যতম চালিকাশক্তি যা অপুর চরিত্রকে পুষ্ট করতে প্রধানতম নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করেছে। সমসময়ে এবং পরবর্তীকালে বাংলার শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই এই উপন্যাসদ্বয়কে বিশ্লেষণ করেছেন এবং মৃত্যুর 'আধিক্য' নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। বস্তুত উপন্যাসের কথনভঙ্গি এবং বিষয়ের সঙ্গে লিপ্ত, মুগ্ধ এবং একাত্ম বোধ করার কারণেই হয়তো বৃহত্তর প্রেক্ষিতে মৃত্যুগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান এবং উত্থিত ভ্রূ হয়েছেন।

মৃত্যু এবং তার পূর্বাপর ঘটনাক্রম বর্ণনা করা বিভুতিভূষণের এই যে গল্প-উপন্যাস-দিনলিপি, সেগুলির নিবিড় পাঠে তাঁর হৃদয়ের অপরূপ সহানুভূতি এবং নৈর্ব্যক্তিকতাকে অতিক্রম করে তাঁর দুর্জয় আশাবাদকে যেমন অনুভব করা যায়, তেমনই একজন কুশলী লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কাহিনি নির্মাণের অসাধারণ দক্ষতা অথবা

সংলাপ-সৃজনের দক্ষতা আমাদের তো মুগ্ধ করেই, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করা যায়- মৃত্যু হোক বা জীবন, প্রাত্যহিকতার মালিন্য ছাপিয়ে তাঁর সাহিত্য আরও অধিক কিছু।

এই গবেষণাপত্রের শিরোনাম, "তবু অনন্ত জাগে : বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে মৃত্যু"। এই গবেষণার প্রসঙ্গে গানটিকে খুব প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ার কারণে এই ব্যবহার। গানের কথাগুলির দিকে একবার তাকানো যাক,

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্যচন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।।
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ-
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।।[১]

এ গানের একটি শব্দ, 'তবু', এই শব্দটিই গানকে সেই আলাদা মাত্রা এনে দেয়, যে বিষয়টিকে আমরা খুঁজেছি সমস্ত গবেষণা জুড়ে। দুঃখ, মৃত্যু, বিরহ ইত্যাদি মানুষের জীবনে অপরিহার্য। কাঙ্ক্ষিত না হলেও এই বিষয়গুলিকে এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় বের হয়নি। কিন্তু এই যে দহন, এই দহনের প্রাথমিক যন্ত্রণাকে অতিক্রম করতে পারলে যা বাকি থাকে তা হল বেদনা। সেই বেদনার মধ্যে কষ্ট আছে, কিন্তু তাতে ক্রমান্বয়ে দহনের অনুভূতি থাকে না। সেই মুহূর্তে বেদনার সঙ্গে মিলে যায় শান্তির বোধ, যে বোধ একটি মৃত্যুকে জীবনের প্রবাহ থেকে আলাদা করে না দেখে তাকে একটি চিরকালীন ধারার অংশ হিসাবে দেখে। মানুষের মৃত্যু হলেও জীবন-মৃত্যু চক্রের ধারায় মানবের অস্তিত্ব থেকে যায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমুদ্রের তরঙ্গের মত, যা প্রাথমিক তীব্র অভিঘাত তৈরি করে মিলিয়ে যেতে বাধ্য, কিন্তু এই প্রক্রিয়া অক্ষয়, তা চলতে থাকে। হারিয়ে ফেলবার ভয় ব্যক্তিগত। অনন্ত জীবনচক্রের পূর্ণতার কাছে সমস্ত শোক, হারানো সঞ্চিত হয়ে থাকে। এই ব্যক্তিগত মৃত্যুকে অতিক্রম করে নিজেকে অনন্তের অংশ হিসাবে ভাববার মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দের স্বাদ পেয়েছিলেন

বিভূতিভূষণ, পেয়েছিল অপু। পাঠক তাঁর সৃষ্ট কথাসাহিত্যের যাত্রাপথে সেই বিস্ময়কর অনুভূতি আস্বাদন করেন।

এই গবেষণাপত্রও অনন্তের বোধের আনন্দ-বেদনাময় যাত্রাপথের শরিক হয়ে থাকে।

তথ্যপঞ্জি :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০৮।

[এই গবেষণার কাজে আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে 'বিভূতি রচনাবলী' সুলভ সংস্করণ (১ম-৬ষ্ঠখন্ড), তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ চক্রবর্তী, সবিতেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, প্রকাশক-মিত্রওঘোষ, কলকাতা, ১৩৮৭বঙ্গাব্দ-১৩৮৯বঙ্গাব্দ।]

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি :

১। অভেদানন্দ (স্বামী), *মরণেরপারে*, কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণবেদান্তমঠ, ১৩৭৮বঙ্গাব্দ।

২।গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, *স্মৃতিকথা*, চতুর্থপর্ব, কলকাতা : ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

৩। গম্ভীরানন্দ(স্বামী) (সম্পা.), *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী*- প্রথম ভাগ, কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

৪। গোস্বামী, পরিমল, *আমি যাঁদের দেখেছি*, কলকাতা : প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫।

৫। গোস্বামী, পরিমল, *পথে পথে*, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৬। গোস্বামী, পরিমল, *বনপথের পাঁচালী*, কলকাতা : রূপা অ্যান্ড কোং, ১৯৫৫।

৭। ঘোষ, চিত্তরঞ্জন, *বিভূতিভূষণ*, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৭২।

৮। ঘোষ, তারকনাথ, *জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ*, কলকাতা : শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

৯। ঘোষাল, চন্ডীকাপ্রসাদ, *বিভূতিভূষণ : স্ববিরোধী সংবেদ*, নতুন দিল্লী : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৯।

১০। চক্রবর্তী, অরিন্দম, *ভাত কাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস*, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৪।

১১। চক্রবর্তী, অরিন্দম, *মননের মধু*, কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৮।

১২। চক্রবর্তী, মুকুল, *ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ*, ঘাটশিলা : চামেলী চক্রবর্তী, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, চন্ডীদাস, *অপরাজিত বিভূতিভূষণ*, কলকাতা : বিশ্বজ্ঞান, ১৯৯১।

১৪। চট্টোপাধ্যায়, চন্ডীদাস, *পথের পাঁচালীর নেপথ্য কাহিনী*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

১৫। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৮৮।

১৬। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ : দেশে-বিদেশে*, কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯১।

১৭। চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার, *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়*, নতুন দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৩।

১৮। চৌধুরাণী, অমিয়া, *দিদিমার যুগ ও জীবন*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯২।

১৯। দত্ত, রমেশচন্দ্র (অনু.)ও চট্টোপাধ্যায়, অশোক (সম্পা.), *ঋগ্বেদসংহিতা*- ১ম খন্ড, কলকাতা : ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

২০। দাস, সজনীকান্ত, *আত্মস্মৃতি*, কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ১৯৯৬।

২১। ঠাকুর, কিশলয়, *পথের কবি*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮।

২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান* (পূজা, স্বদেশ), কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতবিতান*, কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *চিত্রা*, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

২৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবন-স্মৃতি*, ১ম সংস্করণ, কলকাতা : আদিব্রাহ্মসমাজ প্রেস্, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (সম্পা.), *শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ*, কলকাতা : উত্থক প্রকাশনী, ১৯৯৬।

২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস, *বিভূতিভূষণের সংসার*, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১১।

২৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অপরাজিত*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪।

২৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অভিযাত্রিক*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *অরণ্য সমগ্র,* চন্ডীকাপ্রসাদ ঘোষাল(সম্পা.), কলকাতা : গাঙচিল, ২০১৩।

৩১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আচার্য্য কৃপালনী কলোনি*, কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

৩২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আমার লেখা*, কলকাতা : বিভূতি প্রকাশন, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

৩৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *ঊর্ম্মিমুখর*, কলকাতা : মিত্রালয়, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

৩৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *কুশল পাহাড়ী*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

৩৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *গল্প-পঞ্চাশৎ*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৬।

৩৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *জন্ম ও মৃত্যু*, কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৩৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *তৃণাঙ্কুর*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা : মিত্রালয়, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

৩৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *দিনের পরে দিন*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

৩৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *দৃষ্টি-প্রদীপ*, ১ম সংস্করণ, কলকাতা : পি সি সরকার এন্ড কোং, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *দেবযান*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৪১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

৪২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *পথের পাঁচালী,* হীরক জয়ন্তী সংস্করণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ২০১৯।

৪৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিচিত্র জগৎ,* কলকাতা : ডি.এম.লাইব্রেরী, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

৪৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র-* প্রথম খন্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

৪৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র-* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

৪৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মুখোশ ও মুখশ্রী,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৭।

৪৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মুহূর্তকথা,* কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, ২০১২।

৪৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মেঘ-মল্লার,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৪৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মৌরীফুল,* কলকাতা : গুপ্ত প্রকাশিকা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *মৌরীফুল-* কথা ও কাহিনী সিরিজ (পুস্তিকা), পঞ্চম সংখ্যা, দেবী, কিরণলেখা (সম্পা.), কলকাতা : প্রকাশক অনুল্লেখিত, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৫১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *রূপহলুদ,* প্রথম সংস্করণ, কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৮৭৯ শকাব্দ।

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *সেরা বিভূতি,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

৫৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *স্মৃতির রেখা,* কলকাতা : ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

৫৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *হে অরণ্য কথা কও,* তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, প্রকাশকাল অনুল্লেখিত।

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনা, *উপল ব্যথিত গতি,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

৫৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনা, *দিনান্তবেলায়,* কলকাতা : গাঙচিল, ২০০৯।

৫৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০০১।

৫৮। ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর, *অপুর পাঁচালী,* কলকাতা : পুস্তক প্রকাশনী, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

৫৯। ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *বিভূতিভূষণ ও কথাসাহিত্যে বাস্তববাদ,* কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৩।

৬০। মজুমদার, মোহিতলাল, *সাহিত্য-বিতান*, কলকাতা : বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

৬১। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার, *সেই সব দিন*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

৬২। মুখোপাধ্যায়, আবিরলাল, *আমার শিক্ষক বিভূতিভূষণ,* কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৬৩। মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (সং. ও সম্পা.), *গীতবিতানের কালানুক্রমিক সূচী*, কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০১২।

৬৪। সেন, অরুণ (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা,* নতুন দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, ২০০৯।

৬৫। সেন, রুশতী, *বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস,* কলকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৯৩।

৬৬। সেন, রুশতী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,* কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯।

৬৭। সেন, রুশতী (সম্পা.), *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্ধানে,* কলকাতা : অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৪।

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি :

1. Bose, Buddhadeva, *An Acre of Green Grass*, Calcutta : Orient Longman, 1948.
2. Chaudhuri, Nirad C., *Thy Hand, Great Anarch, India : 1921-1952,* London : Chatto&Windus, 1987.

বাংলা পত্রিকাপঞ্জি :

১। আচার্য, অনিল (সম্পা.), *অনুষ্টুপ,* ২৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা : ১৯৮৯।

২। প্রাগুক্ত, ২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা : ১৮৮৯।

৩। প্রাগুক্ত, ২৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, কলকাতা : ১৯৯৪।

৪। প্রাগুক্ত, শারদীয়, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা : ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

৫। প্রাগুক্ত, ৫১ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা : ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

৬। আফিফ ফুয়াদ (সম্পা.), *দিবারাত্রির কাব্য,* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, দ্বাবিংশ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা : ২০১৪।

৭। আবদুর রউফ (সম্পা.), *চতুরঙ্গ,* ৪৮ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কলকাতা : সেপ্টেম্বর ১৯৮৭।

৮। প্রাগুক্ত, ৫৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা : কার্তিক ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

৯। প্রাগুক্ত, ৬৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলকাতা : বৈশাখ-আশ্বিন ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

১০। গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *বিচিত্রা,* ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা- ৩য় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা : আষাঢ় ১৩৩৫- আশ্বিন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

১১। ঘোষ, সাগরময় (সম্পা.), *দেশ,* ৬১ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, কলকাতা : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

১২। ঘোষ, সুমথনাথ ও ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর (সম্পা.), *কথাসাহিত্য,* বিভূতিভূষণ স্মৃতিসংখ্যা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা : অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

১৩। চক্রবর্তী, অভিষেক ও চন্দ, রুদ্রদীপ (সম্পা.), *অশোকনগর,* বিভূতিভূষণ সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কলকাতা : ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

১৪। চক্রবর্তী, শিবেন্দু শেখর, *আত্মবিকাশ সাহিত্য পত্রিকা,* ত্রয়োদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা : ২০১৯।

১৫। চক্রবর্তী, সুধীর (সম্পা.), *ধ্রুবপদ,*বার্ষিক সংকলন ১০, প্রসঙ্গ পথের পাঁচালী, উপন্যাস ও চলচ্চিত্র, কলকাতা : ২০০৬।

১৬। চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য (সম্পা.), *রোববার,* ক্রোড়পত্র, সংবাদ প্রতিদিন, কলকাতা : ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

১৭। চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ (সম্পা.), *প্রবাসী,* ২৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা- ৩১ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, কলকাতা : পৌষ, ১৩৩৬- আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

১৮। দাশগুপ্ত, বাসব (সম্পা.), *নীললোহিত,* মৃত্যুচেতনা সংখ্যা, কলকাতা : জুলাই ২০০৬ এবং জানুয়ারি ২০০৭।

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ (সম্পা.), *এবং এই সময়,* বিভূতিভূষণ বিশেষ সংখ্যা, ১০ম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, কলকাতা : ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

২০। বিশ্বাস, গোকুল (সম্পা.), *মাটি সাহিত্যপত্র,* বিভূতিভূষণ সংখ্যা, নবম সংখ্যা, কলকাতা : ২০০৮।

২১। ভৌমিক, তাপস ও অন্যান্য (সম্পা.), *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* বিভূতি সংখ্যা, কলকাতা : ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।

২২। মিত্র, গজেন্দ্রকুমার ও রায়, সবিতেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *কথাসাহিত্য,* বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ সংখ্যা, ৪৫ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, কলকাতা : ভাদ্র, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

২৩। মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ ও গুপ্ত, দেবাশিস (সম্পা.), *বইমেলা স্মারক গ্রন্থ,* চন্দননগর ইস্পাত সঙ্ঘ ষষ্ঠ বইমেলা, পথের পাঁচালী বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা : ২০০৫।

২৪। লাহিড়ী, সৌমিত্র (সম্পা.), *যুবমানস,* কলকাতা : জুলাই ১৯৯৪।

২৫। সরকার, অভীক (সম্পা.), *আনন্দবাজার পত্রিকা ক্রোড়পত্র,* কলকাতা : ২৮ নভেম্বর ২০১৫।

২৬। সেন, অশোক (সম্পা.), *বারোমাস,* দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা : এপ্রিল ১৯৮৯।

২৭। প্রাগুক্ত, পঞ্চদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, শারদীয়, কলকাতা : ১৯৯৩।

ইংরেজি পত্রিকাপঞ্জি :

1. West Bengal (Published & Edited), BibhutibhusanBandopadhyaya Centenary Number, Volume XXXVII, NO 17-18, Kolkata : 1995.